কিশোর থ্রিলার

সেবা প্রকাশনা

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ৩৫

রকিব হাসান

ভলিউম ৩৫

(নকশা + মৃত্যুঘড়ি + তিন বিঘা)

রকিব হাসান

ভলিউম ৩৫

তিন গোয়েন্দা

৯৩, ৯৫, ১২৫

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
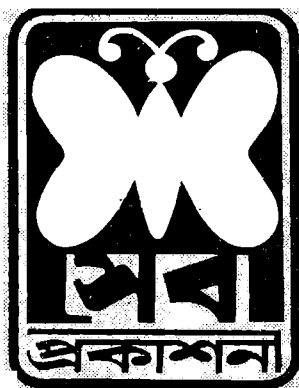
ISBN 984-16-1400-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ২০০০

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
মোবাইল: ০১১-৯০-৪৯০০৩০
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Volume-35
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

পঁয়তাল্লিশ টাকা

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১	(তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১/২	(ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)	৫৭/-
তি. গো. ভ. ২/১	(প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ২/২	(জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৩/১	(হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩/২	(কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৪/১	(ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৪/২	(ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৫	(ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ৬	(মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৭	(পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ৮	(আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ)	৫০/-
তি. গো. ভ. ৯	(পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১০	(বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১১	(অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১২	(প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ১৩	(ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৪	(পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	৫৫/-
তি. গো. ভ. ১৭	(ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মুলা)	৪৯/-

তি. গো. ভ. ৩১ (মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩২ (প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর) ৪৮/-
তি. গো. ভ. ৩৩ (শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট) ৪৭/-
তি. গো. ভ. ৩৪ (যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর) ৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৫ (নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা) ৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৬ (টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৩৭ (ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ৩৮ (উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৯ (বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪০ (অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৪১ (নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪২ (এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৪৩ (আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৪ (প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল) ৪৮/-
তি. গো. ভ. ৪৫ (বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৬ (আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৭ (নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৮ (হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ৪৯ (মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫০ (কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫১ (পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫২ (উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৩ (মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৪ (গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৫ (রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫৬ (হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেকট্রনিক আতঙ্ক) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৭ (ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫৮ (মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৯ (চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬০ (শুঁটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্রাভেল, শুঁটকি শত্রু) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬১ (চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬২ (যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমাপিশাচের জাদুঘর) ৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬৩ (ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৬৪ (মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৬৫ (বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৬ (পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৭ (ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৮ (টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+শুঁটকি গোয়েন্দা) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৯ (পাগলের গুপ্তধন+দুখী মানুষ+মমির আর্তনাদ) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৭০ (পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭১ (পিশাচবাহিনী+রত্নের সন্ধানে+পিশাচের থাবা) ৩৯/-

নকশা

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

সন্ধ্যাবেলা ইয়ার্ডের ওঅর্কশপে বসে আড্ডা দিচ্ছে তিন গোয়েন্দা। ক্যামেরা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, ইনফ্রারেড-ক্যামেরা। ওরকম একটা ক্যামেরা এই জন্মদিনে উপহার পেয়েছে মুসা। সামনের টেবিলে পড়ে আছে। কাজে লাগাতে পারছে না বলে তার খুব দুঃখ।

এই সময় ফোন বাজল। অলস ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল কিশোর। 'হালো?'

'পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড?'

'হ্যাঁ।'

'কে, কিশোর? আমি ভিক্টর সাইমন।'

মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল কিশোর। নিশ্চয় কোন কেস। 'ও, আপনি, স্যার? কি খবর?'

'ভাল। তোমাদের খবর কি? ব্যস্ত?'

'নাহ্। কাজকর্ম কিছু নেই। বসে বসে ঝিমুচ্ছি।'

'ভালই হলো। ওয়াল্ট ক্রিঙ্গলস্মিথ নামে এক ভদ্রলোক আমার সামনে বসে আছেন। ব্যবসায়ী। কারখানার মালিক। একটা বিপদে পড়ে আমার কাছে এসেছেন। কিন্তু আমার এখন মোটেও সময় নেই। তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি। দেখো, কোন সাহায্য করতে পারো কিনা?'

'বিপদটা কি, স্যার?'

'মিস্টার স্মিথকে পাঠাচ্ছি। তাঁর কাছেই শুনো।'

'এখনই পাঠাবেন?'

'হ্যাঁ, এখনই।'

'আচ্ছা, পাঠান। আমরা তিনজনেই আছি।'

দ্বিধা করে বললেন সাইমন, 'আরেকটা কথা, চোখ-কান একটু খোলা রেখো। ক্রিঙ্গলস্মিথের সন্দেহ, তাঁর পেছনে লোক লেগে আছে। ইয়ার্ডেও গিয়ে হাজির হতে পারে ওরা। সাবধান থাকবে।'

'থাকব।'

'কোন দরকার হলে আমাকে ফোন কোরো। বাড়িতেই আছি।'

'আচ্ছা।'

'রাখলাম?'

'আচ্ছা।'

কিশোরকে ধন্যবাদ দিয়ে লাইন কেটে দিলেন সাইমন।

উৎসুক হয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা আর রবিন। সে রিসিভার রাখতেই মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? কোন কেস?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আর আফসোস করা লাগবে না। তোমার ক্যামেরা-ব্যবহারের সুযোগ এসে গেছে। বাইরে গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকোগে। এখন থেকে যে ভেতরে ঢুকবে তারই ছবি তুলে নেবে। গোপনে। কিছু যেন টের না পায়। আমি গেট খুলে রাখছি।'

অবাক হয়ে কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। 'কিছুই বুঝলাম না!'

'বুঝতে আমিও পারছি না। মিস্টার সাইমন বললেন চোখ-কান খোলা রাখতে। তা-ই রাখব। ইনফ্রারেড-ক্যামেরার চেয়ে কড়া নজর আর কোন চোখের নেই। লেন্সের সামনে পড়লে আর ফসকাবে না। সুতরাং ওই চোখই ব্যবহার করতে বলছি।'

আর কোন প্রশ্ন না করে টেবিলে রাখা ক্যামেরাটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল মুসা। কাজে লাগানোর জন্যে অস্থির হয়ে ছিল, সেই সুযোগ পেয়ে গেছে আজ।

জঞ্জালের আড়ালে লুকিয়ে বসল মুসা।

ইয়ার্ডের বেশির ভাগ আলোই নেভানো। বোরিস আর রোভারকে নিয়ে রাশেদ পাশা গেছেন পুরানো মালপত্র দেখতে। দোতলার ঘরে মেরিচাচী একা।

রাস্তায় গাড়ি চলাচল করছে। এ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। কয়েক মিনিট পর একটা মোটর সাইকেলের ইঞ্জিনের শব্দ শুনল মুসা। শক্তিশালী ইঞ্জিন। ইয়ার্ডের গেটের কাছে একবার থমকাল মনে হলো, তারপর চলে গেল।

বসেই আছে মুসা, গেটের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ দেখতে পেল লোকটাকে। কেমন অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকল। এগিয়ে আসতে লাগল। কিছুদূর এসে থমকে দাঁড়াল। তাকাল এদিক ওদিক। এমন ভঙ্গি করল, যেন ভুল করে ঢুকে পড়েছে। ঘুরে আবার এগিয়ে গেল গেটের দিকে। বেরিয়ে গেল।

ততক্ষণে ছবি তুলে ফেলেছে মুসা।

খানিক পর একটা গাড়ি এসে থামল গেটের সামনে। হর্ন বাজাল। ওঅর্কশপ থেকে বেরিয়ে গেল কিশোর আর রবিন। গাড়িটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আরোহীর সঙ্গে কথা বলে সরে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকল গাড়িটা। ইয়ার্ডের চত্বরে থামল।

গাড়ি থেকে নামলেন যিনি, তাঁর মাথা জুড়ে টাক, দীঘল শরীর, পরনে ধূসর রঙের পুরানো ছাঁটের স্যুট। হাত বাড়িয়ে দিলেন কিশোরের দিকে।

ছবি তুলে ফেলল মুসা। শুনতে পেল, ভদ্রলোক বলছেন, 'আমি ওয়াল্ট ক্লিঙ্গলস্মিথ।'

'কিশোর পাশা,' নিজের পরিচয় দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল গোয়েন্দাপ্রধান। 'ও রবিন। আমাদের আরেক বন্ধু মুসা আমান, একটা জরুরী কাজে বাইরে গেছে। চলে আসবে।'

রবিনের সঙ্গেও হাত মেলালেন স্মিথ। তাঁকে নিয়ে ঘরের দিকে এগোল কিশোর আর রবিন। বারান্দায় উঠল। ঢুকে গেল ভেতরে। বসার ঘরে ঢুকেছে।

ক্যামেরা হাতে বসেই রইল মুসা।

বসার ঘরে ঢুকে স্মিথকে বসতে বলল কিশোর। নিজেও বসল। জিজ্ঞেস করল, 'চা-টা কিছু দেব?'

'না না, দরকার নেই,' হাত নেড়ে বললেন ভদ্রলোক, 'মিস্টার সাইমনের বাড়ি থেকে কফি খেয়ে এসেছি। সাংঘাতিক প্রশংসা করলেন তোমাদের। তোমরা নাকি অনেক বড় গোয়েন্দা।'

জবাবে শুধু হাসল কিশোর।

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন স্মিথ। বললেন, 'হ্যাঁ, যা বলতে এসেছি সেটাই বলি। আমার এক ভাগ্নেকে খুঁজে বের করে দেয়ার অনুরোধ করব তোমাদের। তার নাম মার্টি লফার, সে-ও আমারই মত কারখানার মালিক। অল্প বয়েসেই লস অ্যাঞ্জেলেসের বড় ব্যবসায়ী হয়ে গেছে। মাস তিনেক আগে নিখোঁজ হয়েছে।'

চুপ করে রইল কিশোর। অপেক্ষা করছে।

'প্লেন নিয়ে বেরিয়েছিল,' আবার বললেন স্মিথ। 'সঙ্গে ছিল তার এক বন্ধু, লুক ব্রাউন। অ্যারিজোনার মরুভূমিতে নেমে কলোরাডো নদীর কাছাকাছি হারিয়ে যায় ওরা। তাদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। বেমালুম গায়েব।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'প্লেনটার কি হয়েছে?'

'ওটা পাওয়া গেছে। মরুভূমিতে ল্যাণ্ড করেছে। পাহাড়ের খাড়া একটা দেয়ালের কাছে। এর ষোলো মাইল উত্তরে ব্লাইদি নামে একটা শহর আছে।'

'প্লেনটার কোন ক্ষতি হয়নি?' জানতে চাইল কৌতূহলী রবিন।

'নাহ্, কিছুই হয়নি। ট্যাংকে তেল কমে গিয়েছিল। তবে তার জন্যে মরুভূমিতে ল্যাণ্ড করার কোন প্রয়োজন ছিল না। ইচ্ছে করলে ব্লাইদির কাছে রিভারসাইড কাউন্টি এয়ারপোর্টে ফিরে যেতে পারত। ইঞ্জিনেরও কোন ক্ষতি হয়নি। এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে আমাকে। যেন ইচ্ছে করেই নেমেছে লফার, হারিয়ে যাওয়ার জন্যে।'

'তারমানে মারা যায়নি?' অনুমান করল রবিন। 'হেঁটে চলে গেছে কোথাও। কোথায়?'

'জানি না। সামান্যতম সূত্রও পাওয়া যায়নি।'

'পুলিশ জানে? ভালমত খোঁজা হয়েছে?'

'তন্নতন্ন করে। দুই-দুইজন মানুষ, মরে গেছে না বেঁচে আছে, তারও কোন নমুনা নেই। পুলিশ তো খুঁজেছেই, এয়ার ফোর্সও রেসকিউ টিম

পাঠিয়েছে, কোন লাভ হয়নি। গত হপ্তায় আমিও গিয়ে শেষ চেষ্টা করে এসেছি। কিচ্ছু পাইনি।'

চুপ করে বসে আছে কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। কি যেন একটা কথা মনে করার চেষ্টা করছে। হঠাৎ সোজা হয়ে বসল। 'কলোরাডো নদীর কাছে নেমেছে বলছেন?'

ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে তাকালেন স্মিথ। 'হ্যাঁ। কেন?'

'ওড়ার সময় নিচে কি দেখেছেন, বলি?'

'বলো।'

'দেখেছেন কতগুলো দানবকে। একশো ফুট লম্বা একেকটা।'

'দানব!' অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

'ঠিকই বলেছে ও,' ওপরে-নিচে মাথা দোলালেন স্মিথ। কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করে জানলে তুমি?'

'ব্লাইদি নামটা চেনা চেনা লাগল। ভাবতে মনে পড়ে গেল, গত বছর মরুর ওই দানবগুলো সম্পর্কে পড়েছিলাম। মরুভূমির বুকে আঁকা অনেক বড় বড় ছবি। রেখা-চিত্র। কয়েকশো বছর আগে নাকি ইনডিয়ানরা এঁকেছিল ওগুলো। ব্লাইদির কাছে কলোরাডো নদীর পাশে আঁকা ছবিগুলো সবচেয়ে বড়।'

'এতবড় ছবি আঁকল কি দিয়ে ওরা?' রবিনের প্রশ্ন।

'লাঙলের ফাল জাতীয় কোন যন্ত্র দিয়ে। ওপরের পাতলা বালি আর মাটির আস্তর কেটে গভীর দাগ করেছে নিচের পাথরের মত শক্ত হলদে রঙের মাটিতে। ফুটে উঠেছে দাগগুলো। ছবি হয়ে গেছে।'

'অবাক কাণ্ড! মরুভূমিতে একশো ফুট লম্বা ছবি আঁকতে গেল কেন ইনডিয়ানরা? মাটি থেকে দেখে যে পরে উপভোগ করবে, তারও উপায় নেই। কিছুই বোঝা যাবে না। অদ্ভুত কিছু রেখাই মনে হবে শুধু!'

'অনেক দিনের রহস্য ওটা,' স্মিথ বললেন। 'বিরাট রহস্য। অনেক চেষ্টা করেও এর বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারেননি বিজ্ঞানীরা।'

কিশোর বলল, 'আপনার কি ধারণা ওই দানবগুলোকে দেখেই কৌতূহল হয়েছিল লফার আর ব্রাউনের? আরও কাছে থেকে দেখার জন্যে নিচে নেমেছিল?'

মাথা নাড়লেন স্মিথ। 'না, মনে হয় না। এতবড় ছবি মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখে কিছু বোঝা যাবে না, এটুকু বোঝার বুদ্ধি ওদের আছে। সুতরাং নামার অন্য কোন কারণ ছিল। তবে কারণটার সঙ্গে এই ছবির কোন সম্পর্ক থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।'

'আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছি!' কিশোর বলল।

'সেই সম্পর্কটা কি?' রবিনের প্রশ্ন।

'সেটা জানলে তো অনেক প্রশ্নেরই জবাব জানা হয়ে যেত।'

একটা মুহূর্ত নীরবে কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন স্মিথ। তারপর বললেন, 'তোমাদের ব্যাপারে মিস্টার সাইমনের অনেক উঁচু ধারণা।

সেটা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছি এখন। মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না। কি ঠিক করলে, কাজটা নেবে তোমরা? খরচাপাতির জন্যে ভেব না...'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না, ভাবছি না। কাজটা করব আমরা।'

'ভাল করে ভেবে দেখো। তদন্ত করতে হলে ওই মরুভূমিতে যেতে হবে তোমাদের...'

'প্রয়োজন হলে যাবে। অ্যারিজোনা তো হাতের কাছে। বরফের দেশ আইসল্যাণ্ডে গিয়েও রহস্যের তদন্ত করে এসেছি আমরা।'

এই প্রথম হাসলেন স্মিথ। 'ঠিক আছে, করো তদন্ত। কিন্তু তোমাদের আরেক বন্ধু তো এখনও এল না। দেখা হলো না।'

কিশোর বলল, 'ঠিকানা দিয়ে যান, হবে। আজ রাতটা ভেবে নিই, কাল দেখা করব আবার। কি ভাবে কি করব, জানাব তখন আপনাকে।'

'ঠিক আছে।' পকেট থেকে কার্ড বের করে দিলেন স্মিথ। 'আমি তাহলে এখন যাই।'

উঠে দাঁড়ালেন স্মিথ। তাঁকে এগিয়ে দিতে চলল কিশোর আর রবিন।

স্মিথকে নিয়ে কিশোররা ঘরে ঢুকে যাওয়ার পর আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করল মুসা। কাউকে ঢুকতে দেখল না। ভাবল, আর বসে থেকে লাভ নেই। আর কেউ ঢুকবে না। তার চেয়ে বরং যে দুটো ছবি তুলেছে সেগুলো ডেভেলপ করে ফেলা ভাল। দেখাতে পারবে কিশোরকে। যে লোকটা ঢুকে আবার বেরিয়ে গেছে, তার আচরণ সন্দেহজনক। তার পরিচয় বের করা দরকার।

জঞ্জালের নিচে মোবাইল হোমের ভেতর, তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে আছে ল্যাবরেটরি। দুটো ছবি ডেভেলপ করে, প্রিন্ট করল মুসা। চমৎকার উঠেছে, খুবই স্পষ্ট। প্রথম ছবিটাতে দেখা যাচ্ছে লোকটা তাকিয়ে আছে কিশোরদের বাড়িটার দিকে। দ্বিতীয় ছবিটার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে গেল মুসার, অস্ফুট শব্দ করে উঠল। ছবি দুটো নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে এল হেডকোয়ার্টার থেকে।

ওঅর্কশপটা অন্ধকার। যতদূর মনে পড়ে আলো জ্বেলেই ভেতরে ঢুকেছিল সে। কে নেভাল? কিশোররা কি বেরিয়ে এসেছে? না, তাহলে হেডকোয়ার্টারেই ঢুকত, কিংবা তাকে ডাকত।

মনটা খুঁতখুঁত করতে থাকল তার। তবে ছবির উত্তেজনায় তেমন মাথা ঘামাল না ব্যাপারটা নিয়ে। ওঅর্কশপের দরজায় বেরিয়ে এল।

খসখস শব্দ হলো পেছনে। ফিরে তাকাতে গেল সে। মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। চোখের সামনে জ্বলে উঠল হাজার কয়েক রঙবেরঙের তারা।

ঢলে পড়ে গেল মুসা।

দুই

ওঅর্কশপে আলো নেই দেখে কিশোর আর রবিনও অবাক হয়েছে। ভাবল, কোন কারণে নিভিয়ে দিয়েছে মুসা। স্মিথ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর গেট লাগিয়ে দিল কিশোর। রবিনকে নিয়ে এগোল ওঅর্কশপের দিকে।

মাটিতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকা মুসার গায়ে হোঁচট খেল কিশোর। চিৎকার করে উঠল, 'মুসা, কি হয়েছে তোমার!'

মুসার ভারি দেহটা ধরাধরি করে বসার ঘরে নিয়ে এল সে আর রবিন। লম্বা সোফায় শুইয়ে দিল।

ইয়ার্ডের বেচাকেনার হিসেব নিয়ে বসেছিলেন মেরিচাচী, চেঁচামেচি শুনে নেমে এলেন। বেহুঁশ মুসাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে?'

কিশোর বলল, 'কেউ বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে ফেলে রেখে গেছে।'

'মরবি! এ ভাবেই মরবি তোরা একদিন!' বলে ছুট দিলেন চাচী। ভেজা তোয়ালে আর স্পিরিট অভ অ্যামোনিয়া নিয়ে এলেন। ততক্ষণে মুসার শার্টের বোতাম, কোমরের বেল্ট খুলে কাপড়-চোপড় ঢিল করে দিয়েছে কিশোর আর রবিন।

তুলোয় স্পিরিট অভ অ্যামোনিয়া ভিজিয়ে মুসার নাকের কাছে ধরলেন মেরিচাচী। ভেজা তোয়ালে দিয়ে হাত-পায়ের তালু মুছে দিতে লাগল রবিন।

ঝাঁঝাল গন্ধ নাকে ঢুকতে গুঙিয়ে উঠল মুসা।

কানের কাছে চেঁচিয়ে বলল কিশোর, 'মুসা, ওঠো! তাকাও! এই মুসা, শুনতে পাচ্ছ? তোমার চকলেট-কেক শেষ হয়ে গেল তো!'

চোখ মেলল মুসা, 'চকলেট-কেকের কথা বললে শুনলাম?'

হাসি ফুটল মেরিচাচীর ঠোঁটে। 'হ্যাঁ, ওঠো। আস্তটাই রেখে দিয়েছি তোমার জন্যে।'

কি ঘটেছিল, জানার জন্যে প্রশ্নের তুবড়ি ছোটাল কিশোর আর রবিন।

'কে যে বাড়ি মারল, কিছুই বলতে পারব না,' দুর্বল কণ্ঠে জানাল মুসা। 'অন্ধকারে দেখতে পাইনি।'

তার জন্যে গরম দুধ আনতে চলে গেলেন মেরিচাচী।

'কিন্তু বাড়িটা মারল কে? কেন মারল?' রবিনের প্রশ্ন।

'আন্দাজ করতে পারছি,' মুসা বলল। 'একটা সাংঘাতিক আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম। ছবি!'

'ছবি!' দুই ভুরু কুঁচকে কাছাকাছি হয়ে গেল কিশোরের।

উঠে বসল মুসা। মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ। দুটো ছবি তুলেছি। প্রথম ছবিটা যার তাকে চিনি না। মনে হলো ভুল করে ঢুকে পড়েছে। বুঝতে পেরে বেরিয়ে গেছে। দ্বিতীয় ছবিটা মিস্টার স্মিথের। তাঁকে দেখে অবাক হতাম না, হয়েছি

তাঁর পেছনে আরেকজনকে দেখে। জঞ্জালের ওপাশে ঘাপটি মেরে ছিল। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চেহারা। ছবি দেখেই বোঝা যায় লুকিয়ে-লুকিয়ে নজর রাখছে। এই লোকটাকেও চিনি না।'

'ছবিগুলো কোথায়!' অধীর হয়ে জানতে চাইল কিশোর।

'বেহুঁশ হওয়ার আগে পর্যন্ত তো হাতেই ছিল। হয়তো পড়ে গেছে। ওঅর্কশপের দরজায় খুঁজলে পাওয়া যাবে।'

কিন্তু পাওয়া গেল না ছবিগুলো।

ওঅর্কশপের দরজায় একটুকরো কাগজ টেপ দিয়ে সাঁটা। তাতে লেখা:

তিন গোয়েন্দা, সাবধান

লেখার নিচে আঁকা একটা রেখাচিত্র। ছবিতে একটা লোক, তার বুকের দিকে তীর তাক করা।

'আঁকিয়ে হিসেবে সুবিধের না,' রবিন বলল। 'কিশোর, কি বোঝাতে চেয়েছে?'

'বোঝাতে চেয়েছে, আমরা যেন সরে থাকি। নাহলে হৃৎপিণ্ড বরাবর তীর মারবে।' তুড়ি বাজাল কিশোর, 'অর্থাৎ, খতম করে দেবে!'

নেগেটিভগুলোর জন্যে ল্যাবরেটরিতে ঢুকল ওরা। ছবি ডেভেলপ করার জায়গাটায় জিনিসপত্র উলট-পালট হয়ে আছে। কেউ যে খুঁজে গেছে, বোঝা যায়।

বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে; ছবি, নিগেটিভ, কিছুই না পেয়ে খালিহাতে ফিরে এল দুই গোয়েন্দা। জানাল কি ঘটেছে।

সব শুনে কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল মুসা, 'কেবল নিজেকেই বড় গোয়েন্দা ভাব, তাই না? হঠাৎ করেই মনে হয়েছিল নেগেটিভগুলো মূল্যবান, কোথাও লুকিয়ে রাখা দরকার।'

অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল কিশোর, 'কোথায় রেখেছ?'

উঠে দাঁড়াল মুসা। ঘুরে উঠল মাথা। আবার বসে পড়ল সে। খানিকক্ষণ পর একটু সুস্থ হয়ে কিশোর আর রবিনের সঙ্গে চলল ল্যাবরেটরিতে।

একটা উঁচু টুলের নিচে হাত ঢুকিয়ে নেগেটিভ দুটো বের করে আনল। টেপ দিয়ে আটকে রেখেছিল ওখানে।

ছোঁ মেরে তার হাত থেকে ওগুলো নিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে গেল রবিন। ছবি প্রিন্ট করতে দেরি হলো না। বেরিয়ে এল ভেজা ছবি হাতে। টেবিলে রাখল।

ছবির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিশোর। প্রথম যে লোকটার ছবি তোলা হয়েছে, তার ছিপছিপে শরীর, মাথায় ধূসর চুল। আর স্মিথের পেছনে যে লোকটার ছবি উঠেছে, তার কালো চুল, পেশীবহুল দেহ।

তখুনি ফোন করে সাইমনকে সব কথা জানাল কিশোর। তাঁর পরামর্শ চাইল।

পরদিন সকালে ছবিগুলো নিয়ে রকি বীচ পুলিশ স্টেশনে চলল তিন গোয়েন্দা। অফিসেই পাওয়া গেল পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে। প্রথম ছবিটার

ওপর টোকা দিয়ে গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'চিনি এঁকে। নাম মরিস ডুবয়। রকি বীচ সেভিংস ব্যাংকের ট্রাস্টি। ভদ্রলোক, তবে বড় বেশি খামখেয়ালি। পথ চলতে চলতে প্রায়ই নিজের বাড়ি ভেবে ভুল করে অন্যের বাড়িতে ঢুকে পড়েন। অনেকে রিপোর্ট করেছে পুলিশের কাছে।' দ্বিতীয় ছবিটায় টোকা দিয়ে বললেন, 'এর ব্যাপারে ফাইল না দেখে কিছু বলতে পারছি না।'

কিন্তু অপরাধীদের রেকর্ড ফাইলে পাওয়া গেল না লোকটার নাম।

ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা। স্মিথের অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলল।

মুসার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর, 'মুসা, ইনি ওয়াল্ট ক্রিঙ্গলস্মিথ। মার্টি লফারের মামা।'

মুসার মাথায় বাড়ি মেরে ছবি নিয়ে যাওয়ার কাহিনী শুনে উদ্বেগ ফুটল ওয়াল্টের চেহারায়। বললেন, 'থাকগে, তোমাদের আর এর মধ্যে গিয়ে কাজ নেই। পুলিশকেই বলি বরং। দেখুক আরেকবার চেষ্টা করে।'

কিশোর বলল, 'কিন্তু এটা এখন আমাদের চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে, মিস্টার স্মিথ। মুসাকে বাড়ি মারার প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ব না। আপনি আমাদের কাছে আসায় লোকটা এত খেপে গেল কেন? নিশ্চয় লফারের ব্যাপারে কিছু জানে। এই লোককে খুঁজে বের করতে হবে এখন আমাদের। মনে হচ্ছে, কিডন্যাপ করা হয়েছে আপনার ভাগ্নেকে।'

ছবিটা ভাল করে দেখলেন স্মিথ। চেনা চেনা লাগল। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আরে, এই লোককে তো কাল দেখেছি! আমি বাড়ি থেকে বেরোনোর পর মোটর সাইকেলে করে পিছু নিয়েছিল। মিস্টার সাইমনের বাড়ি পর্যন্ত পিছে পিছে গিয়েছিল। তাঁকে জানিয়েছি এ কথা।'

মুসার মনে পড়ল, আগের সন্ধ্যায় ক্যামেরা নিয়ে যখন লুকিয়ে বসেছিল, তখন গেটের কাছে মুহূর্তের জন্যে থেমেছিল একটা মোটর সাইকেল। সে-কথা জানাল সবাইকে।

কিশোরের অনুমান করতে কষ্ট হলো না, সাইমনের বাড়িতে নিশ্চয় জানালার নিচে আড়ি পেতে থেকে কথা শুনেছে মোটর সাইকেল আরোহী, পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের নাম শুনেছে, বুঝতে পেরেছে এরপর এখানেই আসবেন স্মিথ। তিনি কি করেন, দেখার জন্যে তাই আগেই এসে লুকিয়ে থেকেছে জঞ্জালের আড়ালে। ইনফ্রারেড-ক্যামেরা হাতে মুসাকে ওঅর্কশপে ঢুকতে দেখে আন্দাজ করে ফেলেছে, কি কাজ করেছে মুসা। নিজের ছবি উঠেছে কিনা বুঝতে না পারলেও কোন ঝুঁকি নিতে চায়নি লোকটা। তক্কে তক্কে ছিল, সুযোগ বুঝে কেড়ে নিয়েছে ছবিগুলো। জানালায় আড়ি পেতে স্মিথের সঙ্গে কিশোরদের কি কথা হয়েছে, সেটাও নিশ্চয় শুনেছে। নাহলে ওঅর্কশপের দরজায় হুমকি দিয়ে নোট রেখে যেত না। তারমানে তদন্ত করতে গেলে এই লোকের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

জরুরী আলোচনার পর স্মিথের অফিস থেকে বেরিয়ে এল তিন

গোয়েন্দা। ইয়ার্ডে ফিরল। মরুভূমিতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হতে হবে।

'সানগ্লাস নিতে হবে,' রবিন বলল, 'আর চওড়া কানাওয়ালা হ্যাট। মরুভূমিতে ভয়াবহ গরম। পানির ক্যান্টিনও লাগবে। আমাদের বার্থ সার্টিফিকেটের কপিও সঙ্গে নেয়া ভাল। বাই চান্স যদি মেকসিকোতে যাওয়া লাগে।'

'গরম কাপড়-চোপড়ও নিতে হবে,' কিশোর বলল। 'দিনে গরম হলে হবে কি, রাতে কনকনে ঠাণ্ডা।'

'আজব প্রকৃতি!' মুসা বলল। 'এই মিয়ারা, মরুভূমিতে শুনেছি ভূতের খুব দাপট, ঠিক নাকি?'

'আরে দূর!' হাত নাড়ল কিশোর। 'ওসব বানানো গপ্পো।'

'তবে যে বইতে লেখে...'

'ও কি আর সত্যি কথা লেখে নাকি? ফ্যান্টাসি গল্প।'

ভরসা কতটা পেল মুসা, তার মুখ দেখে বোঝা গেল না।

তবে পরদিন সকালে মিস্টার সাইমনের বিমানটা দেখা মাত্র উজ্জ্বল হয়ে গেল তার মুখ। প্লেন চালাতে ভাল লাগে তার। এই প্লেনটা আগেও চালিয়েছে সে, এবার অনেক বেশি সময় চালাতে পারবে, কারণ ওদের সঙ্গে যাচ্ছে না সাইমনের পাইলট ল্যারি কংকলিন। প্লেনটা তিন গোয়েন্দার দায়িত্বে ছেড়ে দিয়েছেন সাইমন।

মালপত্র নিয়ে প্লেনে চড়ল ওরা। আকাশে উঠল নীল রঙের সুন্দর বিমানটা। প্রথম যাবে স্যান বারনাডিনোতে।

সুন্দর সকাল। নিচে সান্তা মনিকার পাহাড়ের মাথায় ঝলমলে রোদ। প্রশান্ত মহাসাগরকে লাগছে নীল চাদরের মত। গালে হাত দিয়ে প্রকৃতির অপরূপ শোভা প্রাণভরে উপভোগ করতে লাগল কিশোর। মনের সুখে গান ধরল রবিন।

সাগর পেছনে ফেলে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্লেন চালাল মুসা।

স্যান বারনাডিনোতে পৌঁছে ল্যাণ্ড করার আগে বিমান বন্দরের ওপরের আকাশে বার দুই চক্কর মারল। টাওয়ারের অনুমতি নিয়ে নামতে শুরু করল। রানওয়েতে মাটি ছুঁয়েছে বিমানের চাকা, এই সময় রানওয়ের শেষ মাথায় একটা কাব বিমান চোখে পড়ল তার। তীব্র গতিতে ছুটে আসছে।

আঁতকে উঠল মুসা। 'খাইছে! অ্যাক্সিডেন্ট করবে তো!'

ভীষণ বেকায়দা। ডানে-বাঁয়ে ঘোরানোর চেষ্টা করলে বিধ্বস্ত হবে বিমান। ব্রেক করলে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। ওপরে তুলতে গেলে ধাক্কা লাগবে অন্য বিমানটার সঙ্গে। কি করা? গতি না কমিয়ে সামনে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিল সে। আস্তে আস্তে ব্রেক করবে। আর কোন উপায় নেই।

ব্যাপারটা কিশোর আর রবিনের চোখেও পড়েছে। হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ভয়ে হৃৎপিণ্ডটাও স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন। মুসার ক্ষিপ্রতা আর উপস্থিত বুদ্ধিই কেবল এখন বাঁচাতে পারে ওদের।

ধাক্কা লাগে লাগে, শেষ মুহূর্তে নাক উঁচু করে আকাশে উড়ল কাব। ব্রেক

কষল মুসা। ওদের মাথার ওপর দিয়ে বিমানের প্রায় পিঠ ছুঁয়ে গেল অন্য বিমানটার চাকা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই।

'বাঁচলাম!' গলা কাঁপছে মুসার। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে।

প্লেন থামতে এগিয়ে এল একজন পাইলট। মুসা নামার সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিল। 'দারুণ সামলেছ হে। খুব ভাল পাইলট তুমি। দোষ ওই গাধাটার। অফিসে গিয়ে একটা কমপ্লেন করে রাখো। বলা যায় না, তোমার দোষ দেখিয়ে রিপোর্ট করে বসতে পারে ও। আগেই তৈরি থাকো।'

কিন্তু কাবটার রেজিস্ট্রেশন নম্বর লক্ষ করেনি কেউ। ওড়ার আগে টাওয়ারের অনুমতিও নেয়নি পাইলট।

সেদিন আর মরুভূমিতে যাওয়ার ইচ্ছে হলো না গোয়েন্দাদের। বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে একটা হোটেলে উঠল।

পরদিন সকালে এল আবার। বিমান বন্দরের অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কাবটা নিয়ে সেই পাইলট ফিরে আসেনি।

মরুভূমির উদ্দেশে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা।

এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাওয়া কলোরাডো নদীর রূপালী পানি চোখে পড়তে কিশোর বলল, 'মুসা, নিচে নামাও। ভালমত নজর রাখতে হবে।' তার কোলের ওপর ক্যালিফোর্নিয়া মরুভূমি আর অ্যারিজোনার তরাই অঞ্চলের একটা ম্যাপ বিছানো।

'ওই দেখো!' ডানে হাত তুলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'একটা দানব!'

দেখা গেল একশো ফুট খাড়া উঠে যাওয়া একটা পাহাড়ের দেয়ালের কিনারে আঁকা হয়েছে বিশাল ছবিটা। দেয়ালের কাছে প্লেন নিয়ে গেল মুসা। চক্কর দিতে লাগল একজায়গায়। বলল, 'আরেকটা পা কি হলো দানবের? ভূতে খেয়ে ফেলল নাকি?'

'ক্ষয় হয়ে গেছে কোন কারণে,' বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'ওটার পাশে দেখো আরেকটা ছোট মূর্তি। আশপাশের ওই রেখাগুলো কি?'

বড় ছবিটার পাশে ওটার অর্ধেক বড় আরেকটা ছবি। রেখাগুলো তার বড় ভাইয়ের চেয়ে অনেক গভীর করে কাটা হয়েছে। তাই মুছেও যায়নি, ফুটেও উঠেছে অনেক স্পষ্ট হয়ে।

'মাঝের ডিজাইনটা ক্রসের মত লাগছে,' রবিন বলল।

'একে বলে মালটিজ ক্রস,' রেফারেন্স বইতে এ ধরনের রেখাচিত্রের ছবি দেখেছে কিশোর। 'পুরানো ইউরোপিয়ান ডিজাইন। নাইটস অভ মালটা নামে একটা ক্রুসেডর গ্রুপের স্মারকচিহ্ন এটা।'

'কিন্তু ইনডিয়ানরা নাকি এঁকেছে এই ছবি?' প্রশ্ন করল মুসা।

'সেটাও একটা ধারণা মাত্র,' জবাব দিল রবিন। ইতিমধ্যে এই নকশা নিয়ে বেশ কিছু অধ্যায় পড়ে ফেলেছে সে। 'যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে এই চিহ্ন প্রমাণ করে প্রাচীন স্প্যানিশ ভ্রমণকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিল ইনডিয়ানদের। আসলে, কেউই ঠিক করে বলতে পারে না কারা এঁকেছিল

এই ডিজাইন, কেন এঁকেছিল। এরিক ফন দানিকেন নামে একজন সুইস পুরাতাত্ত্বিকের বিশ্বাস, মহাকাশ থেকে নেমে আসা ভিনগ্রহবাসীরা এঁকেছে এই ছবি। কিংবা তাদের নির্দেশে ইনডিয়ানরা এঁকেছে। স্পেশশিপ নিয়ে নামার সময় এই চিহ্ন দেখে বুঝতে পারত প্রাচীন সেই ভিনগ্রহবাসীরা, কোথায় নামতে হবে। যেহেতু আকাশ থেকে *আগুনের রথে* চেপে নামত ওরা, ইনডিয়ানরা ভাবত দেবতা।'

'তারমানে ভূতের কথাটা একেবারে মিথ্যে বলিনি!' কেঁপে উঠল মুসার গলা। 'আমার তো ধারণা ভূতে গাপ করে দিয়েছে লফার আর তার বন্ধুকে!'

'তোমার মাথা!' অধৈর্য স্বরে বলল কিশোর। 'যত্তসব অবাস্তব ধারণা!'

নদীর এ পাড়ে আর কোন ছবি দেখা গেল না। অন্য পাড়ে প্লেন নিয়ে এল মুসা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চোখে পড়ল আরেকটা দানব। আরও এগোতে বোঝা গেল, একটা দানবীয় কুকুরের ছবি আঁকা হয়েছে।

'এখানেই প্লেন নামিয়েছিল লফার,' কিশোর বলল।

'আশ্চর্য!' দেখতে দেখতে বলল রবিন। 'এত নিখুঁত, দানিকেনের কথাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে! মাটিতে দাঁড়িয়ে এই জিনিসের আকৃতি বুঝল কি করে শিল্পী? একমাত্র আকাশ থেকে দেখেই বোঝা সম্ভব!'

খানিকটা এগিয়ে আরেকটা মানুষাকৃতির দানব আর ঘোড়ার ছবি দেখা গেল।

অনেকক্ষণ দেখেটেখে কিশোর বলল, 'এবার ফিরে যাওয়া যায়।'

ম্যাপে দেখা গেল, কাছাকাছি বিমান বন্দর রয়েছে রিভারসাইড কাউন্টিতে। সেখানে নেমে গাড়িতে করে ব্লাইদিতে যেতে হবে।

বিমান বন্দরের ওপরে এসে রেডিওতে নামার অনুমতি চাইল মুসা। অনুমতি পাওয়া গেল। নিখুঁত ভাবে ল্যাণ্ড করল সে। ট্যাক্সিইং করে এগিয়ে গেল হ্যাঙ্গারের দিকে। আগের দিনের মত কোন অঘটন ঘটল না।

প্লেন থেকে নেমে এসে একটা কেবিনে ঢুকল গোয়েন্দারা। চেয়ারে বসে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করছে, এই সময় এগিয়ে এল রুক্ষ চেহারার ছিপছিপে এক লোক। নিজেকে ফেডারেল অ্যাভিয়েশন এজেন্সির লোক বলে পরিচয় দিল। জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের মধ্যে পাইলট কে? কে প্লেনটা চালাচ্ছিলে?'

অবাক হলো তিন গোয়েন্দা। মুসা জবাব দিল, 'আমি। কেন?'

'লাইসেন্স দেখি?'

বের করে দিল মুসা।

লাইসেন্সটা খুঁটিয়ে দেখল লোকটা। কোন খুঁত পেল বলে মনে হলো না। মাথা দুলিয়ে বলল, 'হুঁ, তোমাকেই খুঁজছি।' আচমকা কর্কশ হয়ে গেল কণ্ঠস্বর, 'তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে!'

তিন

'ব্যাপার কি বলুন তো?' জানতে চাইল রবিন।

জবাব দিল না লোকটা। মাথা নেড়ে মুসাকে তার সঙ্গে যেতে ইশারা করল। মুসা উঠছে না দেখে তার হাত চেপে ধরে টান দিল।

তাকে প্রায় টেনে নিয়ে চলল লোকটা। রবিনকে মালপত্রের পাহারায় বসিয়ে রেখে পিছে পিছে চলল কিশোর।

কেবিন থেকে দূরে ছোট একটা বিল্ডিঙের একটা অফিস ঘরে মুসাকে নিয়ে এল লোকটা। কিশোরও ঢুকল সঙ্গে। ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন গোলগাল চেহারার এক ভদ্রলোক। একটা টাইপরাইটার নিয়ে যেন কুস্তি করছেন। রোলারের এ মাথার নব ধরে একবার টানছেন, ওমাথার নব ধরে একবার। নড়াতেও পারছেন না, সরাতেও পারছেন না।

হেসে এগিয়ে গেল কিশোর। বলল, 'মনে হয় এ জিনিস আর ব্যবহার করেননি? দিন, আমি ঠিক করে দিচ্ছি।'

একটা লিভার টিপল সে। ফ্রী হয়ে গেল রোলার। সরাতে আর অসুবিধে হলো না।

'বাহ্, এত সহজ!' ভারি গলায় বললেন ভদ্রলোক। 'থ্যাংক ইউ।' মুসার দিকে তাকিয়ে ছিপছিপে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, 'ও কে?'

'স্যার, সেই প্লেনটার পাইলট। স্যান বারনাডিনোতে অ্যাক্সিডেন্ট করছিল আরেকটু হলেই।'

ইশারায় মুসা আর কিশোরকে বসতে বললেন চেয়ারে বসা ভদ্রলোক। মুসার দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির সুরে বললেন, 'তোমার লাইসেন্স ক্যানসেল হয়ে যাবে। সরি, কিছু করার নেই। আকাশের নিরাপত্তার দিকে কড়া নজর রাখতে হয় আমাদের।'

ভুরু কুঁচকে গেল মুসার। 'কিন্তু আমি তো কিছু করিনি...'

কিশোর বলল, 'মনে হয় ভুল ইনফরমেশন পেয়েছেন আপনারা। দোষ ওর নয়, দোষ অন্য বিমানটার। স্যান বারনাডিনো থেকে নিশ্চয় ফোনে যোগাযোগ হয় আপনাদের? লঙ ডিসট্যান্স কলে ভুল শোনা যেতেই পারে। দয়া করে আরেকবার যোগাযোগ করুন। টেলিটাইপ করে মেসেজ পাঠাতে অসুবিধে আছে?'

'না, নেই,' মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। 'এখুনি করছি। আমি হ্যারল্ড ডিক্সন, এই এয়ারপোর্টের ম্যানেজার।' ছিপছিপে লোকটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বিল, যাও তো, মেসেজ পাঠাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল বিল।

এখানে কেন এসেছে ওরা, জানাল কিশোর।

মার্টি লফারের নিখোঁজ সংবাদ ডিক্সনও জানেন। বললেন, 'জানি। মাস তিনেক আগে মরুভূমিতে হারিয়ে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি হয়েছে, কোন চিহ্নই পাওয়া যায়নি। তোমরা কোন খোঁজ পেয়েছ?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'এবং আমরা তার খোঁজ করি এটাও কেউ একজন চায় না।' জঞ্জালের আড়ালে লুকিয়ে থাকা রহস্যময় লোকটার কথা বলল সে। 'এমনও হতে পারে, লং ডিসট্যান্স কলের জন্যে গণ্ডগোল হয়নি, ফোনে আপনাদের দেয়াই হয়েছে ভুল খবর, যাতে লাইসেন্স কেড়ে নিয়ে আটকে দেন আমাদের। তদন্ত চালাতে না পারি।'

'খবর আসতে কতক্ষণ লাগবে, স্যার?' অধৈর্য হয়ে পড়ল মুসা। 'পেট যে জ্বলে গেল খিদেয়! লাইসেন্স ক্যানসেলের সঙ্গে কি খাওয়াও ক্যানসেল করে দেয়া হবে নাকি?'

হেসে ফেললেন ম্যানেজার। 'ভাল কথা মনে করেছ। আমারও খিদে পেয়েছে। একটু বসো, খবরটা শুনেই যাই। আমিও বেরোব। ইচ্ছে করলে আমার গাড়িতে একটা লিফট নিতে পারো। শহরে পৌঁছে দেব।'

রবিনকে ডেকে আনতে গেল কিশোর।

মালপত্রের বোঝা নিয়ে ওরাও ঢুকল অফিসে, বিলও মেসেজ নিয়ে ফিরে এল। চেহারার কঠোর ভাবটা চলে গেছে তার। বলল, 'মুসার দোষ নয়, স্যার। ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে আমাদের। এ রকম একটা শয়তানি কে করল বুঝতে পারছি না!'

'কে আর করবে!' বিড়বিড় করল মুসা। 'যে আমার মাথায় বাড়ি মেরেছে···'

পায়ে লাথি দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে দিল কিশোর। বিলকে সব কথা শোনাতে চায় না। কার মনে কি আছে কে জানে!

অবশেষে ছাড়া পেল মুসা। অফিস থেকে বেরোল ওরা। আটটা বাজে। আকাশের রঙ উজ্জ্বল নীল। মরুভূমির ওপারে শুকনো পর্বতের ঢালে বড় বড় ছায়া নামছে। খানাখন্দগুলো অন্ধকার হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই, কালচে-নীল দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে পর্বতের গায়ে কালি ঢেলে দিয়েছে যেন কেউ।

'কি একখান আকাশ!' মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে বলল রবিন। 'পর্বতটাকে এত বড় লাগছে কেন বলো তো?'

'বাতাস খুব পরিষ্কার বলে,' জবাব দিল কিশোর।

মাখন রঙা একটা চকচকে কনভারটিবল গাড়ির কাছে ওদেরকে নিয়ে এলেন ডিক্সন। উঠতে বললেন।

সামনে বসল রবিন আর কিশোর। পেছনে ওদের মালপত্রের গাদার পাশে মুসা। শহরে রওনা হলেন ডিক্সন।

জানালা দিয়ে ঢুকছে উষ্ণ, অস্বাভাবিক কোমল বাতাস। গালে, মুখে লাগছে। তাজ্জব করে দিল গোয়েন্দাদের। সূর্যাস্তের সময়ও বাতাস বড় বেশি শুকনো, বিন্দুমাত্র আর্দ্রতা নেই। শিশিরের কোন লক্ষণই নেই বাতাসে।

'আমি তো জানতাম মরুভূমিতে রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়ে,' ডিক্সনের দিকে

তাকিয়ে বলল রবিন।

'গরমকালে পড়ে না এখানে,' জবাব দিলেন ম্যানেজার। 'বেডরোল ছাড়াই বাইরে ঘুমাতে পারবে, শীত লাগবে না। মরুভূমিতে ঘুমানোর কথা ভাবছ নাকি?'

'পরে,' কিশোর বলল। 'আজ রাতে শহরেই থাকব। ভাল জায়গা আছে না?'

'আছে।'

নতুন একটা মোটেলের ড্রাইভওয়েতে গাড়ি ঢোকালেন ডিক্সন। ঘোড়ার খুরের আকৃতিতে তৈরি বিল্ডিং। সাদা রঙ করা। সুইমিং পুলে গাঢ় নীল পানি। তীরে কয়েকজন লোক। ডাইভ দিয়ে পড়লেই পানি ছিটকে উঠছে।

পানি দেখে গা শিরশির করে উঠল মুসার, তখুনি ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করল। চমৎকার একটা রেস্টুরেন্টও চোখে পড়ল তার।

নিচতলায় ঘর নিল ওরা। ব্যাগ-স্যুটকেসগুলো ওখানে রেখে দশ মিনিটের মধ্যে এসে ঝাঁপ দিল পুলের পানিতে। গোসল সেরে রেস্টুরেন্টে গিয়ে গলা পর্যন্ত গিলল।

পরদিন সকালে কিশোর বলল খবরের কাগজের অফিসে যাবে। ব্লাইদির একমাত্র কাগজ Daily Enterprise-এর অফিসে হানা দিল ওরা, লফারের নিখোঁজ হওয়ার খবরটা পড়ার জন্যে।

সাইমন বলেন: গোয়েন্দাদের বন্ধু খবরের কাগজ আর পুলিশ, প্রচুর উপকার পাওয়া যায় তাদের কাছে। প্রথমে খবরের কাগজের অফিসে এল তিন গোয়েন্দা।

পুরানো কাগজে লফার আর ব্রাউনের নিরুদ্দেশের খবর ছাপা হয়েছে, কিন্তু তাতে নতুন কিছু পেল না কিশোর, কেবল রিপ্লির কাছে বিশাল এক দানবের কাছে ওদের প্লেন ল্যাণ্ড করার খবরটা ছাড়া।

'পুলিশের কাছে যাবে?' জানতে চাইল রবিন।

'যাব।'

ব্লাইদি পুলিশের কাছেও ভিকটর সাইমন নামটা অপরিচিত নয়, তাঁর সুখ্যাতি তাদের কানেও পৌঁছেছে। তার ওপর তিন গোয়েন্দার কাছে রয়েছে ইয়ান ফ্লেচারের দেয়া সার্টিফিকেট। সুতরাং ব্লাইদির পুলিশ চীফের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অসুবিধে হলো না।

তিনিও নতুন কোন তথ্য দিতে পারলেন না। বললেন, 'তোমরা যতটা জানো, আমিও ততটুকুই জানি। নতুন কিছু বলতে পারছি না।'

হতাশ হয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। ব্লাইদির প্রধান রাস্তা হবসনওয়ে ধরে এগোল।

'কিশোর, এক কাজ করা যাক,' হঠাৎ বলে উঠল রবিন, 'মুসা হবে মার্টি লফার, তুমি আর আমি লুক ব্রাউন!'

'খাইছে! পাগল হয়ে গেলে নাকি?' অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল মুসা। 'মরুর ভূতে আসর করেনি তো!'

'তার কথা এড়িয়ে গিয়ে উত্তেজিত স্বরে রবিন বলল, 'তুমি প্লেন চালাবে। আমি আর কিশোর হব যাত্রী…'

'তাই তো করছি। এতে আর নতুন কথা কি?'

এবারও মুসার কথায় গুরুত্ব দিল না রবিন। 'লফাররা যে পথ ধরে উড়ে গেছে, আমরাও সেই পথ ধরে যাব। শেষবার রিভারসাইড কাউন্টি থেকে উড়েছিল ওরা। ডিক্সনের কাছে ওদের ফ্লাইট চার্ট পাওয়া যাবে। আকাশ থেকে একই জিনিস দেখব, একই জায়গায় ল্যাণ্ড করব। হয়তো কিছু বোঝা যাবে।'

'তা যাবে!' বিড়বিড় করল মুসা। 'বুঝব, কি করে গায়েব হয় মানুষ! কারণ আমরাও তো হব!'

কিশোর বলল, 'রবিন কিন্তু মন্দ বলেনি। গায়েব যদি হইই, তাহলে তো আরও ভাল। রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। বুঝে যাব কি ভাবে গায়েব হয়েছে লফাররা।'

'তার জন্যে অত কষ্ট করার দরকার কি? আমাকে জিজ্ঞেস করো, বলে দিচ্ছি। ভিনগ্রহ থেকে স্পেসশিপ এসে তুলে নিয়ে গেছে ওদের। আমি বাবা পৃথিবীতেই ভাল আছি, অন্য কোন গ্রহে যেতে রাজি না। আল্লাহ্‌ই জানে ওরা ওখানে কি খায় না খায়!'

মোটেলে ফিরে তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল আবার তিন গোয়েন্দা। ট্যাক্সি নিয়ে চলল রিভারসাইড কাউন্টি এয়ারপোর্টে।

কড়া রোদ বাড়িটার সাদা দেয়ালে পড়ে ঠিকরে আসছে, চোখে লাগে। দাঁড়িয়ে থাকা বিমানগুলোর ডানা চকচক করছে। চওড়া কানাওয়ালা হ্যাট পরেছে কিশোর আর রবিন। মুসা মাথায় দিয়েছে খড়ের তৈরি একটা মেকসিকান সমব্রেরো হ্যাট।

'বাপরে বাপ, কি গরম!' বলল সে। 'একশো আট ডিগ্রি। এয়ারপোর্টের থার্মোমিটারে দেখলাম।'

'ও তো কিছুই না,' রবিন বলল। 'গরমের দিনে দুপুরবেলা নাকি বালি তেতে একশো পঁয়ষট্টি ডিগ্রি হয়ে যায়। এর মধ্যে হাঁটা লাগলে বুঝবে ঠেলা।'

গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'খাইছে! বলো কি! তাহলে বেরোলাম কেন? মোটেলের পুলই তো আরামের ছিল।'

'আরাম করতে তো আসিনি আমরা,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'এসেছি মার্টি লফারের খোঁজে। মনে রেখো, খরচটা বহন করছেন তার মামা।'

প্লেনের দরজা খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মুসা। ভেতরে বদ্ধ বাতাস আগুনের মত গরম হয়ে আছে। সেটা বেরিয়ে যাওয়ার সময় দিল।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আনতে অফিসে গেল কিশোর।

কয়েক মিনিট পর আকাশে উড়ল নীল বিমানটা। এয়ারপোর্টের ওপর একবার চক্কর দিয়ে উত্তরে মরুভূমির দিকে নাক ঘোরাল মুসা।

মুগ্ধ হয়ে নিচের দৃশ্য দেখতে লাগল ওরা। আকাশের ছায়া পড়েছে কলোরাডো নদীতে, আকাশের মতই নীল। তীরে অপূর্ব সুন্দর হলদে পাতাওয়ালা টামারিস্ক গাছের সারি। এক তীরে শস্য খেত, অন্য তীরে শুকনো টিলা-টক্কর, মালভূমি আর পাহাড়।

'মরুভূমি শুনে আমি ভেবেছিলাম শুধু বালি আর পাথরের পাহাড় দেখতে পাব,' রবিন বলল। 'কিন্তু এ কি দেখছি! এত সুন্দর!'

'বালিই ছিল এককালে,' কিশোর বলল। 'ওই খালগুলো দেখছ না? নদী থেকে পানি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে ওগুলো দিয়ে। মাটি ভিজিয়ে ফসল ফলিয়েছে।'

এক জায়গায় বড় একটা নিঃসঙ্গ দানব আঁকা আছে, আগের দিনই দেখে গেছে। সেটার কাছে এসে ভাল করে দেখার জন্যে নিচুতে বিমান নামিয়ে আনল মুসা।

একটা টিলা আছে। প্রায় একশো ফুট উঁচু। একধারে খুবই খাড়া, আরেক ধার ঢালু। ঢালু ধারটার কাছে সমতল জায়গায় বিমান নামানো সম্ভব। ল্যাণ্ড করল মুসা।

বিমান বন্দর থেকে আনা ফ্লাইট চার্ট দেখে রবিন বলল, 'এখানেই ল্যাণ্ড করেছিল লফাররা। তারপর কি করেছে?'

'হয়তো গিয়ে ওই টিলাটার ওপর উঠেছে,' কিশোর অনুমান করল, 'চারপাশটা দেখার জন্যে।'

বিমান থেকে নেমে এসে টিলাটায় উঠল ওরা। ওপরটা সমতল, অনেকটা মালভূমির মত। রুক্ষ, কঠিন মাটি চারপাশে, তাতে বিছিয়ে আছে নুড়ি পাথর। এখানে ওখানে দু-চারটা ছোট ছোট শুকনো ঝোপ। বিরান প্রকৃতি।

'দেখো, একটা রাস্তা,' মুসা বলল, 'রাস্তাটা কি অদ্ভুত! মনে হয় কেউ যেন ঝাড়ু দিয়ে নুড়ি সরিয়ে তৈরি করেছে।'

'রাস্তা না ওটা,' রবিন বলল। 'একটা দানবের পা।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে কিশোর। বলল, 'ভাবছি, এই টিলা মানুষের তৈরি নয়তো? প্রাচীন ইনডিয়ানরাই কি বানিয়েছিল চূড়ার ওপর ছবি আঁকার জন্যে?'

'হতে পারে,' সমর্থন করল রবিন। 'আর দানবের অবস্থানটারও হয়তো কোন মানে আছে।'

টিলাটার ওপর ঘুরে বেড়াতে লাগল ওরা। যত দিক থেকে সম্ভব দেখছে।

আচমকা দাঁড়িয়ে গিয়ে রবিন বলল, 'লফার যদি এখানে উঠে থাকে, কি পড়েছিল তার চোখে?'

রবিনের পাশে দাঁড়িয়ে মুসাও দেখতে লাগল।

দানবের বাঁ হাতটার ওপর দাঁড়িয়ে মরুভূমির দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'ওই দেখো কি চকচক করছে!'

'ধাতব কিছু?' রবিনের প্রশ্ন।

'চলো না গিয়েই দেখি।'

ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল কিশোর, পেছনে তার দুই সহকারী। ঢালের গোড়ায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল সে। পরক্ষণে লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল। চিৎকার করে বলল, 'খবরদার!'

চার

মাথা তুলল প্রায় দুই ফুট লম্বা একটা গিরগিটি। ভীষণ রাগে ফোঁস ফোঁস করছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে কিশোরের দিকে। সাপের জিভের মত চেরা লাল একটা জিভ ভয়ানক ভঙ্গিতে বার বার বেরোচ্ছে মুখের ভেতর থেকে।

আরেকবার লাফ দিয়ে আরও পিছিয়ে এল কিশোর। মুসা আর রবিন দাঁড়িয়ে গেছে। তাকিয়ে আছে গিরগিটিটার দিকে। চামড়ার রঙ কালচে-বেগুনী। তাতে হলুদ রঙের গোল গোল ছাপ। সারা শরীরে অসংখ্য আঁচিলের মত জিনিস কুৎসিত করে তুলেছে প্রাণীটাকে।

'খাইছে!' ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন মুসার চোখ। 'কি এটা? কুমিরের বাচ্চার ব্যারাম হয়েছে?'

'হিলা মনস্টার,' স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'জোরে দৌড়াতে পারে না বটে, তবে দাঁতের নাগালে পেলে সর্বনাশ করে দেবে। সাংঘাতিক বিষাক্ত।'

থেমে গেল গিরগিটিটা। ঠাণ্ডা, কুৎসিত চোখ মেলে দেখছে গোয়েন্দাদেরকে।

'আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে,' হেসে বলল রবিন।

'সার্থক হয়েছে তার চেষ্টা,' মুসা বলল। 'ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেছে আমার। এমন ভূতুড়ে জানোয়ার জনমেও দেখিনি। দাঁড়িয়ে থাকব কতক্ষণ। নড়লেই তো মনে হচ্ছে নড়ে উঠবে!'

'উঠুক। না দেখে গায়ে পা দিয়ে ফেললে বিপদ, কামড়ে দিতে পারে,' কিশোর বলল। 'দেখে যখন ফেলেছি, আর কিছু করতে পারবে না। দৌড়ে পারবে না আমাদের সঙ্গে। তবে সাবধান যে করে দিয়েছে, এ জন্যে একটা ধন্যবাদ ওর পাওনা। ওর জাতভাইরা আরও অনেক আছে এই অঞ্চলে। বালি আর নুড়ির মধ্যে চুপ করে পড়ে থাকলে চোখে পড়বে না। ভুল করে পা দিয়ে ফেললেই মরব। সুতরাং, সাবধান!'

কয়েক মিনিট একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ফোঁস ফোঁস করল হিলা মনস্টার। বিপদের আশঙ্কা নেই দেখে ঘুরল। অলস ভঙ্গিতে হেলেদুলে আস্তে আস্তে গিয়ে ঢুকে পড়ল একটা ঝোপে।

আবার পা বাড়াল তিন গোয়েন্দা। এগিয়ে চলল চকচকে জিনিসটার

দিকে। হাঁটছেই, হাঁটছেই, কিন্তু জিনিসটার কাছে পৌঁছতে পারার কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে না। আশ্চর্য!

পায়ে মোকাসিন পরেছে ওরা। তলা ফুঁড়ে যেন উঠে আসছে তপ্ত বালির ভয়ানক উত্তাপ।

রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে মুসা বলল, 'বাপরে বাপ, হিলা মনস্টারের বাচ্চা এই বালিতে হাঁটে কি করে! পায়ে কিসের চামড়া লাগানো!'

'কিসের আর, ওরই চামড়া,' কিশোর বলল। 'গরম বালিতে চলার উপযোগী করেই বানিয়ে দিয়েছে প্রকৃতি।'

'কিন্তু ওই চকচকে জিনিসটা কাছে আসে না কেন? ভূতুড়ে কাণ্ড মনে হচ্ছে!'

'ভূতটা আসলে বাতাস। বেশি হালকা বলে এখানে অনেক দূরের জিনিসও কাছে মনে হয়।'

অবশেষে পৌঁছল ওরা ওটার কাছে। গোল একটা জিনিস রোদে পড়ে চমকাচ্ছে।

তুলে নিল রবিন। বড় একটা পাথর, তাতে ছোট ছোট অন্য পাথর গাঁথা। কোনটা গাঢ় লাল, কোনটা বাদামী, কিছু আছে সবুজ। নাড়াচাড়ায় গায়ে রোদ পড়লেই ঝিক করে উঠছে পাথরগুলো।

কিশোরকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল সে, 'কি এটা, বলো তো? কোন ধরনের স্ফটিকের সমষ্টি?'

'সম্ভবত জ্যাসপার।'

মুসা জানতে চাইল, 'দামী জিনিস? হীরার মত?'

'হীরার মত অত দাম না হলেও, দামী, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

আশেপাশে খুঁজল ওরা। ওরকম পাথর আর একটাও পাওয়া গেল না।

'অবাক কাণ্ড!' রবিন বলল। 'এটা এখানে এল কোত্থেকে?'

মাটির দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'এর সঙ্গে লফারের নিখোঁজের কোন সম্পর্ক নেই তো?'

বুঝতে পারল না মুসা। 'মানে?'

'এখানে জন্মালে এ রকম পাথর আশেপাশে আরও থাকার কথা। নেই কেন?'

'হয়তো ছিল,' রবিন বলল। 'আকাশ থেকে চোখে পড়েছে লফার আর ব্রাউনের। এগুলোর জন্যেই নেমেছিল ওরা। তুলে নিয়েছিল।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ঠিক এই কথাটাই বলতে চাচ্ছি আমি। সবই নিয়ে গেছে, কিন্তু এই একটা কোনভাবে রয়ে গেছে এখানে। হয়তো কাড়াকাড়ির সময় পড়ে গেছে। সে-জন্যেই লফার আর ব্রাউন নিখোঁজ।'

অস্বস্তি ফুটল মুসার চোখে। কিশোরের কথা এতক্ষণে বুঝেছে। 'আচ্ছা, বুঝলাম! ওদেরকে খুন করে পাথরগুলো ডাকাতেরা কেড়ে নিয়ে গেছে সন্দেহ

করছ! মরুভূমিতে লাশ গুম করে ফেলেছে!'

'করলে অবাক হওয়ার কিছু নেই,' রবিন বলল। 'দামী পাথরের জন্যে মানুষ খুন হওয়াটা নতুন কিছু নয়।'

'উফ, কি রোদরে বাবা! সিদ্ধ হয়ে গেলাম!' মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ল কিশোর। 'এখানে আর দেখার কিছু নেই। চলো, প্লেনে গিয়ে বসি।'

প্লেনের দিকে হাঁটতে লাগল ওরা। মনে হচ্ছে কাছে, অথচ যতই হাঁটে, পথ আর ফুরায় না।

ভারী পাথরটা নিয়ে হাঁটতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে গেল রবিন। তা দেখে মুসা বলল, 'দেখি, দাও আমার কাছে।'

পাথরটা মুসার হাতে তুলে দিয়ে বাঁচল রবিন।

কিছুদূর এগিয়ে মুসারও হাঁপ ধরে গেল। বলল, 'খাইছে! এটা পাথর না লোহারে বাবা! দশ টন ওজন হবে!'

তার কথা শেষ হতে না হতেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'ওই দেখো, হিলা মনস্টার!'

'কই, কোথায়!' এতটাই চমকে গেল মুসা, হাত থেকে ছুটে উড়ে গিয়ে পড়ল পাথরটা। লাফ দিয়ে সরে দাঁড়াল সে।

তবে অত চমকানোর কিছু ছিল না। বেশ দূরে রয়েছে গিরগিটিটা। ওদের দিকে তাকাল না। ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে ঢুকল একটা ঝোপের মধ্যে।

কিন্তু পাথরটা আর দেখতে পেল না ওরা। গেল কোথায়?

'ওটাতে পড়ল না তো?' একটা গর্ত দেখিয়ে বলল রবিন।

গর্ত না বলে সরু একটা ফাটল বলা উচিত। বেশ গভীর। দেখা গেল, তার মধ্যেই পড়েছে পাথরটা। তুলতে কষ্টই হলো। সাবধান থাকতে হলো হিলা মনস্টারের ব্যাপারে। গর্তে থাকলে কামড়ে দিতে পারে। আর কামড়ালে মরতে হবে।

মুসা কিছুক্ষণ বহন করার পর পাথরটার ভার নিল কিশোর। ভাগাভাগি করে বয়ে এনে প্লেনে তোলা হলো ওটাকে।

রিভারসাইড কাউন্টি এয়ারপোর্টে যখন পৌঁছল ওরা, বিকেল পাঁচটা বেজে গেছে।

'পেটের মধ্যে নাড়িভূঁড়িও নেই আর আমার,' ঘোষণা করল মুসা। 'এখন গিয়ে সুইমিং পুলে কয়েকটা ডুব, তারপর পেট ভরে গরুর শিককাবাব...'

ম্যানেজার হ্যারল্ড ডিক্সনকে এগিয়ে আসতে দেখে থেমে গেল সে।

কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'তারপর? কেমন কাটল? কি দেখে এলে?'

'হিলা মনস্টার,' জবাব দিল মুসা।

হাসলেন ডিক্সন। 'ও আর এমন কি। কিছুদিন একটা মনস্টার পুষেওছিলাম আমি। বাসন থেকে দুধ খেত ওটা। বেড়ালের মত এসে আমার কোলে উঠত।'

'বলেন কি!' ঢোক গিলল মুসা। 'ওই কুৎসিত প্রাণীটাকে ধরতে খারাপ

লাগত না আপনার?'

'না, লাগত না। ওটাকে শিস দিতে শিখিয়েছিলাম। বেশিদিন আটকে রাখিনি। ছেড়ে দিয়েছি মরুভূমিতে।'

পাথরটা দেখাল তাঁকে রবিন। 'এটা পেয়েছি।'

ডিক্সন বললেন। 'মরুভূমিতে গেলে এ সব পাথর অনেকেই পায়। আমরা একে বলি চাইনিজ জেইড।'

'দামী?'

'আছে। মোটামুটি।'

'আপনার কি মনে হয়, এই পাথরের জন্যে ডাকাতেরা মানুষ খুন করবে? আকাশ থেকে এ সব দেখেই হয়তো নেমেছিল লফার আর ব্রাউন। তারপর ওগুলোর জন্যে খুন হয়েছে। হতে পারে না?'

'চাইনিজ জেইডের জন্যে মানুষ খুন হয়েছে এই এলাকায়, শুনিনি কখনও।'

'তাহলে হয়তো পাথর দেখে কৌতূহলী হয়ে নেমেছিল ওরা, মরুভূমিতে পথ হারিয়েছে। কিংবা জখম হয়ে পর্বতের মধ্যে আটকা পড়েছে।'

শ্রাগ করলেন ডিক্সন। 'জখম হলে একজন হবে, দু-জন হওয়াটা অস্বাভাবিক। সে-ক্ষেত্রে আরেকজন প্লেন চালিয়ে নিয়ে আসতে পারত। আর পর্বতে গেলে টিলার কাছে প্লেন ফেলে যাবে কেন? মরুভূমিতে হাঁটার চেয়ে প্লেন নিয়ে যাওয়াই সহজ।'

তা-ও বটে। চুপ হয়ে গেল রবিন।

কিশোর জানতে চাইল, 'লফারের প্লেনটা এখন কোথায়? জানেন?'

'আমাদের এখানেই,' জবাব দিলেন ডিক্সন।

'একটু দেখা যাবে?'

হেসে বললেন ডিক্সন, 'সূত্র খুঁজতে চাও তো? ওদিককার হ্যাঙ্গারে আছে।' পকেট থেকে চাবি বের করে দিলেন। 'নাও। দেখা হয়ে গেলে ফেরত দিয়ে যেয়ো।'

ম্যানেজারকে ধন্যবাদ দিল কিশোর। পাথরটা আবার প্লেনের ভেতরে রেখে এসে দরজা লাগিয়ে দিল। দুই সহকারীকে নিয়ে রওনা হলো হ্যাঙ্গারের দিকে।

লাল আর সাদা রঙের একটা সুন্দর বিমান লফারের। চার সীট। কেবিনের একদিকের দরজা হাঁ হয়ে খুলে আছে।

ব্যাপারটা অবাক করল রবিনকে। 'দরজা লাগায়নি কেন?'

তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না কেউ।

ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলে খুঁজতে লাগল কিশোর। মুসা গেল মালপত্র রাখার জায়গায়। গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে হাত দিল রবিন। হলদে রঙের একটুকরো কাগজ পেল। পেন্সিলে লেখা নোটটার দিকে একনজর তাকিয়েই চিৎকার করে উঠল সে, 'অ্যাই, দেখে যাও!'

কাগজটাতে কবিতার মত করে লেখা:

তিন গোয়েন্দা সাবধান;
গোলাপের রঙ লাল,
ভায়োলেটের রঙ নীল,
লফারকে কবর দিয়েছি আমরা।
সময়মত না যদি সরো
সেথায় যাবে তোমরাও!

পাঁচ

শিস দিয়ে উঠল মুসা, 'কোন ব্যাটার কাজ!'

'হবে কোন বদমাশ!' জবাব দিল রবিন।

'রসিক বদমাশ,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'এই নোটের কথা ডিক্সনকে বলার দরকার নেই। তবে দরজা খোলা পাওয়া গেছে, এটা জানাতে হবে তাঁকে। দরজা যে খুলেছে, নোটটা সে-ই রেখে গেছে।'

'কিন্তু কখন রাখল? নিশ্চয় রাতের বেলা এক ফাঁকে ঢুকে রেখে গেছে। জানত, কোন না কোন সময় বিমানটাতে তল্লাশি চালাতে আমরা আসবই।'

'তার মানে আমাদের গতিবিধির ওপর পুরো নজর আছে ওর।' কাগজটা যত্ন করে পকেটে রেখে দিল কিশোর। 'মিস্টার সাইমনের সঙ্গে কথা বলা দরকার। চলো, যাই।'

ডিক্সনকে চাবি ফিরিয়ে দিল কিশোর। বিমানটাতে লোক ঢুকেছিল জানাল। তারপর মোটেলে ফিরে ফোন করল রকি বীচে সাইমনের বাড়িতে।

ফোন ধরল কিম। জানাল, মিস্টার সাইমন বাড়িতে নেই। জরুরী কাজে বাইরে গেছেন। কোথায় গেছেন, তা-ও বলতে পারল না। তিন গোয়েন্দার জন্যে একটা মেসেজ রেখে গেছেন।

মেসেজটা কিমকে পড়তে অনুরোধ করল কিশোর।

কিম পড়ল, 'ব্লাইদি থেকে চলে এসো। লস অ্যাঞ্জেলেসে এসে তদন্ত করো। হোটেলে থাকবে, বাড়ি ফেরার দরকার নেই। লফারের অফিস আর তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে খোঁজখবর নাও। আশা করছি, শীঘ্রি তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। ভিকটর সাইমন।'

পরদিন সকালে মালপত্র গোছগাছ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

মোটেলের ম্যানেজার বলল, 'এত তাড়াতাড়িই চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'জায়গাটা ভাল লাগল না। দেখার তেমন কিছু নেই।'

'সব ঠিকঠাক মত নিয়েছ? ফেলে যাওনি তো কিছু?'

'গেলে দয়া করে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন। এই যে রইল

ঠিকানা।'

'ঠিক আছে।'

প্লেনে করে লস অ্যাঞ্জেলেসে আসতে বেশি সময় লাগল না। বিমানটা এয়ারপোর্টে রেখে ট্যাক্সি করে এসে শহরের একটা পুরানো হোটেলে উঠল ওরা।

জানালা খুলে বাইরে মুখ বের করে দিল মুসা। বলল, 'ফায়ার-এসকেপ আছে। আগের দিনে যেমন বানাত লোকে।'

'থাকবেই,' রবিন বলল। 'বাড়িটা বানানো হয়েছে অনেক দিন আগে।'

গোসল সেরে খেয়ে নিল ওরা। মুসা জিজ্ঞেস করল, 'এবার কি করব? কিশোর, মিস্টার ক্রিস্টোফারের দেয়া সেই পাসগুলো তো কোনদিন কাজে লাগল না। এবার লাগালে কেমন হয়?'

এক সময় তিনটে পাস দিয়েছিলেন তিন গোয়েন্দাকে বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার। ওগুলো দেখিয়ে যখন তখন হলিউড কিংবা লস অ্যাঞ্জেলেসের যে কোন স্টুডিওতে শূটিং দেখতে ঢুকতে পারবে ওরা। এবার বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে কিশোরের মনে হয়েছিল, লফারের ব্যবসা যখন লস অ্যাঞ্জেলেসে, এদিকে তদন্তের জন্যে আসতেও হতে পারে। পাসগুলো ব্যবহারের সুযোগ মিলতে পারে তখন।

'মন্দ হয় না,' কিশোর বলল। 'কিন্তু যাব কখন? আমি তো ভাবছি পুলিশ হেডকোয়ার্টারে যাওয়ার কথা। লফারের খোঁজ নিতে।'

'তিনজন একসাথে গিয়ে কি করব? তুমি আর রবিন যাও। আমি বরং স্টুডিওতে চলে যাই।'

হেসে বলল রবিন, 'খুব মনে হয় শূটিং দেখতে ইচ্ছে করছে?'

হোটেল থেকে বেরিয়ে মুসা গেল শূটিং দেখতে। রবিন আর কিশোর চলল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে।

কিন্তু নতুন কিছু জানতে পারল না। একজন পুলিশ সার্জেন্ট কথা বলল ওদের সঙ্গে। বলল, 'লফারের ব্যাপারটা সত্যি অবাক করে দিয়েছে আমাদের। কোনই হদিস নেই। লুক ব্রাউনের ব্যাপারেও কিছু জানি না। ব্রাইদি পুলিশও তেমন কিছু বলতে পারেনি।'

'আপনার কি মনে হয় মিসেস লফার আমাদের সঙ্গে দেখা করবে?'

'করবে। তার স্বামীর ব্যাপারে কেউ আগ্রহ দেখালে খুশি হয় সে। বেচারী! লফারের অফিসে তার সেক্রেটারির সঙ্গেও কথা বলতে পারো ইচ্ছে করলে।'

সার্জেন্টের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার আগে গোয়েন্দাদের সাবধান করে দিয়ে বলল সে, 'বিপদের আশঙ্কা দেখলেই আমাকে জানাবে। কোন রকম ঝুঁকি নিতে যেয়ো না। তার জন্যে পুলিশই আছে।'

সার্জেন্টকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল কিশোররা। হোটেলে ফিরে এল। মুসা ফেরেনি।

রবিন বলল, 'অহেতুক ঘরে বসে না থেকে বরং চলো মুসা কি করছে

দেখে আসি।'

কিশোরের আপত্তি নেই।

কোন স্টুডিওতে যাবে মুসা বলেই গেছে। খুঁজে বের করতে মোটেও বেগ পেতে হলো না। পাস দেখিয়ে ভেতরে ঢুকল কিশোর আর রবিন। সেদিন একটা জায়গাতেই কেবল শূটিং চলছে। মেকসিকোর পটভূমিতে ওয়েস্টার্ন ছবির শূটিং। লোকজনের ভিড়ে মুসাকে কোথাও দেখতে পেল না ওরা।

সেটের মাঝখানে অনেক লোক জটলা করছে। সবাই বেশ লম্বা, মাথায় চওড়া কানাওয়ালা মেকসিকান হ্যাট। কারও পরনে রঙচটা নীল জিনসের প্যান্ট, গায়ে ডেনিম জ্যাকেট; কারও এমব্রয়ডারি করা পোশাক। কোমরে রূপার বাকলেসওয়ালা চকচকে চামড়ার বেল্ট, পায়ে চামড়ার বুটজুতো। মেয়েদের পরনে উজ্জ্বল রঙের পোশাক। একটা দৃশ্যের শূটিঙের জন্যে প্রস্তুত হয়েছে সবাই।

এককোণে দু-জন লোককে কথা বলতে দেখল রবিন। একটু পর সরে এল একজন। চিনতে পারল রবিন। আরি, ওই তো মুসা! মাথায় সমব্রেরো হ্যাট।

হাত নেড়ে ডাকল তাকে রবিন। নিজেও এগিয়ে গেল।

বন্ধুদের দেখে মুসাও এগিয়ে এল। 'বাহ্, তোমরাও এসে গেছ দেখছি!'

'লোকটা কে, মুসা?' জানতে চাইল কিশোর। কোণের দিকে তাকিয়ে আর দেখতে পেল না ওকে। অভিনেতাদের ভিড়ে মিশে গেছে।

'এমন কেউ না, একজন এক্সট্রা,' মুসা বলল। 'ডাকাত দলের একটা দৃশ্যে অভিনয় করতে এসেছিল। আমার মাথায় সমব্রেরো হ্যাট দেখে বলল চেষ্টা করলে আমিও এক্সট্রার কাজ পেতে পারি। করেছি। পাইনি।' নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। 'পরিচালক বললেন, হয়ে গেছে, আর লোক লাগবে না।'

'তাহলে আর বসে আছ কেন? চলো, যাই।'

'হ্যাঁ, চলো। ব্যাংকেও যেতে হবে, বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই।'

'ব্যাংকে?' ভুরু কোঁচকাল কিশোর।

'যে লোকটা এক্সট্রা সেজেছে সে একটা চেক দিয়েছে। কাজ ফেলে বেরোতে পারবে না। তাই আমাকে অনুরোধ করল, একটা চেক দেবে; সেটা নিয়ে আমি যেন তাকে নগদ টাকা দিই। সে বেরোতে বেরোতে ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু টাকাটা তার আজই দরকার। পকেটে যা ছিল দিয়ে দিলাম। সে আমাকে চেক সই করে দিল।'

'বোকামি করোনি তো?' রবিন বলল। 'আজকাল কত রকম অসুবিধে হচ্ছে। প্রায়ই চেক জাল হয়।'

'কি করব, এমন করে ধরল। তবে এটা হবে না, সরকারি চেক। দেখো, ইউনাইটেড স্টেটস গভর্নমেন্ট ছাপ দেয়া।'

বেরোল ওরা। একটা ব্যাংক দেখে দু-জনকে দাঁড়াতে বলে ভেতরে চলে গেল মুসা। কয়েক মিনিট পর ব্যাংকের একজন দারোয়ান বেরিয়ে এসে

জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের নাম কিশোর আর রবিন?'

'হ্যাঁ, কেন?' জবাব দিল কিশোর।

'ভেতরে আসতে হবে। বিপদে পড়েছে তোমাদের বন্ধু। তোমাদের নাম বলল।'

ক্যাশিয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। ওদের দেখেই উত্তেজিত স্বরে বলল, 'আমাকে চেক নিতে দেখেছ না তোমরা! ক্যাশিয়ার সাহেব বিশ্বাস করছে না, তাকে বলো!'

রবিন বলল, 'তখনই সন্দেহ হয়েছিল আমার, বোকামি করেছ!'

কার কাছ থেকে কি ভাবে চেকটা নিয়েছে ক্যাশিয়ারকে বুঝিয়ে বলল সে আর কিশোর।

বিশ্বাস করল ক্যাশিয়ার। দারোয়ানকে বলল মুসাকে ছেড়ে দিতে।

কিশোর জানতে চাইল, 'চেকটাতে কি গোলমাল?'

'জাল, আরকি। ইদানীং বেশ কিছু জাল চেক পেয়েছি আমরা। সে-জন্যেই সাবধান থাকতে হচ্ছে। যাই হোক, ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের কাছে এটা পাঠিয়ে দেব।'

'কিন্তু আমার টাকার কি হবে?' ককিয়ে উঠল মুসা। 'পকেট তো খালি করে দিয়ে দিয়েছি!'

'কি আর করবে, কপাল খারাপ তোমার। বোকামির ফল,' সহানুভূতির সুরে বলল ক্যাশিয়ার। 'তোমাদের কথা বিশ্বাস করে যে ছেড়ে দিলাম, বরং সেইটা ভাব। পুলিশের কাছে তুলে দেয়াটাই স্বাভাবিক ছিল না?'

কিশোর বলল মুসাকে, 'জলদি চলো! লোকটাকে ধরতে হবে!'

'চলো,' রাগ করে বলল মুসা, 'ব্যাটার কপালে দুঃখ আছে! ধরতে পারলেই হয়! আমি করলাম ভালমানুষী, আর আমাকে এমন করে ঠকাল!'

রাস্তায় বেরিয়ে দৌড় দিল তিনজনে। স্টুডিওর গেটে ওদের কাছে পাস চাইতে গেল দারোয়ান, পাত্তাই দিল না ওরা। ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে ঢুকে গেল। সোজা চলে এল সেটের কাছে, যেখানে ছবির শুটিং হচ্ছে।

গায়ে গায়ে লেগে থাকা ভিড়ের জন্যে লোকটাকে চোখে পড়ল না মুসার। ভাবল ভেতরেই কোথাও আছে। ধাক্কা দিয়ে লোক সরিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল সে। চিৎকার করে উঠল এক মহিলা। কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে পড়ে যেতে যেতে বাঁচল দু-জন লোক। রাগে, বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল ওরা। কয়েকজনের হাতে পিস্তল, ওপর দিকে তুলে ফাঁকা গুলি করতে শুরু করল, মজা করার জন্যে। বেড়ে গেল চিৎকার-চেঁচামেচি। শিস দিয়ে উঠল কে যেন।

ভিড় থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আছেন নীল ব্যারেট ক্যাপ পরা ছোটখাট একজন মানুষ। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'কাট্! কাট্! কাট্!'

একজন বিশালদেহী অভিনেতাকে নিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে শুরু করেছে মুসা। ভিড়ের মধ্যে তাকে ঢুকতে বাধা দিয়েছিল লোকটা। অনেক

টানা-হ্যাঁচড়া করে দু-জনকে আলাদা করা হলো।

এগিয়ে এলেন নীল টুপি পরা ভদ্রলোক। চোখের তারা উজ্জ্বল। দেখেই চিনে ফেলল মুসা। বিড়বিড় করল আনমনে, 'খাইছে! পরিচালক! এইবার বারোটা বাজাবেন আমার!'

ঠকা খেয়ে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল তার, সে-জন্যেই এ রকম একটা কাণ্ড ঘটাতে পেরেছে।

মুসার সামনে দাঁড়িয়ে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলালেন পরিচালক। মুসাকে বিমূঢ় করে দিয়ে আচমকা তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'দারুণ! দুর্দান্ত অভিনয়, ইয়াং ম্যান! এই জিনিসই চাচ্ছিলাম আমি! ভিড়ের মধ্যে গণ্ডগোল! একেবারে বাস্তব হয়েছে দৃশ্যটা!'

তোতলাতে শুরু করল মুসা, 'কি-কি-কিন্তু আমি তো অভিনয় করিনি! ম্যাট উইগুসর নামে একটা লোককে খুঁজতে ঢুকেছিলাম। আমাকে ঢুকতে বাধা দিল ওরা, তাই খেপে গিয়েছিলাম।'

সেটের চারপাশে চোখ বোলালেন পরিচালক। 'বোধহয় চলে গেছে। তুমি আসার একটু আগে শটটা নেয়া শেষ করেছি, যেটাতে ম্যাট অভিনয় করছিল। শেষ হতেই চলে গেছে।'

মুসার চেহারা দেখে মনে হলো ধসে পড়বে সে। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ডাকাতি করে নিয়ে গেছে আমার সব টাকা! ক্যামেরাটা বিক্রি করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই এখন!'

এগিয়ে এল কিশোর। মুসার হাত ধরে টান দিল, 'পাগল হয়ে গেলে নাকি? এসো।'

ভিড়ের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল, 'টাকার জন্যে ক্যামেরা বিক্রি করতে হবে কেন তোমার? আমরা আছি না?'

রবিন যোগ করল, 'তা ছাড়া এই কেসের জন্যে ওরকম একটা ক্যামেরা আমাদের দরকার হতে পারে।'

কিশোর বলল, 'একটু দাঁড়াও। আমি পরিচালকের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে আসি।'

পরিচালককে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ম্যাট উইগুসর কোথায় থাকে জানেন?'

'না। অফিসে খোঁজ করতে পারো। হয়তো ওদের কাছে ঠিকানা আছে।'

কিন্তু অফিসের ওরাও কিছু বলতে পারল না। লোকটা ভবঘুরে টাইপের। মাঝে মাঝে এসে উদয় হয়। অভিনয়ের কাজ পেলে করে। নগদ টাকায় পাওনা বুঝে নিয়ে চলে যায়।

মুসার টাকাটা উদ্ধারের আর কোন উপায় দেখল না কিশোর। স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

হোটেলে ফিরে খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকটা শান্ত হলো মুসা। টাকার শোকের চেয়ে ঠকা খাওয়ার শোকটাই তার বেশি। বলল, লস অ্যাঞ্জেলেসে

তার এক চাচা থাকেন, তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

মুসা চলে গেল চাচার বাড়িতে, রবিন আর কিশোর চলল মিসেস লফারের সঙ্গে দেখা করতে।

পরিচয় পেয়ে গোয়েন্দাদের স্বাগত জানিয়ে বসার ঘরে নিয়ে এল মিসেস লফার। বেশ সুন্দরী। বয়েস কম। স্বামীর জন্যে খুবই চিন্তিত। চোখের কোণে কালি পড়ে গেছে।

নয় বছরের একটা ছেলে ঢুকল ঘরে। বাদামী চুল। মুখ ভর্তি তিল। অস্বস্তি নিয়ে তাকাতে লাগল কিশোর আর রবিনের দিকে।

আরও একটা ছেলে ঢুকল, তার বয়েস সাত। বোঝা গেল বড় ছেলেটার ভাই।

বড়টার নাম পল, ছোটটা নেল, গোয়েন্দাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ওদের মা। আদর করে বলল, 'তোমরা একটু ওঘরে যাও। আমি কথা বলে আসি।'

ছেলে দুটো চলে গেলে করুণ স্বরে মিসেস লফার বলল, 'বাপের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে ওরা। বুঝতেই পারছি না কি ঘটল! তোমরা তার খোঁজ এনে দিতে পারলে চির কৃতজ্ঞ থাকব তোমাদের কাছে!'

'আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করব আমরা,' কিশোর বলল।

মিসেস লফারের কাছেও নতুন কিছু জানতে পারল না ওরা। কেবল একটা ব্যাপার—সঙ্গে করে বাড়তি কাপড় নেয়নি লফার। তারমানে বাইরে কোথাও থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে যায়নি সে।

লফারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তার অফিসে চলে এল কিশোররা। দোতলার একটা দরজায় দেখা গেল নেমপ্লেট। টোকা দিল কিশোর।

সোনালি চুল এক মহিলা দরজা ফাঁক করল। বয়েসে তরুণী, সাতাশ-আটাশ হবে। লফারের সেক্রেটারি, আন্দাজ করল কিশোর।

'কি চাই?' জানতে চাইল মহিলা।

'দেখুন, আমরা মিস্টার লফারের ব্যাপারে কয়েকটা কথা জানতে এসেছি।'

কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল সেক্রেটারি।

ছয়

'শুনুন, শুনুন!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর।

আবার ফাঁক হলো দরজা। আগের চেয়ে কম। ভয় পেয়েছে মহিলা।

'ভয় নেই, আমাদের ঢুকতে দিন,' কিশোর বলল। 'আমরা মিসেস লফারের কাছ থেকে এসেছি।'

দ্বিধা করল মহিলা। 'কি করে বিশ্বাস করব?'

'ফোন করুন। জিজ্ঞেস করুন কিশোর আর রবিন তাঁর কাছে গিয়েছিল কিনা?'

দরজা বন্ধ হয়ে গেল আবার। অপেক্ষা করতে লাগল দুই গোয়েন্দা। খুলল পাঁচ মিনিট পর। ভয় চলে গেছে মহিলার। ডাকল, 'এসো।'

কিশোররা ঢুকতে আবার দরজা লাগিয়ে একেবারে তালা দিয়ে দিল সে। আর কেউ নেই ঘরে। ছোট ডেস্কে রাখা নেমপ্লেট দেখে জানা গেল মহিলা লফারের সেক্রেটারি, এবং তার নাম মিস পলা লয়েড।

কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে পলা বলল, 'তোমাদের দেখেই বুঝেছি, তোমরা খারাপ নও। কিন্তু সকালে এসেছিল দু-জন, মিস্টার লফারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার জন্যে, ওরা ভয়ঙ্কর। কলজের পানি শুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল আমার। তারপর থেকে আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। দরজায় তালা দিয়ে রাখি সারাক্ষণ।'

'কারা ওরা?' জানতে চাইল রবিন, 'পুলিশ?'

'না। বিশালদেহী দু-জন লোক, রুক্ষ ব্যবহার। কাপড়-চোপড় ভাল না। ডাকাতের মত আচরণ করছিল। আগে জানলে ঢুকতে দিতাম না। এসে যখন বলল মিস্টার লফারের ব্যাপারে কথা বলতে চায়, ভাবলাম গোয়েন্দা-টোয়েন্দা হবে।'

চট করে পরস্পরের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা।

কিশোর বলল, 'মিস্টার লফারের খোঁজ করছিল?'

'হ্যাঁ, করছিল,' পল বলল। 'মিস্টার লফারের অফিসের ফাইল, রেকর্ড আর তাঁর কাছে আসা চিঠিপত্র দেখাতে আমাকে বাধ্য করল।' কব্জি মুচড়ে ধরেছিল, কালশিটে পড়ে আছে, দেখাল সে।

'হুঁ,' মাথা দোলাল রবিন, 'তারমানে বাজে লোকই ওরা। পুলিশকে জানিয়েছেন?'

'না,' মাথা ঝাঁকাল পল। 'আমাকে হুমকি দিয়ে গেছে পুলিশকে জানালে আস্ত রাখবে না।'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'আমাদের যারা হুমকি দিয়েছে মনে হচ্ছে তাদের দলেরই লোক।'

'হতে পারে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'তবে লফারের খোঁজখবর নিতে যখন এসেছে, ধরে নেয়া যায় ওরা তাকে বন্দি করেনি। তবে কি অন্য কোন দলের হাতে পড়েছে লফার?'

সাদা হয়ে গেল পলের মুখ। 'কি বলছ তোমরা এ সব!'

'সবই আমাদের অনুমান। মিস লয়েড, মিস্টার লফার লোক হিসেবে কেমন, বলুন তো? তাকে কি পছন্দ করেন আপনি?'

ভুরু কাছাকাছি হয়ে গেল পলের। 'ইয়ে, বছরখানেক আগে প্রথম যখন এখানে চাকরিতে ঢুকি তখন তো খুবই ভাল মনে হত। হাসিখুশি, সদা ব্যস্ত একজন মানুষ। শাঁই শাঁই করে ব্যবসায়ে উন্নতি হচ্ছে। সংসারে অশান্তি

নেই। পছন্দ করার মতই একজন মানুষ। তারপর হঠাৎ করে বদলে গেলেন তিনি।'

'কি রকম?'

'বদমেজাজী হয়ে গেলেন। চেয়ারে বসে বসে কি চিন্তা করতেন। কাউকে সহ্য করতে পারতেন না। কেউ কাজের কথা বলতে এলেও তাকে ধমকাতে শুরু করতেন। যারা মাল কিনতে আসত, তাদেরও যেন বিশ্বাস করতে পারতেন না। ভঙ্গি দেখে মনে হত, প্রতিটি লোক যেন তাঁকে ঠকানোর জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। সবাইকে সন্দেহ করতেন।'

'এ সব করার পেছনে কোন কারণ ছিল?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ছিল। খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তার। তার এক বন্ধুর সঙ্গে পার্টনারশিপে আরেকটা ব্যবসা শুরু করতে চেয়েছিলেন। কলেজে পড়ার সময় থেকে দু-জনের বন্ধুত্ব। হঠাৎ করে সমস্ত টাকা মেরে দিয়ে ইয়োরোপে চলে গেল বন্ধুটি। মিসেস লফার এ সব খবর জানেন না। দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়বে বলে তাঁকে বলেননি মিস্টার লফার।'

'সেই বন্ধু ঠকিয়ে চলে যাওয়ার পর লুক ব্রাউনকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতেন না লফার। বলতেন, ব্রাউনের মত দুঃসাহসী বন্ধু হয় না। তারপর দু-জনেই গায়েব হয়ে গেলেন একদিন।'

'লুক ব্রাউন কি কাজ করতেন?' জানতে চাইল কিশোর। 'ব্যবসা?'

'বলতে পারব না। তবে কোথায় থাকত, জানি। ঠিকানা দিচ্ছি, তোমরা পারলে খবর নাওগে।'

নোটবুকে ঠিকানা লিখে নিল রবিন। জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, দুঃসাহসী বন্ধু বলে কি বোঝাতে চেয়েছেন, মিস্টার লফার?'

মাথা নাড়ল সেক্রেটারি। 'তা তো বলতে পারব না।'

কিশোর বলল, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিস লয়েড। এক কাজ করুন, পুলিশকে ফোন করে সব কথা বলুন। লোকগুলোর হুমকির পরোয়া করবেন না। আবার এসে গণ্ডগোল করতে পারে। পুলিশই আপনাকে নিরাপত্তা দিতে পারবে। মিস্টার লফারের ব্যাপারে আর কিছু বলতে পারবেন আমাদের?'

'আর? তার হবির ব্যাপারে বলতে পারি।'

'বলুন?'

'ঘোড়ার প্রতি আগ্রহ ছিল তাঁর। শেটল্যাণ্ড পনি পুষতেন। এতে কোন কাজ হবে তোমাদের?'

'হতে পারে, বলা যায় না।'

মহিলাকে আবারও ধন্যবাদ দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।

হোটেলে ফিরে লিফট থেকে নেমে নিজেদের রুমের দিকে এগোল। করিডরের শেষ মাথায় একজন লোককে দেখা গেল। গায়ে খাটো লাল জ্যাকেট। কোমরের বেল্টে চকচকে পালিশ করা তামার বাকলেস।

লোকটাকে চেনা চেনা লাগল। চাবি দিয়ে দরজার তালা খুলতে খুলতে রবিনকে প্রশ্ন করল কিশোর, 'কে ও?'

'বেয়ারা-টেয়ারা হবে,' জবাব দিল রবিন।

ঘরে ঢুকেই থমকে গেল কিশোর। মনে পড়েছে। চেঁচিয়ে বলল, 'আরে ওই লোকটাই তো! যার ছবি তুলেছে মুসা, জঞ্জালের আড়ালে ঘাপটি মেরে ছিল! ওকে ধরতে হবে!'

ছুটে বেরিয়ে এল দু-জনে।

কিন্তু নেই লোকটা। চলে গেছে।

লিফটের অপেক্ষা না করে দৌড়ে নিচে নামল ওরা। লোকটাকে দেখা গেল না। ডেস্কে বসা ক্লার্কের দিকে এগোল কিশোর। লোকটার ছবিটা মানিব্যাগে রেখেছে। বের করে ক্লার্ককে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই লোক কি আপনাদের এখানে চাকরি করে?'

ভাল করে দেখে মাথা নাড়ল ক্লার্ক, 'না, কখনও দেখিইনি একে।'

'কিন্তু এইমাত্র আমাদের ঘরের করিডরে দেখে এলাম! হোটেলের বেয়ারার পোশাক পরা।'

'দাঁড়াও, দেখছি।' খানিক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন পোর্টারকে ডাকল ক্লার্ক, 'ভিক, শোনো তো?' পোর্টার কাছে এলে ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'একে হোটেলে ঢুকতে দেখেছ? ওপরতলায় নাকি উঠেছিল। আমাদের বেয়ারার পোশাক পরা।'

অবাক হলো পোর্টার। 'কই, দেখিনি তো?'

'তাহলে পোশাক পেল কোথায়?' রবিন বলল, 'নিশ্চয় চুরি করেছে আপনাদের স্টোর থেকে।'

'তা করতে পারে,' ক্লার্ক বলল। 'এই লোকটার বয়েস চল্লিশ হবে। আমাদের কোন বেয়ারাই এত না। দাঁড়াও, হাউস ডিটেকটিভকে বলছি।'

ডিটেকটিভের সঙ্গে দুই গোয়েন্দাও লেগে রইল। কোনখান থেকে পোশাক চুরি করে কোথায় বদলেছে, বের করা হলো। সিঁড়ি, চিলেকোঠা, এবং মানুষ লুকিয়ে থাকা যায় এ রকম সবখানে খুঁজে দেখা হলো। কিন্তু পাওয়া গেল না লোকটাকে।

হতাশ হয়ে নিজেদের ঘরে ফিরে এল দুই গোয়েন্দা। সঙ্গে সঙ্গে এল ডিটেকটিভ। জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা দেখতে কেমন?'

আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর, 'বা-বা, আসল কথাটা জিজ্ঞেস করছে এতক্ষণে। এই লোক আর কি ডিটেকটিভগিরি করবে!' নীরবে ছবিটা বাড়িয়ে দিল সে।

দেখল ডিটেকটিভ। এই চেহারার কাউকে দেখতে পেলে গোয়েন্দাদের জানাবে, কথা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

'পালাল কি করে ব্যাটা?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল রবিন।

'হয়তো কোন ঘরের ফায়ার-এসকেপ দিয়ে।'

হাতমুখ ধুয়ে, খানিক বিশ্রাম নিয়ে, নাস্তা খেয়ে আবার বেরোল দুই গোয়েন্দা। পলার দেয়া ঠিকানা মোতাবেক লুক ব্রাউনের বাড়িতে যাবে।

নিজের বাড়ি নয়, একটা বোর্ডিং হাউসে ভাড়া থাকত ব্রাউন। হাউসের মালিক এক মহিলা, দরজা খুলে দিল। কথা বলে অতিরিক্ত। ভীষণ মোটা, বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়েছে, পাক ধরতে শুরু করেছে চুলে। নাম মিসেস টোবারগট।

কিশোরদেরকে বসার ঘরে নিয়ে এল মহিলা। রান্নাঘর থেকে আসছে খাবারের সুগন্ধ। নিশ্চয় রান্না করছিল মিসেস টোবারগট।

লুক ব্রাউনের ব্যাপারে জানতে চাইল কিশোর।

'মিস্টার ব্রাউন?' মহিলা বলল, 'ওর ব্যাপারে তো কত কথাই জানি। ভাল বোর্ডার ছিল। আমার রান্না খুব পছন্দ করত। তা শুধুমুখে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি কেন? এক কাপ চা অন্তত দেয়া উচিত।'

বিনয়ের সঙ্গে চা খাওয়াটা এড়াতে চাইল কিশোর। কিন্তু কোনমতেই শুনল না মিসেস টোবারগট। চা তো আনলই, তার সঙ্গে নিজের তৈরি বিস্কুটও নিয়ে এল।

'মানুষকে খাওয়াতে আমার খুব ভাল লাগে,' মিসেস টোবারগট বলল। 'খাওয়ার জন্যে কত চাপাচাপি করেছি ব্রাউনকে, মোটা বানাতে চেয়েছি। কিন্তু যে হাড্ডি সেই হাড্ডি। আমার দেয়া সব খাবার খেত, কিচ্ছু ফেলে রাখত না। কিন্তু তালপাতার সেপাই থেকে বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়নি তার। অবাক কাণ্ড! আরি, খাচ্ছ না কেন? একটা বিস্কুটও ফেলে রাখা চলবে না। তোমাদের বয়েসী ছেলেদের অনেক বেশি খেতে হয়। নইলে শরীর টেকে না।'

'খাচ্ছি তো,' আরেকটা বিস্কুট নিতে নিতে বলল কিশোর। 'খুব ভাল বানিয়েছেন। হ্যাঁ, ব্রাউনের কথা বলুন।'

'কি আর বলব, এক আজব লোক ছিল! সারাক্ষণই বাইরে যেত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেরোত। আসত আর যেত, যেত আর আসত, একেবারে যেন চড়ুই পাখি। এত ঘোরাফেরা করত বলেই বোধহয় স্বাস্থ্য ভাল হত না। চুলও পাতলা হয়ে যাচ্ছিল।'

'কাজ করত কখন?' জানতে চাইল রবিন। 'কিছু তো একটা নিশ্চয় করত। নইলে আপনার ঘর ভাড়া দিত কি করে?'

'কি জানি কি করে! সেটা আরেক আশ্চর্য! ভাড়াটেদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনও তাদের কাছে জানতে চাই না আমি। আরি, চুপ করে আছ কেন? বিস্কুটগুলো শেষ করো। খাও, খাও, লজ্জা নেই, আরও এনে দেব।'

মুসাকে দরকার ছিল, তাহলে খাইয়ে শান্তি পেত মিসেস টোবারগট—ভাবল রবিন।

কিশোর বলল, 'তাহলে বলছেন খুব ভাল বোর্ডার ছিল ব্রাউন?'

'ছিল। একটা পয়সা বাকি রাখেনি আমার। আর রাখবে কি, ছয় মাসের খাবারের খরচ সহ ভাড়া অগ্রিম দিয়ে দিয়েছিল। সে-ই বরং আমার কাছে

পায়। টাকার বোধহয় কোন মায়া ছিল না তার।'

'বিস্কুটগুলো আপনার দারুণ!' আরেকবার প্রশংসা করল কিশোর। 'হুঁ, তা বাইরে যে যাচ্ছে, আপনাকে বলেছিল ব্রাউন?'

'হয়তো বলেছিল, আমার মনে নেই। থাকবে কি? এত বেরোয় যে লোক, সে বাইরে যাওয়ার কথা বললে কারও খেয়াল থাকে নাকি? মাঝে মাঝেই দীর্ঘদিনের জন্যে বেরিয়ে যেত।'

হঠাৎ দু-জনকে অবাক করে দিয়ে সামনে ঝুঁকল মিসেস টোবারগট। স্বর নামিয়ে বলল, 'মনে হয় রাজনীতি বা কোন বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত ছিল সে! ওই যে ল্যাটিন-আমেরিকান দেশগুলো আছে না, ওসব দেশে তো সব সময়ই গণ্ডগোল লেগে থাকে। আমার ধারণা, ওখানকার কোন দলের সঙ্গে জড়িত ছিল। আমি যে বললাম কাউকে বলে দিয়ো না আবার!'

'না না, বলব না!' সতর্ক হলো কিশোর। 'কি করে বুঝলেন?'

'তার ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে এমন সব ছবি দেখেছি, তাতেই মনে হয়েছে। প্লেনের মধ্যে তোলা তার ছবি, ওই প্লেনগুলো আবার ব্যবহার হয় যুদ্ধের সময়। মাথায় ইয়াবড় হ্যাট তার, হ্যাটের কানা তো না, যেন গরুর গাড়ির চাকা। তার সঙ্গে আরও লোক আছে। সবার কোমরেই গুলির বেল্ট, খাপে ঝোলানো পিস্তল। আরি, বিস্কুট খাও না কেন?'

'কই, খাচ্ছি তো!' মহিলার কথা শুনতে শুনতে কৌতূহলে চিবানো থামিয়ে দিয়েছিল কিশোর, আবার কামড় বসাল হাতের বিস্কুটে।

'হুঁ, বোঝা গেছে। এই জন্যেই লফার বলত তার দুঃসাহসী বন্ধু,' রবিন বলল।

নামটা চিনতে পারল মিসেস টোবারগট। বলল, 'হ্যাঁ, ওই ভদ্রলোককেও এখানে নিয়ে আসত ব্রাউন।' মহিলার মুখ দেখে মনে হচ্ছে এ সব খবর বলতে পারায় তার খুশিই লাগছে। 'মিস্টার লফারই আমাকে বলেছে কি সাংঘাতিক যোদ্ধা তার বন্ধু লুক ব্রাউন, কি ভাবে বিদেশীদের হয়ে লড়াই করেছে। ব্রাউনের কাছে এ সব কাজ নাকি রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের মত। বন্ধুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যেত ভদ্রলোক।'

'লড়াইটা কোন দেশে করেছে, আপনি জানেন, মিসেস টোবারগট?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'নাহ্। মনে থাকে না। তবে একটা জিনিস দেখাতে পারি তোমাদের, দেখো কিছু আন্দাজ করতে পারো কিনা। বিস্কুটগুলো কিন্তু শেষ করতে হবে, নইলে দেখাব না,' হুমকি দিয়ে, উঠে চলে গেল মিসেস টোবারগট।

মহিলা চলে যাওয়ার পর রবিন বলল, 'কত রকম মানুষ যে থাকে দুনিয়ায়! বেশির ভাগ মানুষই মানুষকে খেতে দিতে চায় না; কিন্তু জোর করে খাওয়াতে চায়, এমন মানুষ এই প্রথম দেখলাম। এত বিস্কুট, শেষ করি কি করে? তুমি খেয়ে ফেলো।'

'আমি পারব না।' হাত মুছতে দেয়া কাগজে বিস্কুটগুলো মুড়ে পকেটে রেখে দিয়ে হাসল। 'মুসার জন্যে নিয়ে নিলাম। মিসেস টোবারগট ভাববে

আমরাই খেয়ে ফেলেছি।'

'মুসাকে আনলে খুব ভাল হত। কত খেতে পারে দেখা যেত।'

মিসেস টোবারগট ফিরে এল। খালি প্লেট দেখে বেজায় খুশি। বলল, 'বাহ্, এই তো চাই! না খাওয়া মানুষদের আমার একদম পছন্দ না। নাও, জিনিসটা তোমাদের দিয়েই দিলাম।'

কিশোরের তালুতে একটা তামার মুদ্রা ফেলে দিল সে। 'ঝাড়ু দিতে গিয়ে ব্রাউনের ড্রেসিং টেবিলে পেয়েছি এটা। মনে হলো বিদেশী জিনিস। খুব পছন্দ হলো আমার। স্যুভনির হিসেবে রাখতে চাইলাম। তাকে সে-কথা বলতেই দিয়ে দিল আমাকে।'

মুদ্রার লেখা পড়ল কিশোর, 'রিপাবলিকা ডি মেকসিকো!' মুখ তুলে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিসেস টোবারগট। আজ তাহলে উঠি।'

হোটেলে ফিরে ওরা দেখল, মুসা এসে বসে আছে। মিসেস টোবারগটের বিস্কুট খাওয়ানোর কাহিনী শুনে তো কিশোরদের সঙ্গে গেল না বলে আফসোসেই বাঁচে না সে।

ব্রাউনের কথা সব শোনার পর বলল, 'খাইছে! বলো কি! মেকসিকোয় বিদ্রোহীদের প্লেন চালিয়েছে ব্রাউন!'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল। 'আর রিপ্লি শহরটা মেকসিকো থেকে দূরে নয়।'

একটা ম্যাপ বের করে এনে মেঝেতে বিছাল সে। তিনজনেই ঝুঁকে এল তার ওপর। আঙুল রেখে দেখাল কিশোর, 'এই যে দেখো কলোরাডো নদী কোন দিকে বয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে এই নদী দিয়েই বোটে করে মেকসিকোতে চলে গেছে লফার আর ব্রাউন।'

'নতুন বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়েনি তো ব্রাউন?' রবিনের প্রশ্ন। 'কিংবা অন্য কোনো বেআইনী কাজে?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'সেটাই জানতে হবে আমাদের!'

সাত

'সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে এখন তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে আমাদের,' কিশোর বলল। 'প্রথমে ধরা যাক সেই পাথরটার কথা, মরুভূমিতে যেটা পেয়েছি। হয়তো দামী পাথরের খোঁজে মরুভূমিতে গিয়েছিল লফার আর ব্রাউন। সেখানে ডাকাতের কবলে পড়ে ওরা। আরেক হতে পারে, ব্রাউনের কথায় পটে গিয়ে তার সঙ্গে বোটে করে মেকসিকোতে চলে গেছে লফার।

'সুতরাং আমাদের প্রথম কাজ হবে মরুভূমিতে গিয়ে আরও সূত্র খোঁজা। টিলার ওপরের ছবিটাতে কোনো ইঙ্গিত থাকতে পারে। ওখানে কিছু না পেলে একটা বোট নিয়ে কলোরাডো নদী ধরে আমরাও চলে যাব

মেকসিকোতে।'

'গুড আইডিয়া!' খুশি হয়ে বলল মুসা। 'শুনেছি কলোরাডো নদীর কৈ মাছ নাকি দারুণ টেস্ট। মাছ ধরার সরঞ্জাম নিয়ে যাব আমরা। তিনটে কাজ হবে তাতে। মাছ শিকারের আনন্দ পাব, তাজা খাবারও পাব, আর লোকে দেখলে ভাববে আমরা মাছ ধরতে বেরিয়েছি।'

হাততালি দিল রবিন। 'বাহ্, চমৎকার! বুদ্ধি খুলে যাচ্ছে দেখছি তোমার!' কিশোরের দিকে তাকাল। 'কিন্তু কথা হলো, নদী ধরে গিয়ে লাভটা কি হবে আমাদের?'

'লাভ?' কিশোর বলল, 'নদীপথে লফাররা গেলে অনেক সময় লেগেছে নিশ্চয়, কারও না কারও চোখে পড়েছে। যেখানেই লোকালয় দেখব, জিজ্ঞেস করতে করতে যাব আমরা। মেকসিকোতে ঢোকার জন্যে অনুমতি লাগবে আমাদের। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকেই নিতে সুবিধে।'

বার্থ সার্টিফিকেট আর অন্যান্য কাগজপত্র নিয়ে মেকসিকান দূতাবাসে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। অনুমতি পেতে অসুবিধে হলো না। হোটেলে ছেড়ে দিয়ে চলে এল এয়ারপোর্টে। বিমান নিয়ে আবার ফিরে চলল রিভারসাইড কাউন্টি এয়ারপোর্টে।

বিমান বন্দরে প্লেন রেখে ট্যাক্সিতে করে ব্লাইদিতে চলে এল। রবিন বলল, 'আগে থেকেই একটা বোট ভাড়া করে রাখলে হয় না?'

ট্যাক্সিতে করেই নদীর ঘাটে চলে এল ওরা। নানা রকম বোট বাঁধা আছে। মুসা বলল, 'তোমরা নৌকা ঠিক করোগে। আমি খাবারের ব্যবস্থা করি। কতদিন বোটে থাকতে হবে, কে জানে। খাবার লাগবে।'

সুপারমার্কেটের দিকে চলে গেল মুসা।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে অন্য দু-জন চলল বোট ভাড়া করতে।

লাল-সাদা রঙ করা একটা বোট পছন্দ হলো ওদের। দুই ইঞ্জিন বসানো। ওরা যে কাজে যাচ্ছে, তাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে। বাড়তি একটা ইঞ্জিন অনেক কাজে দেবে।

পুরানো ধরনের আঁটো পোশাক পরা এক লোক ডেকে বসে ছুরি দিয়ে কাঠ চেঁছে একটা পুতুল বানাচ্ছে। একবার মুখ তুলে চেয়েই আবার নামিয়ে নিল। কাজ বন্ধ করল না।

'বোটটা কি ভাড়া হবে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হয়তো,' জবাব দিল লোকটা।

'যতদিন ইচ্ছে রাখতে পারব?'

আবার জবাব, 'হয়তো।'

'দিন দুয়েকের মধ্যে লাগবে। দেয়া যাবে?'

'হয়তো।'

'ঠিক আছে। তাহলে ওই কথাই রইল। দু-দিন পর এসে নেব। ঠিকঠাক পাওয়া যাবে তো?'

'হয়তো।'

বোট থেকে নেমে হাসতে শুরু করল রবিন। 'হয়তো ছাড়া শকুনটা আর কোন শব্দ জানে না নাকি?'

'হয়তো,' হেসে জবাব দিল কিশোর।

মুসার খোঁজে সুপার মার্কেটের দিকে এগোল ওরা। কিছুদূর এগোতে খাবারের নানা রকম প্যাকেটের বিশাল এক চলমান বোঝা চোখে পড়ল ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না, কেবল বোঝাটার ওপরে পরিচিত একটা সমব্রেরো হ্যাট বসানো। আরও কাছে এসে পরিচিত গলায় কথা বলে উঠল বোঝা, 'অ্যাই, কিশোর!'

হঠাৎ করে বিস্ফোরিত হলো খাবারের বোঝা। প্যাকেট, টিন, ছিটকে পড়তে লাগল চারদিকে। বৃষ্টির মত এসে পড়ল রবিন আর কিশোরের কাঁধে। ওসবের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মুসা আমান। 'চোর! চোর!' বলে চিৎকার করে দৌড় দিল রাস্তা দিয়ে।

কিন্তু 'চোরটা' দৌড় দেয়ার কোন চেষ্টা করল না। সহজেই তাকে ধরে ফেলল মুসা। ছোটখাট একজন মানুষের কলার চেপে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল, 'চোর কোথাকার! আমার টাকা ফেরত দাও!'

রাস্তা থেকে যতটা সম্ভব খাবারের প্যাকেটগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল কিশোর আর রবিন। কাছে গেলে চিৎকার করে বলতে লাগল মুসা, 'এই ব্যাটাই সেদিন স্টুডিওতে চেক দিয়েছিল আমাকে! এর নামই ম্যাট উইন্ডসর!'

'কি বলছ তুমি, কিছুই তো বুঝতে পারছি না!' বিমূঢ় হয়ে গেছে যেন ম্যাট।

'আমাকে চিনতে পেরেছ, নাকি পারোনি?'

'পারব না কেন? স্টুডিওতে আমাকে টাকা দিয়েছিলে, আমি তোমাকে একটা চেক দিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ,' মুখ বাঁকিয়ে ঝাঁঝাল কণ্ঠে মুসা বলল, 'সেই চেকটা ছিল জাল!'

আরও অবাক হলো লোকটা। 'জাল! কিন্তু ও তো সরকারি চেক, জাল হয় কি করে!'

'সেটা তুমি জানো। চলো, পুলিশের কাছে চলো। অবাক হওয়ার ভানটা ওদের কাছেই করো।' কলার ছাড়ল না মুসা। টেনে নিয়ে চলল। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'একটা কথা বলো দেখি এখন, চাঁদ, আমি যেখানেই যাই সেখানেই হাজির হয়ে যাও কি করে? ব্লাইদিতে কি করছ?'

'আমারও তো সেই একই প্রশ্ন, তুমি এখানে এলে কি করে? আমার থাকাটা স্বাভাবিক, কারণ এখানেই আমার বাড়ি।'

বিশ্বাস করল না মুসা। ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'তাই নাকি! বলো গিয়ে সে-কথা পুলিশকে!'

থানায় এসেও ম্যাটের সেই একই কথা—সে কোন অপরাধ করেনি।

ডেস্ক সার্জেন্ট বলল মুসাকে, 'এখানে তার বাড়ি হওয়া অসম্ভব না। ব্লাইদিতে বহুবার দেখছি তাকে।'

'তাহলে লস অ্যাঞ্জেলেসে কি করছিল?'

'দেখো, আমার মনে হয় কোথাও একটা ভুল হয়েছে,' মুসার প্রশ্নের জবাবে ম্যাট বলল। 'অনেক দিন থেকে আমি অসুস্থ। সিনেমায় কাজ করার কথা ছিল বলেই সেদিন না গিয়ে পারিনি। কাজ শেষ হতেই চলে এসেছি। চেকটা যে জাল এর কিছুই জানতাম না আমি। টাকার অভাবে একটা সোনার ঘড়ি বিক্রি করেছিলাম। যার কাছে করেছিলাম, সে নগদ টাকার পরিবর্তে ওই চেক দিয়েছে। ঠিক আছে, আমারই অন্যায়, তোমার টাকা আমি ফিরিয়ে দেব।'

'ঘড়িটা কি এখানে বিক্রি করেছেন?' সতর্ক হয়ে উঠেছে সার্জেন্ট।

'না, লস অ্যাঞ্জেলেসে।'

'লোকটা দেখতে কেমন?'

'আমার চেয়ে লম্বা, বয়েসেও বড়। আমাকে বলল, কোন হোটেলে নাকি কাজ করে।'

কি ভেবে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল কিশোর। মুসার তোলা ছবিটা বের করে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই লোক?'

জঞ্জালের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকা লোকটাকে ভাল করে দেখল ম্যাট। 'হ্যাঁ, এই লোকই! কিন্তু তোমরা এর ছবি পেলে কোথায়?'

সার্জেন্টও অবাক হলো। ড্রয়ার থেকে একটা চেক বের করে দেখাল, 'এ রকম চেক নিয়েছিলেন?'

একই সঙ্গে বলে উঠল মুসা আর ম্যাট, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ রকম!'

মাথা ঝাঁকাল সার্জেন্ট। 'গত হপ্তায় ব্লাইদি ব্যাংকে এটা ভাঙাতে এনেছিল এক লোক। তারমানে চেক জালিয়াতির একটা নতুন দল গজিয়েছে।'

ম্যাটকে আরও কিছু প্রশ্ন করার পর নিশ্চিত হলো সার্জেন্ট, লোকটা সত্যি কথাই বলছে। সে অপরাধী নয়। মুসার মত সে-ও অপরাধের শিকার।

কি আর করা? থানা থেকে বেরিয়ে এল চারজনে।

মোটেলে ফিরল তিন গোয়েন্দা।

তদন্তের আলোচনা শুরু হলো। মুসা জিজ্ঞেস করল, 'মরুভূমিতে আবার কি খুঁজবে?'

'ছবিটা দেখব আরেকবার। হতে পারে, কিছু মিস করেছি আমরা।'

'কবে যাবে?'

'আজই।'

আট

টিলার খানিক দূরে আগের জায়গাতেই ল্যাণ্ড করল মুসা। হেঁটে এসে টিলাটাতে উঠল ওরা। আগে আগে রয়েছে কিশোর। তার এখনও বিশ্বাস,

ছবিটাতে রয়েছে লফারের নিরুদ্দেশ-রহস্যের জবাব। খুঁজতে শুরু করল সে।

মরুর পাথুরে কঠিন মাটি আয়তাকার ভাবে দেবে গেছে এক জায়গায়। আলগা হয়ে আছে মাটি। আগের বার লক্ষ করেনি এটা। কেন করেনি, সেটাও বুঝতে পারল না। তবে হয় এ রকম। প্রথমবারে অনেক সময় অনেক খুঁজেও একটা জিনিস চোখে পড়ে না, দ্বিতীয়বারে সেটা সহজেই চোখে পড়ে যায়।

'কেউ খুঁড়েছিল!' বলে উঠল রবিন।

'তাই তো মনে হচ্ছে!' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'খুঁড়ে আবার মাটি দিয়ে গর্তটা বুজিয়ে দিয়েছে।'

'কি আছে নিচে?' মুসার প্রশ্ন।

'না দেখলে কি করে বুঝব? মুসা, আবার আমাদের ব্লাইদিতে ফিরে যেতে হবে। মাটি খোঁড়ার যন্ত্রপাতি নিয়ে আসতে হবে। একটা শাবল পেলেই হত।'

'সেটা আমি একাই আনতে পারব। তোমরা বরং ইতিমধ্যে যা দেখার দেখে নাও। তাতে সময় বাঁচবে।'

ঠিকই বলেছে মুসা। কিশোর আর রবিন রয়ে গেল। মুসা চলে গেল মাটি খোঁড়ার যন্ত্রপাতি কিনে আনতে।

টিলার ওপরে, নিচে, আতিপাতি করে খুঁজতে লাগল দু-জনে। নতুন কিছুই পেল না। ভয়ানক গরম। ওদের মনে হচ্ছে মাথায় হ্যাট না থাকলে মগজই গলে যেত। ছায়া বলতে কিছু নেই। ঘেমে নেয়ে গেল দেখতে দেখতে। আর কিছু না দেখে ছোট একটা ঝোপের পাশের সামান্য ছায়াতেই বিশ্রাম নিতে বসল ওরা।

কিশোর বলল, 'দানবের ছবির ওই ছড়ানো হাতের কোন অর্থ আছে।'

'কি?'

'বুঝতে পারছি না। বাঁ হাতটা যেদিকে নির্দেশ করছে সেদিকেই কিন্তু পাথরটা পাওয়া গেল।'

'আচ্ছা, পাথরটা কোন ধরনের নির্দেশক নয়তো? কোন কিছুর চিহ্ন? গুপ্তধন?'

'হতে পারে।'

এক মুহূর্ত চুপ থেকে রবিন বলল, 'রাতে এসে ক্যাম্প করলে কেমন হয় এখানে? ব্রাউন আর লফার হয়তো পাহাড়ের কোন গুহায় লুকিয়ে আছে। রাতের বেলা গুপ্তধন খুঁজতে বেরোয়। নইলে ওই মাটি খুঁড়ল কে? কেনই বা খুঁড়ল? কি খুঁজেছে?'

'আল্লা মালুম!' হাত ওল্টাল কিশোর।

এই গরমে অপেক্ষা করার মত কষ্ট আর হয় না। দু-জনেরই মনে হতে লাগল, যুগের পর যুগ পার হয়ে যাচ্ছে। অবশেষে ফিরে এল মুসা। প্লেনটা ল্যাণ্ড করতেই ছুটে গেল ওরা রবিন আর কিশোর। যন্ত্রপাতি নামাতে মুসাকে সাহায্য করতে।

মাথায় চওড়া কানাওয়ালা হ্যাট, হাতে মাটি খোঁড়ার শাবল-কোদাল,

সারি দিয়ে হাঁটা—মনে হচ্ছে যেন পুরানো আমলের প্রসপেক্টর, অর্থাৎ স্বর্ণ-খুঁজিয়ের দল।

মুসা বলল, 'বাই চান্স যদি সোনা পেয়ে যাই, দারুণ হবে না!'

'হবে,' কিশোর বলল, 'তবে অবাক হব না। অ্যারিজোনায় বেশ কিছু সোনার খনি আছে। স্প্যানিশরা যখন প্রথম এল এ দেশে তখন খুঁজে বের করেছিল। পরে হারিয়ে গেছে ওগুলো।'

'খনি কি আর হাঁটতে পারে নাকি যে কোথাও গিয়ে হারিয়ে যাবে?' বুঝতে পারল না মুসা। 'হারায় কি করে?'

হেসে উঠল রবিন। 'এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না। পুরানো আমলের প্রসপেক্টররা তাদের খনির কথা গোপন করে রাখত, অন্যে কেড়ে নেয়ার ভয়ে। কাউকে বলত না। শেষে দেখা গেল নিজেও আসতে পারল না সোনা খুঁড়ে তোলার জন্যে। কালক্রমে বালিতে ঢেকে কিংবা ভূমিকম্পে মাটি ধসে বন্ধ হয়ে গেল খনির মুখ। হারিয়ে গেল মাটির নিচে।'

গর্তটার কাছে পালা করে খুঁড়তে লাগল ওরা। ঘামে চুপচুপে হয়ে গেল দশ মিনিটেই। হাল ছেড়ে দিয়ে মুসা বলল, 'দূর, খামোকা কষ্ট! এখানে কিছু পাওয়া যাবে না।'

রবিন বলল, 'হয়তো ছিল। মূল্যবান পাথর। তুলে নিয়ে গেছে।'

'আমার তা মনে হয় না,' একমত হতে পারল না কিশোর। 'পাথর-টাতর হলে দু-এক টুকরো পড়ে থাকতই। একটা কণাও নেই কেন?'

'তাহলে কিসের জন্যে খুঁড়েছিল? ইনডিয়ানদের গুপ্তধন?' মুসার প্রশ্ন।

'তা হতে পারে। স্প্যানিশ ভ্রমণকারীদের গুপ্তধনও হতে পারে। এই দানবের ছবিটার মধ্যেই রয়েছে এর জবাব।'

'তোমার ধারণা লফাররা এই গুপ্তধন খুঁজতেই এসেছিল?'

'আসতেও পারে।'

'কিন্তু কে খুঁড়ল এই গর্ত? একটা পায়ের ছাপও নেই। ভূতুড়ে ব্যাপার না?' এই দুপুর রোদেও গায়ে কাঁটা দিল মুসার।

'না। যে খুঁড়েছে, সে খুব চালাক লোক। পায়ের ছাপ মুছে দিয়েছে, ইনডিয়ানদের মত, গাছের ডাল দিয়ে ডলে।'

'মরুকগে সব!' হাতের কোদালটা মাটিতে ফেলে দিল মুসা। 'আমার খিদে পেয়েছে।'

কোদাল তুলে নিল রবিন। গর্তের নিচে আলগা মাটি যা অবশিষ্ট আছে তুলে ফেলতে লাগল। কোদালের ফলায় লেগে উঠে এল একটুকরো কাপড়।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'ওটা কি!'

মুসাও উঠে এগিয়ে এল।

মাটির ভেতর থেকে বাদামী রঙের একটা রুমাল টেনে বের করল রবিন। মাটি ঝেড়ে পরিষ্কার করল। এক কোণে সুতো দিয়ে লেখা একটা অক্ষর: D.

'কারও নামের আদ্যক্ষর,' কিশোর বলল, 'যার বানানটা ডি দিয়ে শুরু।'

'তার মানে সেই লোক ব্রাউন কিংবা লফার নয়,' রবিন বলল।

'না।'

'তারমানে,' চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'মাটিও খুঁড়েছে অন্য লোকে! ভুল করে রুমাল ফেলে গেছে!'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

সূত্র হিসেবে কাজে লাগতে পারে ভেবে রুমালটা পকেটে রেখে দিল রবিন।

সমস্ত আলগা মাটি তন্নতন্ন করে খুঁজেও আর কোন সূত্র পাওয়া গেল না। আবার বলল মুসা, 'আমার খিদে পেয়েছে।'

কিশোর বলল, 'এখানে এই রোদে বসে তো খাওয়া যাবে না। ছায়া দরকার।'

'কোথায় পাব ছায়া?' চারপাশে তাকাতে লাগল মুসা।

মরুভূমির কিনারে পর্বত শুরু হয়েছে। সেটা দেখিয়ে কিশোর বলল, 'চলো, ওখানে উড়ে যাই। ছায়াও মিলবে, ঠাণ্ডাও।'

'উত্তম প্রস্তাব,' সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল মুসা।

রবিন বলল, 'বলা যায় না, পর্বতের ঢালে জ্যাসপারও পাওয়া যেতে পারে।'

প্লেনের কাছে ফিরে এল ওরা। দরজা খুলতেই যেন ধাক্কা মারল এসে গরম বাতাস, ঝলসে দিতে চাইল চোখ-মুখ। বন্ধ থাকায় ভেতরের বাতাস তেতে আগুন হয়ে আছে। এয়ারকুলার চালিয়ে ভেতরটা ঠাণ্ডা করে নিতে হলো।

উড়ে এসে পাহাড়ের ঢালে নামতে বিশেষ সময় লাগল না। খাবারের টিন আর পানির বোতল নিয়ে নামল তিনজনে। পর্বতের ঢালে ছায়া খুঁজতে শুরু করল।

বড় বড় পাথরের চাঙড় পড়ে আছে। ছায়ার অভাব নেই এখানে। অনেক বড় একটা চাঙড়ের নিচে বড় গর্তের মত অনেকখানি জায়গা। তাতে বসে খাওয়া সারল ওরা। মুসা ওখানেই চিত হয়ে শুয়ে নাক ডাকানো শুরু করল। রবিন আর কিশোর উঠল খানিকটা জায়গা ঘুরে দেখতে।

ঢাল বেয়ে উঠতে উঠতে ওপর দিকে হাত তুলে কিশোর বলল, 'ওই দেখো, একটা গুহার মুখ। ঢুকে দেখব।'

চল্লিশ ফুট ওপরে রয়েছে গুহাটা। ওটার কাছে এসে ভেতরে তাকাল দু-জনে।

অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না।

পকেট থেকে টর্চ বের করল কিশোর। রবিনকে বলল, 'এসো, ঢুকব।'

তার কথা শেষ হলো না; তীক্ষ্ণ, ভয়াবহ এক চিৎকার যেন চিরে দিল পর্বতের নীরবতা। গুহামুখে বেরিয়ে এল একটা বিশাল জানোয়ার। গোয়েন্দাদের ওপর ঝাঁপ দেয়ার জন্যে তৈরি।

নয়

হলদে চোখ মেলে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে আছে জানোয়ারটা। আমেরিকার একেক জায়গায় একেক নাম এর; কেউ বলে ওয়াইল্ড ক্যাট, কেউ বলে কুগার, আবার কেউ পার্বত্য সিংহ। ভয়ঙ্কর জীব। তামাটে চামড়ার নিচে থিরথির করে কাঁপছে অসাধারণ শক্তিশালী মাংসপেশী।

'দৌড় দাও!' চিৎকার করে বলল কিশোর।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে লাফিয়ে নামতে শুরু করল সে। পেছনে রবিন। পায়ে লেগে পাথর গড়িয়ে পড়ল। ওরাও কয়েকবার পিছলে পড়তে পড়তে বাঁচল।

চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল মুসার। বেরিয়ে এসে জানতে চাইল, কি হয়েছে।

জানাল কিশোর।

কিশোরদের পেছনে কুগারটাকে দেখতে পেল না মুসা। পিছু নেয়নি ওটা। একবার হুঙ্কার ছেড়ে ভয় দেখিয়েই যথেষ্ট হয়েছে ভেবে ফিরে গেছে আবার গুহায়।

ধপ করে বসে পড়ল কিশোর। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ওটা মেয়ে কুগার। নিশ্চয় বাচ্চা আছে গুহার মধ্যে। সে-জন্যেই এত রাগ। ভেবেছে বাচ্চার ক্ষতি করতে গেছি।'

'গুহায় কি আছে তা তো জানলাম,' রবিন বলল। 'আর ঢোকার দরকার নেই। ওখানে নেই ব্রাউন কিংবা লফার।'

পর্বতের ঢালে বন আছে। সেটাতে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। চোখ খোলা রাখল সূত্রের সন্ধানে। একদিকে ধসে পড়া একটা ছাউনি দেখে এগিয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সন্দেহজনক কিছু পেল না ভেতরে।

আচমকা ভয় ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল মুসা, 'এই, প্লেনের কাছ থেকে এসেছি কতক্ষণ হয়েছে! পাক্কা দুই ঘন্টা!'

'তাতে কি?' সামনে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে কিশোরের। 'দরজায় তালা দেয়া আছে।'

তা বটে। কিশোরের সঙ্গে এগোল মুসা, কিন্তু ভয়টা তাড়াতে পারল না মন থেকে। খুঁতখুঁত করছে। বলল, 'বাপরে, বনের মধ্যেও এত গরম!'

কয়েক গজ এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে গেল মুসা। 'দেখো, আমার ভাল্লাগছে না! কেমন জানি লাগছে! প্লেনটার যদি ক্ষতি করে কেউ?'

এইবার আর না শুনে পারল না কিশোর। ভয়টা তার মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। ফিরে চলল ওরা।

আধঘন্টা লাগল বন থেকে বেরোতে। প্লেনটা চোখে পড়ল। ঠিকই

আছে। বিরক্ত হয়ে কিশোর বলল, 'খামোকা নিয়ে এলে! আরেকটু দেখতে চেয়েছিলাম...'

বাধা দিয়ে বলে উঠল রবিন, 'ওই, দেখো!'

মুসার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ঠিকই সাবধান করেছে। গা শিউরানো অদ্ভুত এক দৃশ্য। শাঙ্কব আকৃতির বিশাল একটা কি যেন মরুর বুক থেকে উঠে গেছে আকাশের অনেক ওপরে। আগে কখনও না দেখলেও ওটা কি মুহূর্তে বুঝে ফেলল কিশোর। বালির ঘূর্ণি। ওদের দিকেই ধেয়ে আসছে।

'কি-কি ওটা!' চিনতে পারল না মুসা।

'বালি-ঝড়!' ভয় পেয়েছে কিশোর, গলা কাঁপছে। 'এই এলাকার লোকে বলে শয়তানের ঘূর্ণি! ঠিকই বলে, শয়তান ভর করে থাকে যেন বালির এই ঘূর্ণির মধ্যে। টর্নেডোর চেয়ে কম ভয়ঙ্কর না। প্লেনের ওপর দিয়ে বয়ে গেলে কিচ্ছু রাখবে না, ভর্তা বানিয়ে ফেলবে! জলদি সরাতে হবে! এসো!'

ছুটল ওরা। ঝড়টা আসার আগে পৌছতে পারবে তো?

'আরও জোরে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। রবিন আর কিশোরকে অনেক পেছনে ফেলে দিয়েছে।

প্লেনের কাছে পৌছল ওরা। ঝড়টা একশো গজ দূরে। এগিয়ে আসছে দ্রুত। দু-দিকের দুই ডানা চেপে ধরল কিশোর আর রবিন, মুসা ধরল লেজ।

তিনজনে মিলে ঠেলতে শুরু করল। নড়ে উঠল প্লেন। চাকায় ভর দিয়ে গড়িয়ে সরে যেতে শুরু করল। আরও জোরে ঠেলা দিল ওরা। গতি বাড়তে লাগল প্লেনের। সরে গেল অনেকখানি। বেকায়দা ভঙ্গিতে একটা পাথরে পা দিয়ে গোড়ালি মচকাল মুসা।

তবে প্লেনটাকে বাঁচাতে পারল ওরা। সামনে দিয়ে চলে গেল বালির ঘূর্ণি।

মাটিতে বসে গোড়ালি চেপে ধরে গোঙাচ্ছে মুসা।

ব্যথাটা কতখানি দেখার জন্যে তার পায়ে হাত দিতে গেল কিশোর।

চাপ লাগতে আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। এমন অবস্থা, প্লেনও চালাতে পারবে না সে। তাকে এখন ফেলে রেখে তদন্ত চালানো সম্ভব নয়। অবশ্য দেখার আর নেইও কিছু।

মুসাকে প্লেনে উঠতে সাহায্য করল কিশোর আর রবিন। পাইলটের আসনে বসল এবার রবিন। রিভারসাইড কাউন্টি এয়ারপোর্টে ফিরে এল নিরাপদে।

ব্লাইদিতে মোটেলে ফিরে সবার আগে ডাক্তার ডাকা হলো।

মুসার পা ব্যাণ্ডেজ করে আর বেশ কিছু ট্যাবলেট গিলিয়ে দিয়ে ডাক্তার বললেন, কয়েক দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। ভালমতই মচকেছে।

রাতে ম্যাপ নিয়ে বসল কিশোর। ঠিক হলো মুসার জন্যে অপেক্ষা করবে না ওরা। সে আর রবিন বোটে করে এগিয়ে যাবে কলোরাডো নদী ধরে। ব্লাইদিতে থাকবে মুসা। জরুরী দরকার পড়লে ফোনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে কিশোররা। পা ততদিনে ভাল হয়ে গেলে এবং প্লেনটার প্রয়োজন

পড়লে ওটা নিয়ে ওদের কাছে চলে যাবে মুসা।

ম্যাপের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'মেকসিকোতে যেতে কত সময় লাগবে?'

'এমনিতে দূর তো খুব বেশি না,' জবাব দিল কিশোর। 'একশো মাইল। কিন্তু পথ ভাল না। নদীটার দিকে তাকিয়ে দেখো—দ্বীপ আর পানির নিচে বালির চরার অভাব নেই। তার ওপর রয়েছে তিন তিনটে বাঁধ। অনেক সময় নষ্ট করবে।'

ম্যাপ দেখে জানা গেল প্রথম বাঁধটার নাম ইমপেরিয়াল ড্যাম। ব্লাইদি থেকে আশি মাইল দূরে। দ্বিতীয়টা ল্যাগুনা ড্যাম। আর তৃতীয়টা রয়েছে সীমান্ত ঘেঁষে, মেকসিকোর ভেতরে পড়েছে—মরিলস ড্যাম।

পরদিন ভোরবেলা উঠে মুসার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রবিন আর কিশোর। ঘাটে এসে দেখল, বোট তৈরি। এর মালিক কথার বেলা 'হয়তো হয়তো' যতই করুক, কাজের বেলা ঠিক।

বোট ছাড়ল দুই গোয়েন্দা। প্রথমে হাল ধরল রবিন। নদীর পানির রঙ এখন বাদামী, ওপরটা আয়নার মত স্থির আর চকচকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রঙ বদলাবে। মরুভূমির অস্বাভাবিক নীরবতার মাঝে ইঞ্জিনের শব্দ বেশি করে কানে বাজছে।

দু-তীরের একঘেয়ে দৃশ্য দেখতে দেখতে খুব শিগগিরই চোখ পচে গেল কিশোরের। সময় কাটানোর জন্যে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে বসল।

কয়েকটা বালির চরার পাশ কাটাল ওরা। ব্লাইদি থেকে একটা রাস্তা নদী পার হয়ে চলে গেছে, নদীর ওপরে ব্রিজ। সেটার নিচ দিয়ে পার হয়ে এল বোট। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা বিশাল আকারের কৈ মাছ ধরে ফেলল কিশোর।

দূরে দেখা গেল রিপ্লির পাহাড় চূড়া। টিলাও চোখে পড়ল। চিনতে পারল। ওখানেই রয়েছে দানবীয় নকশাগুলো।

দুপুরের আগে তীরে বোট ভেড়াল রবিন। মাছগুলো নিয়ে নেমে পড়ল দু-জনে। আগুন জ্বেলে রান্না করে খেতে বসল।

'ইমপেরিয়াল ড্যাম আর বেশি দূরে নেই,' রবিন বলল। 'পাঁচ ঘণ্টার বেশি তো চললাম।'

খাওয়ার পর আবার বোট ছাড়ল ওরা। কিছুক্ষণ পরেই বাঁধটা চোখে পড়ল। কাছে এসে ডকে বোট ভেড়াল। এই প্রথম একটা বড় ধরনের লোকালয় পাওয়া গেল। মানুষজন যা আছে, বেশির ভাগই জেলে, ডক শ্রমিক, ট্রাক ড্রাইভার।

এক ড্রাইভারের সঙ্গে খাতির করে ফেলল কিশোর। লফার আর ব্রাউনের চেহারার বর্ণনা দিয়ে জানতে চাইল ওদে দেখেছে কিনা।

ড্রাইভার বলল, দেখেনি। ওরা অনেক দূর থেকে খুঁজতে এসেছে শুনে আরও কয়েকজন ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ করল সে। কেউ কিছু বলতে পারল না।

ওদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে বোটে ফিরে এল দুই গোয়েন্দা। আবার বোট ছাড়ল। হাল ধরল কিশোর। আধমাইল মত যাওয়ার পর হঠাৎ একটা বালির ঢিবির দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'দেখো, দেখো, সেই বেয়ারাটা!'

দশ

শাঁই করে সেদিকে বোটের নাক ঘুরিয়ে দিল কিশোর। মাঝনদীতে রয়েছে ওরা। কিনারে পৌঁছে বোট ভিড়িয়ে ডাঙায় নামতে নামতে অনেক সময় লাগল। ঢিবির ওপারে আর দেখা গেল না লোকটাকে। বড় বড় পাথর আর পাহাড় রয়েছে ওখানে। কোথায় লুকিয়েছে কি করে খুঁজে বের করবে?

কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে লোকটাকে না পেয়ে আবার বোটে ফিরে এল ওরা। ঢিবিটার কাছে পানিতে একটা সবুজ ছোট মোটরবোট নোঙর করা। রবিন বলল, 'এই বোটে করেই হয়তো এসেছে ব্যাটা। খানিকটা এগিয়ে বসে থাকি চুপচাপ। এক সময় না এক সময় আসতেই হবে তাকে।'

আবার নদীর মাঝখানে এসে নোঙর ফেলে মাছ ধরার ভান করতে লাগল দু-জনে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একটা লোক এসে বোটে উঠল। গায়ে নীল শার্ট। কিন্তু সে বেয়ারা নয়। তবে যে ভাবে ওদের বোটটার দিকে তাকাচ্ছে, সেটা সন্দেহজনক।

বোট ছাড়ল সে। মেকসিকোর দিকে যেতে লাগল। কোথায় যায়, দেখার জন্যে পিছু নিল গোয়েন্দারা। ওদের ধারণা হলো, সামনে কোথাও গিয়ে অপেক্ষা করবে বেয়ারার ছদ্মবেশী লোকটা। নীল শার্ট পরা লোকটা বোট তীরে ভিড়িয়ে তাকে তুলে নেবে।

আধ মাইল এগোনোর পর যেন ওদের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল লোকটা। বার বার পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে। শেষে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে ভেসে রইল। ওরা কাছাকাছি হলে হাত নেড়ে ডাকল।

বোট কাছে নিয়ে গেল কিশোর।

কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল লোকটা, 'আমার পেছনে লেগেছ কেন?'

নিরীহ স্বরে কিশোর জবাব দিল, 'কই? আপনি যেদিকে যাচ্ছেন আমরাও সেদিকে যাচ্ছি।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে রইল লোকটা। আবার বোট ছাড়ল। আগের মতই পেছনে লেগে রইল গোয়েন্দারা।

ল্যাগুনা ড্যাম দেখা গেল। রিজারভয়েরের ভেতরে ঢুকে আবার ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল লোকটা। কিশোরদের ডেকে বলল, 'এবার কিন্তু আমি পুলিশ ডাকব!'

'ডাকুন না,' জবাব দিল কিশোর। 'অন্যায় কিছু করিনি আমরা।'

রবিন বলল, 'আপনার আর ডাকার দরকার হবে না। ওই যে পুলিশ

আসছে।'

পুলিশের লঞ্চ দেখেই ঘাবড়ে গেল লোকটা। গতি বাড়িয়ে ছুটতে শুরু করল। বাঁধ পেরিয়ে গিয়ে তীরে ভেড়াল নৌকা লাফিয়ে ডাঙায় নেমে ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দূরবীন চোখে লাগিয়ে বোটটাকে দেখছে একজন অফিসার। কাছাকাছি বোট নিয়ে গেল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'কিছু হয়েছে, অফিসার?'

'বোটটা চুরি করে এনেছে ও,' অফিসার জবাব দিল। 'সকালে রিপোর্ট করা হয়েছে আমাদের কাছে। তোমরা মনে হলো ওটার পিছু লেগেছিলে? কেন?'

অল্প কথায় বুঝিয়ে বলল কিশোর, ওরা গোয়েন্দা। নিখোঁজ একজন মানুষকে খুঁজতে বেরিয়েছে। বেয়ারার ছদ্মবেশী লোকটা অদৃশ্য হয়ে যাবার পর কি করে সবুজ বোটের পেছনে লেগেছে বলল।

কিশোররা মেকসিকোতে যাচ্ছে শুনে অফিসার বলল, 'লোকটাকে ধরতে যাচ্ছি আমরা। কি করতে পারলাম জানার ইচ্ছে থাকলে ইয়োমাতে গিয়ে থানায় খোঁজ কোরো। মেসেজ দিয়ে রাখব।'

গতি বাড়িয়ে চলে গেল লঞ্চটা।

কিশোররাও এগোতে থাকল। পথে যেখানেই মানুষ-জন দেখতে পেল, জেলে নৌকা দেখল, থামিয়ে লফার আর ব্রাউনের খোঁজ নিল। কিন্তু ওরকম কাউকে দেখেছে বলে কেউ বলতে পারল না ।

কেটে গেল দিনটা। সূর্য ডুবল। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হতে লাগল। নদীর কিনারে আর পানির ওপর পোকা খুঁজতে বেরোনো পাখিগুলোকে অস্পষ্ট লাগছে। আকাশের পটভূমিতে বাদুড়ের দলকে লাগছে কেমন অপার্থিব।

'থামার সময় হয়েছে,' কিশোর বলল।

নদীর মাঝে একটা বালির চরার ধারে নোঙর ফেলল ওরা। খাবারের টিন আর স্লীপিং ব্যাগ নিয়ে নামল। ওখানেই ক্যাম্প করে রাত কাটানোর ইচ্ছে।

আগুন জেলে রান্না করতে বসল রবিন। হাত-পা ছড়িয়ে পাশে বসে রইল কিশোর। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল মাংস ভাজার সুগন্ধ। মাখন মাখানো পাঁউরুটি, ভাজা মাংস, পনির, আপেলের সস, আর টিনে করে আনা সেদ্ধ বাঁধাকপি দিয়ে খাওয়া সারল ওরা। ঢুকে পড়ল স্লীপিং ব্যাগের মধ্যে।

আকাশে তারার মেলা। নীরব রাত। মরুভূমির মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর মাঝে নির্জন বালির চরায় শুয়ে থাকা। সে এক বিচিত্র অনুভূতি। খুব ভাল লাগছে কিশোরের। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, জন্মটা সার্থক।

নিরাপদে রাত কাটল। পরদিন ভোরে রওনা হলো আবার ওরা। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ইয়োমাতে পৌঁছে থানায় খোঁজ নিতে চলল। ওদেরকে স্বাগত জানাল ডিউটি অফিসার। নাম শুনে চিনতে পারল। লঞ্চ থেকে মেসেজ পাঠানো হয়েছে তার কাছে, বোঝা গেল।

তবে গোয়েন্দাদের নিরাশ করল অফিসার। বোট চোরকে ধরা যায়নি। পুলিশের হাত ফসকে পালিয়ে গেছে লোকটা। তার পরিচয়ও জানতে পারেনি

পুলিশ।

থানা থেকে বেরিয়ে বোটে এসে উঠল দু-জনে। তারপর আবার এগিয়ে চলা।

এগারো

দুপুরের পর সীমান্ত পেরিয়ে মেকসিকোর সোনোরা রাজ্যে ঢুকল ওরা। চেকপোস্টে খুব কড়াকড়ি। ডিউটি অফিসার ওদের জানাল, চোরাচালানি আর অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা নাকি ইদানীং খুব যন্ত্রণা দিচ্ছে। লফার আর ব্রাউনের কথা অফিসারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। কিন্তু কিছু বলতে পারল না অফিসার।

বিকেলের ভয়ানক কড়া রোদের মধ্যে এগিয়ে চলল বোট।

বেশ কয়েক মাইল এগোনোর পর নদীর তীরে কয়েকটা ঝোপের ধারে পাঁচ-ছয়টা ছেলেমেয়েকে জটলা করতে দেখা গেল। নদীতে গোসল করতে এসেছে ওরা। সীমান্ত পেরিয়ে আসার পর এই প্রথম মানুষ দেখতে পেল গোয়েন্দারা। বাচ্চাগুলোর দিকে এগিয়ে গেল ওরা।

ওরাও বোট দেখে এগিয়ে এল। কৌতূহলী হয়ে দেখতে লাগল। স্থানীয় ইনডিয়ানদের ছেলেমেয়ে।

হাত নেড়ে ডাকল কিশোর। কিন্তু কাছে এল না ওরা। ভয় পাচ্ছে। শেষে এক বুদ্ধি করল সে। বোট থেকে মাটিতে নেমে পকেট থেকে চিউয়িং গাম বের করল। এইবার গুটিগুটি এগিয়ে এল ছেলেমেয়েগুলো।

সহজেই ভয় কাটিয়ে দিল ওদের কিশোর আর রবিন। ইংরেজি জানে না ওরা, তবে স্প্যানিশ বোঝে। ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশে ওদের কাছে জানতে চাইল, কোন বিদেশীকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছে কিনা।

একটা ছেলে জবাব দিল, দেখেছে। এই প্রথম 'হ্যাঁ'-বাচক জবাব পেয়ে সতর্ক হলো গোয়েন্দারা। ছেলেটার বাড়ি কোথায়, জিজ্ঞেস করল। হাত তুলে পাহাড়ের দিকে দেখিয়ে দিল ছেলেটা।

বোট ঘাটে রেখে ছেলেটার সঙ্গে ওদের বাড়িতে চলল দুই গোয়েন্দা, তার বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। দল বেঁধে ওদের সঙ্গে চলল বাকি ছেলেমেয়েগুলো। চিউয়িং গাম পেয়ে খুব খুশি ওরা। যে কোন সাহায্য করতে রাজি।

পাহাড়ের কোলে ওদের বাড়িঘর। যে ছেলেটা বিদেশী লোক দেখেছে বলেছে, তার বাবা কৃষক। ছেলের কথা সমর্থন করল। বলল, 'আমি দেখিনি, তবে শুনেছি। রিটার দিকে গেছে। আমেরিকান।'

কি করে গেছে, জানতে চাইল কিশোর।

কৃষক জানাল, মরুভূমি দিয়ে এসেছিল লোকটা। কয়েক মাইল দূরে

রেলস্টেশন আছে, রেলগাড়ি চলাচল করে। লোকটা লাইন ধরে হেঁটে গেছে সম্ভবত স্টেশনে, তারপর গাড়িতে করে গেছে, ঠিক জানে না কৃষক।

কোন দিকে কি ভাবে যেতে হবে, জেনে নিল কিশোর। রবিনের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করল, ওরাও ওই পথেই যাবে। তাহলে হয়তো আরও খোঁজ মিলতে পারে। ঘাটে বোট রেখে যাবে। কৃষককে অনুরোধ করে বলল, সে বোটটা দেখেশুনে রাখতে রাজি হলে তাকে টাকা দেয়া হবে।

রাজি হলো কৃষক। অতএব আর কোন দ্বিধা নয়। রেললাইনের দিকে হাঁটা শুরু করে দিল দুই গোয়েন্দা।

কয়েকশো গজ এগোতেই চোখে পড়ল রেললাইন।

ঘড়ি দেখল কিশোর। ছ'টা বাজে। রেললাইন ধরে এগোলে রাতের আগে পৌঁছে যেতে পারবে স্টেশনে।

স্লীপার আর লাইনে ফেলে রাখা পাথর মাড়িয়ে এগিয়ে চলল ওরা।

ঘণ্টাখানেক চলার পর লাইনের ধারে ছোট একটা বাড়ি দেখা গেল। ওটাই স্টেশন। সেখানে এসে দেখা গেল একজন মাত্র লোক স্টেশনটা চালাচ্ছে। স্টেশন মাস্টার থেকে লাইনম্যান—সব সে একাই। তার নাম কাপারিলো। বিদেশী এবং আমেরিকা থেকে এসেছে শুনে বিশেষ খাতির করতে লাগল। ওরা গোয়েন্দা শুনে খাতিরের পরিমাণ আরও বেড়ে গেল।

জানা গেল, কিছুক্ষণ পরই একটা মালগাড়ি আসবে, উত্তরে মেক্সিকালিতে যাবে। কিশোররা যেতে চাইলে তাতে ওদেরকে তুলে দেয়া সম্ভব হবে, এবং ওরা গোয়েন্দা বলেই এই কাজটা করতে রাজি আছে কাপারিলো। তবে যেহেতু মালগাড়িতে করে যাবে, টিকেট দিতে পারবে না। মালগাড়ি যাত্রী বহন করে না, সুতরাং টিকেট দেয়ারও নিয়ম নেই।

কথায় কথায় কিশোর জানতে চাইল, 'আচ্ছা, কিছুদিনের মধ্যে আর কোন আমেরিকানকে এ স্টেশনে আসতে দেখেছেন? গত দু-তিন মাসের মধ্যে?'

একটা মুহূর্ত নীরব থেকে মনে করার চেষ্টা করল যেন কাপারিলো। বলল, 'দেখেছি। ছোট্ট স্টেশন, যাত্রী খুব কম আসে। বিদেশী তো আরও কম; সে জন্যেই মনে আছে। কয়েক হপ্তা আগে একজন ঠিক এ রকম সময়েই হেঁটে এসে হাজির। স্টেশনে মালগাড়ি থামলে আমরা মাল খালাস করছি, এমন সময় দেখি চুরি করে একটা বগিতে উঠে পড়ল লোকটা।'

'হবে হয়তো কোন ভবঘুরে,' রবিন বলল। 'টাকা ছিল না, তাই চুরি করে উঠেছে।'

'আমিও তাই ভেবেছি। গিয়ে ধরলাম। কাকুতি-মিনতি শুরু করল লোকটা। বলল, আমেরিকা থেকে এসেছে। গাড়িতে থাকতে দিতে বলল। কারা নাকি তাকে তাড়া করেছে।'

'পুলিশ? বেআইনী ভাবে মেকসিকোতে ঢুকেছে লোকটা?'

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'তা তো জানি না। মরুভূমির ওপর দিয়ে অনেক পথ হেঁটে এসেছে। ওর অবস্থা দেখে দুঃখই লাগল। হঠাৎ মরুভূমির রাস্তায়

হেডলাইট দেখলাম। একটা গাড়ি আসছিল। দেখেই লোকটা বলল, তাকে ধরতে আসছে ওরা। ট্রেনটা তখন ছাড়ার সময় হয়েছে। ভাবলাম, থাকগে, যাক। সত্যি হয়তো বিপদে পড়েছে লোকটা।

'ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার পর স্টেশনে পৌঁছল গাড়িটা। লাফিয়ে নামল দু-জন লোক, আমেরিকান বলে মনে হলো। আমাকে জিজ্ঞেস করল কোন ভবঘুরেকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছি কিনা। লোকটা নাকি অপরাধী। কিন্তু আমার কাছে তাকে ওরকম মনে হয়নি।'

'তারপর?' জানতে চাইল কিশোর। বুকের মধ্যে একধরনের চাপা উত্তেজনা শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছে, এতদিনে আসল খবরটা পাওয়া গেছে।

ভ্রূকুটি করল কাপারিলো। 'বরং ওই লোকগুলোকেই খারাপ মনে হলো আমার। অনেক দিন আমেরিকায় ছিলাম আমি। ওখানকার অপরাধী দেখেছি। কি রকম আচরণ করে জানি। বিশ্রী ভাষায় কথা বলে, গাল দেয়। বিশালদেহী, রুক্ষ চেহারার ওই দু-জনও এ রকমই করছিল।'

উত্তেজনা আর চেপে রাখতে পারল না রবিন। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বাংলায় বলল যাতে কাপারিলো বুঝতে না পারে, 'ওই ভবঘুরেই নিশ্চয় লফার! আর লোকগুলো মনে হয় সেই দু-জন, যারা তার অফিসে গিয়ে তার সেক্রেটারিকে হুমকি দিয়েছে!'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'মনে হয়।'

কাপারিলোর দিকে তাকাল রবিন। জিজ্ঞেস করল, 'ভবঘুরে লোকটা লম্বা, না খাটো? দেখতে কেমন?'

'লম্বা। হালকা-পাতলা। মনে হলো অনেক পথ হেঁটে এসেছে। ভীষণ ক্লান্ত।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর। 'উত্তরে, সীমান্তের দিকে।'

'তাহলে,' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর, 'লফার এখনও বাড়ি পৌঁছল না কেন?'

'হয়তো ধরা পড়েছে,' রবিন বলল। 'যারা তার পিছে লেগেছিল, তারা ধরে ফেলেছে। কিংবা হয়তো তার বাড়ির ওপর নজর রাখা হয়েছে ভেবে ভয়ে বাড়িতে ঢুকছে না। অথবা এমনও হতে পারে, কোন বিপদে পড়েছে তার বন্ধু ব্রাউন, তাকে উদ্ধার করার জন্যে মেকসিকোতে রয়ে গেছে সে।'

'এইটা হতে পারে। ব্রাউনের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।' নিজেদের মধ্যে কথাগুলো বাংলায় চালিয়ে যাচ্ছে কিশোররা। 'কিন্তু সে লফারের সঙ্গে ছিল না কেন? মরুভূমি পেরিয়ে লফার একা এল কেন?'

এই সময় ট্রেনের হুইসেল শোনা গেল। দেখা গেল হেডলাইট।

কাপারিলো বলল, 'ওই যে, ট্রেন আসছে।'

পতাকা দেখিয়ে ট্রেন থামাল সে। একটা বক্সকার দেখিয়ে তাতে উঠে যেতে বলল ছেলেদের।

কাপারিলোর সাহায্যের জন্যে তাকে অনেক ধন্যবাদ দিল কিশোর আর রবিন। হাত মেলাল। অন্ধকারে গা ঢেকে উঠে পড়ল বক্সকারে।

কয়েকটা মালের বাক্স গার্ডের গাড়িতে তুলে দিল কাপারিলো। আবার চলতে শুরু করল ট্রেন।

বারো

বক্সকারের বিশাল খোলা দরজার পাশে হাঁটু মুড়ে বসেছে কিশোর আর রবিন। ভেতরে আলো নেই। বাইরে চাঁদের আলো। মরুভূমির মধ্যে দিয়ে চলে গেছে রেললাইন। সীমাহীন বালির রাজত্বে ছোট ছোট ঝোপঝাড় আছে। কোথাও মাথা তুলেছে পাথরের পাহাড়। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে বুনো জানোয়ার। আর ক্বচিত-কদাচিত চোখে পড়ে একআধটা নিঃসঙ্গ মাটির তৈরি বাড়ি, এই এলাকায় অ্যাডাব নামে পরিচিত। এত রাতে আলো দেখা গেল না কোন বাড়ির জানালায়।

'এরপর কি করব আমরা?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ট্রেনটা যতদূর যায়, যাব। লফার নিশ্চয় এইই করেছিল। গিয়ে দেখি, কি ঘটে?'

'অহেতুক বসে থেকে লাভ কি? একটু ঘুমিয়ে নিই।' গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল রবিন। 'বাপরে বাপ, যা ঝাঁকি! ঘুমানো লাগবে না!'

কিশোরও শুয়ে পড়ল তার পাশে।

ঝাঁকি বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ঘুম ভাঙল ওদের। ট্রেন থেমে গেছে। লোকের কথা শোনা গেল। একটা মুখ উঁকি দিল বক্সকারের দরজায়। হাসি হাসি একটা কণ্ঠ বলল, 'ওঠো, উঠে পড়ো। আমেরিকায় যাওয়া আর তোমাদের হলো না।'

ইউনিফর্ম দেখেই চিনে ফেলল কিশোর। বিড়বিড় করল, 'মেকসিকান পুলিশ!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'বর্ডার পুলিশ। মেকসিকোতে এটা শেষ স্টেশন। অবৈধ যাত্রীকে দেখলেই আমরা এখানে নামিয়ে নিই।'

'তারমানে মেকসিকালিতে এসে গেছি?'

'হ্যাঁ, এসেছ। নামো তো এবার, আরও অনেকে অপেক্ষা করছে। দেরি দেখলে বিরক্ত হয়ে যাবে।' ব্যঙ্গের সুরে বলল পুলিশ অফিসার।

বক্সকার থেকে নামিয়ে ট্রেনের সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো কিশোরদের। ইঞ্জিনের কাছাকাছি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে আরও কয়েকজনকে। সবার পরনেই ময়লা, মলিন পোশাক। দরিদ্র কৃষক কিংবা শ্রমিক শ্রেণীর লোক সবাই।

'কারা ওরা?' রবিনের প্রশ্ন।

কিশোর জবাব দিল, 'হবে হয়তো আমাদেরই মত টিকেট ছাড়া যাত্রী। বেআইনী ভাবে বর্ডার পার হতে চেয়েছিল, আটকে দিয়েছে পুলিশ।'

বড় একটা লরির পেছনে তোলা হলো ওদের।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের?' আবার প্রশ্ন করল রবিন।

'জেলে হবে, আর কোথায়!'

'কিন্তু আমাদের জেলে নেবে কেন? আমরা তো অবৈধ ভাবে সীমান্ত পার হতে চাইনি!'

চলতে শুরু করল লরি।

কিছুক্ষণ পর থানার শান বাঁধানো চত্বরে এসে ঢুকল। এগিয়ে এল কয়েকজন অস্ত্রধারী গার্ড। বন্দিদের নামিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড় করানো হলো।

কিশোর আর রবিনকে লাইন থেকে বের করে দিল একজন অফিসার। আবার লরিতে ওঠানো হলো ওদের, তবে পেছনে নয়, সামনে, ড্রাইভারের পাশে। আবার পথে বেরিয়ে এল লরি। শহরের দিকে চলল।

অবাক হয়ে জানতে চাইল কিশোর, 'কি ব্যাপার? আমাদের কোথায় নিচ্ছেন?'

'চোরাচালানি ধরার চেষ্টা করছে পুলিশ,' জবাব দিল ড্রাইভার। 'তাই ট্রেন থেকে লোক নামিয়ে ধরে এনেছে। তোমরা নিশ্চয় তিন গোয়েন্দার লোক? শহরে নিয়ে গিয়ে তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে। সেটাই করছি।'

'আশ্চর্য!' রবিন বলল। 'আমাদের নাম জানল কি করে?'

'মিস্টার সাইমনের হাত নেই তো এতে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'কি জানি! তবে কি তিনি আশেপাশেই কোথাও আছেন? লফারের কেসটা নিজেই নিয়েছেন?'

'খোদাই জানে!' ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

'আলগোডোনেসে।'

'তাহলে আমাদের বোটটার কি হবে? আনব কি করে ওটা?' প্রশ্নটা অবশ্য ড্রাইভারকে করল না কিশোর, নিজেকে করল।

'তোমরা গোয়েন্দা, তাই না? পুলিশের হয়ে কাজ করছ?'

'হ্যাঁ। একজন আমেরিকান ভদ্রলোককে খুঁজছি। মেকসিকোতে এসে হারিয়ে গেছে।'

'তোমাদের বোটের কথা কি যেন বললে? কো[illegible] ওটা?'

কোথায় আছে জানাল কিশোর।

ড্রাইভার বলল, 'পুলিশ তোমাদের সাহায্য করবে। তোমরা হোটেলে উঠে বিশ্রাম নাও। বোটটা আনানোর ব্যবস্থা করব আমরা।'

এক কাপড়ে চলে এসেছে। ঘণ্টাখানেক পর আলগোডোনেসের একটা দোকানে ঢুকল কিশোররা কিছু কাপড়-চোপড় কেনার জন্যে। খাঁটি মেকসিকান পোশাক কিনে পরল। মাথায় চাপাল উজ্জ্বল রঙের ব্যানডানা হ্যাট। উঁচু হিলওয়ালা মেকসিকান বুট কিনে পায়ে দিল।

শহরের সবচেয়ে বড় হোটেলটায় এসে রুম নিল ওরা। দু'বিল্ডি খেলে

গেল কিশোরের মাথায়। নিজের নামকে স্প্যানিশ বানিয়ে লিখল, কিশোরাস্কো প্যাশোয়ে। আর রবিনের নাম রবিনাস্কো মিলফোর্ডো।

নাম দেখে মাথা দুলিয়ে ক্লার্ক বলল, 'বাহ্, চমৎকার নাম। একেবারে নতুন, আর কখনও শুনিনি।'

হাসতে শুরু করল রবিন। বাংলায় জিজ্ঞেস করল, 'মানে কি এই নামের?'

'আমি কি জানি! আমেরিকার ফ্র্যাঙ্ক যদি মেকসিকোতে এসে ফ্র্যান্সিস্কো হয়ে যায়, কিশোরের কিশোরাস্কো হতে দোষ কি?'

অকাট্য যুক্তি। চুপ হয়ে গেল রবিন।

ক্লার্ককে অনুরোধ করল কিশোর, 'আপনাদের গেস্ট বুকটা একটু দেখতে পারি? আমাদের দু-জন বন্ধু আসার কথা। দেখি নাম আছে নাকি?'

'তোমাদের বন্ধুরা কি জেলে?'

'না, তবে নৌকা নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছিল। আমদের চেয়ে বয়েস অনেক বেশি, চল্লিশের কাছাকাছি। দু-জনেরই হালকা-পাতলা শরীর, একজন বেশি লম্বা। নাম লফার।'

মাথা নাড়ল ক্লার্ক। ওরকম কেউ ওঠেনি হোটেলে।

রেজিস্টার ঘেঁটে কিশোরও কিছু বের করতে পারল না। খাতাটা ঠেলে দিয়ে বলল, 'হয়তো অন্য কোন হোটেলে উঠেছে আমাদের বন্ধু। একজনের অবশ্য ঘোড়ার প্রতি আকর্ষণ আছে। কাছাকাছি কোন ঘোড়ার র‍্যাঞ্চ থাকলে, আর শেটল্যাণ্ড পনি থাকলে সেখানে উঠেও যেতে পারে।'

'তাহলে তো এদিকে তার আসারই কথা নয়,' হাসিমুখে বলল ক্লার্ক। 'বর্ডারের কাছে একটা পনি র‍্যাঞ্চ আছে ইয়োমা আর অ্যান্ড্রাডির মাঝামাঝি। নাম কুপার র‍্যাঞ্চ।'

'থ্যাংকস,' হেসে বলল কিশোর। 'মনে হচ্ছে ওখান থেকেই বের করে আনতে হবে ওকে।'

ঘরে ঢুকেই রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কুপার র‍্যাঞ্চে যাওয়ার ইচ্ছে আছে নাকি?'

'সূত্র যখন একটা পাওয়া গেছে, গিয়ে দেখাই উচিত।'

তা-ও বটে। হাত-মুখ ধুয়ে খাওয়ার জন্যে রেস্টুরেন্টে নেমে এল ওরা। ওখান থেকে ফোন করল রাইদিতে, মুসার কাছে।

ভেসে এল মুসার হাসিখুশি কণ্ঠ, 'বেঁচে তাহলে আছ?'

'না,' হেসে জবাব দিল রবিন, 'পরপার থেকে করছি। তবে বেহেশতেই আছি বলতে পারো। দোজখে যাইনি। তারপর খবর বলো।'

'আমি ভালই আছি। পায়ের ব্যথা সেরেছে। লফারের খোঁজ পেয়েছ?'

'পেয়েছি। তবে ঠিক কোথায় আছে বলতে পারছি না।'

'ও। আমিও এখানে বসে নেই। পা একটু ভাল হতেই প্লেন নিয়ে বেরিয়েছিলাম। মরুভূমির ছবি তুলে এনেছি। রাতের মরুভূমি যা দারুণ লাগে না!'

'রাতের বেলা মরুভূমিতে গিয়েছিলে তুমি! ভূতের ভয় করেনি?'

'আমি একা যাইনি। একজন বন্ধু জুটে গেছে। একটা প্রাইভেট প্লেনের পাইলট, নাম ওয়ারনার বল। আমার ইনফ্রারেড ক্যামেরাটার ভক্ত হয়ে গেছে।'

'হুঁ। কিশোর বলছে, প্রতিদিন এ সময় তোমাকে মোটেলে থাকতে। ফোনে যোগাযোগ করব। গুড বাই।'

লাইন কেটে দিল রবিন। কিশোরকে খবর জানাল।

পরদিন সকালে শহরে লফার আর ব্রাউনের খোঁজ নিতে বেরোল দু-জনে। দোকানপাট, পেট্রোল স্টেশন, রেস্টুরেন্ট—সমস্ত জায়গায় ঘুরল। কোন লাভ হলো না। দুপুর নাগাদ ক্লান্ত হয়ে হোটেলে ফিরে এল।

বিকেলে ওদের খোঁজ নিতে এল পুলিশের সেই ড্রাইভার। জানাল, ডকে নিয়ে আসা হয়েছে ওদের বোটটা।

হোটেল ছেড়ে দিল কিশোর। ডকে চলল।

ঘন্টাখানেক পরই আবার বোটে করে নদীপথে ইয়োমার দিকে ফিরে চলল দুই গোয়েন্দা। বিকেলের উত্তপ্ত রোদ থাকতে থাকতেই আরেকবার সীমান্ত অতিক্রম করল। আরও কিছুক্ষণ পর চোখে পড়ল ইয়োমা ডক।

ডকে এসে বোট বাঁধল ওরা। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল কিশোর, কুপার র‍্যাঞ্চটা কোথায়। জানল, ওখান থেকে মাইল দুয়েকও হবে না।

দু-জনে দুটো রাকস্যাক বেঁধে নিয়ে নেমে পড়ল বোট থেকে। হেঁটে চলল মরুভূমির ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া একটা সরু পথ ধরে।

চোখে পড়ল র‍্যাঞ্চের নিচু ছাতওয়ালা বাড়ি, আর ঘোড়া রাখার কোরাল।

রবিন বলল, 'জুতো না খুলে আর পারছি না। উফ্, বাপরে বাপ, ফোসকা পরে গেছে! নতুন জুতো পরে আসাই বোকামি হয়ে গেছে!'

বসে পড়ল সে। জুতো খুলে বিশ্রাম দিল পা দুটোকে। আবার পায়ে দিয়েই উঁক করে উঠল।

'কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল কিশোর।

'কি জানি! মনে হলো বড়শি বিঁধেছে!'

'জুতোর মধ্যে বড়শি আসবে কোত্থেকে? ভুল করে একআধটা ভেতরে ফেলোনি তো?'

'নাহ্,' দেখার জন্যে আবার জুতোটা খুলে নিয়ে উপুড় করতেই টুপ করে পড়ল একটা ছোট, খড় রঙের জীব। কাঁকড়ার মত দাড়া, আর টিকটিকির মত লেজ। লেজটা ওপর দিকে বাঁকানো। মাথাটা সুচের মত চোখা।

'সর্বনাশ!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'কাঁকড়া বিছে! সাংঘাতিক বিষাক্ত! বিষ বেশি ঢুকে থাকলে বারোটা বাজিয়ে দেবে!'

বিছেটাকে জুতো দিয়ে পিষে মেরে ফেলে, তাড়াতাড়ি কাপড় ছিঁড়ে রবিনের পায়ে টর্নিকেট বেঁধে দিল কিশোর, যাতে রক্তবাহিত হয়ে বিষ

হৃৎপিণ্ডে পৌঁছতে না পারে। ওখানে পৌঁছলে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়বে বিষ। জিজ্ঞেস করল, 'হাঁটতে পারবে?'

মাথা কাত করল রবিন, 'পারব।'

কিশোরের কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোল সে।

ওদেরকে আসতে দেখল দু-জন কাউবয়। রবিনের অবস্থা দেখে এগিয়ে এল। একজনের নাম রস ডুগান, আরেকজন চাক হারপার।

রবিনকে র‍্যাঞ্চে নিয়ে যেতে সাহায্য করল ওরা।

হই-চই শুনে র‍্যাঞ্চের মালিক মিস্টার কুপারও বেরিয়ে এলেন। ভেতরে নিয়ে গেলেন রবিনকে। বরফ আনতে বললেন।

দৌড়ে গিয়ে ফ্রিজ থেকে বরফের টুকরো বের করে আনল চাক হারপার।

ইতিমধ্যে বিষ-নিরোধক একটা ইঞ্জেকশন দিয়েছেন রবিনকে কুপার। আহত জায়গায় বরফ ডলে দিতে লাগলেন। বললেন, 'ভাগ্যিস র‍্যাঞ্চের কাছে এসে কামড় খেয়েছ। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করা না হলে মারাও যেতে পারতে! তা যাচ্ছিলে কোথায়?'

'আপনার এখানেই আসছিলাম,' জবাব দিল কিশোর। 'একজন লোকের খোঁজে।' লফারের চেহারার বর্ণনা দিল সে।

'নিক কোরাসনের কথা বলছে না তো!' বলে উঠল রস ডুগান।

'নিক কোরাসন!' বিড়বিড় করল কিশোর, 'নাম বানিয়ে বলেছে হয়তো!' কুপারের দিকে তাকাল আবার, 'তারমানে ওরকম চেহারার একজন লোক আছে আপনাদের এখানে?'

'ছিল। এখন নেই। দুই হপ্তা চাকরি করেছে আমার এখানে।'

তেরো

সব কথা খুলে বলতে অনুরোধ করল কিশোর।

'বলার তেমন কিছু নেই,' কুপার বললেন। 'হঠাৎ একদিন এসে হাজির। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ময়লা কাপড়-চোপড়। যেন একটা ভূত। প্রথমে চাকরি দিতে চাইনি। কিন্তু খেপে যাওয়া একটা পনিকে যে ভাবে সামলাল, বুঝলাম ঘোড়া চেনে, ঘোড়ার স্বভাব বোঝে। দিয়ে দিলাম চাকরি।'

কোন সন্দেহ রইল না আর কিশোরের, নিক কোরাসনই মার্টি লফার। জিজ্ঞেস করল, 'একা এসেছিল, না সঙ্গে অন্য কেউ ছিল?'

'একাই এসেছিল,' মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন কুপার, 'কিন্তু রাখতে পারলাম না! শেটল্যাণ্ড পনির ব্যাপারে এত জ্ঞান আমি আর কারোর দেখিনি। লোক হিসেবেও ভাল। আমার খুব কাজে লাগত। কতভাবে চেষ্টা করলাম রাখার জন্যে, থাকল না।' চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'দাঁড়াও,

একটা জিনিস এনে দিচ্ছি। দেখো, কোন উপকার হয় কিনা তোমার। বাংকে ফেলে গিয়েছিল কোরাসন।'

রসকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন কুপার।

রবিন বলল, 'কিশোর, কোন কারণে ব্রাউনের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছে লফার। উত্তরে চলে গেছে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'নামও গোপন করেছে। কারও কাছ থেকে ভাগছে মনে হয়। কাকে ভয় করছে?'

'আছে কোন শত্রু। সেই শত্রু তাকে খুঁজে বের করতে পারেনি। তাই আমাদের অনুসরণ করছে। ভাবছে, আমরা তাকে লফারের কাছে নিয়ে যাব।'

'তাহলে বুঝতে হবে ওদের হাত থেকে লফার ফসকেছে যে বেশিদিন হয়নি। নইলে আমাদের বাধা দিত না শত্রুরা। চুপচাপ থেকে বরং আমাদের পিছে পিছে আসত।'

'কিশোর, এটাই আমাদের সুযোগ। একটা ফাঁদ পাততে পারি।'

এই সময় ঘরে ঢুকলেন কুপার। হাতে একটা সাধারণ পোস্ট কার্ড। বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখো, কিছু আছে কিনা।'

মনযোগ দিয়ে কার্ডটা দেখল কিশোর। ঠিকানার লেখাগুলো কেমন জড়ানো। বলল, 'ডেনভার থেকে পোস্ট করা হয়েছে, নিক কোরাসনের নামে।'

'কি লেখা আছে?' জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে রবিন। 'কাকে সম্বোধন করে লিখেছে?'

কার্ডটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'ডিয়ার মার্টি।'

'তারমানে লফারকেই লিখেছে! আর কি লিখেছে?'

'মাত্র তিনটে অক্ষর,' কার্ডটা রবিনের দিকে কাত করে ধরল কিশোর।

রবিনও দেখতে পেল, ঘন কালো কালিতে লেখা রয়েছে শুধু:

YES

আর কিছু নেই।

অবাক হয়ে বলল রবিন, 'মানে কি এর?'

কুপারও একই প্রশ্ন করলেন। 'কি মানে?'

কিশোর বলল, 'মনে হয় এই প্রশ্নটার জবাব আমি দিতে পারব। তবে তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন, মিস্টার কুপার। এই কোরাসন ওরফে লফারকে সাহায্য করার চেষ্টা কি সত্যি আপনি করবেন?'

'করব না মানে? আমার দেখা সবচেয়ে বড় ঘোড়া বিশেষজ্ঞ। তাকে পেলে যে কোন র‍্যাঞ্চার বর্তে যাবে।'

হাসল কিশোর। 'কিন্তু কাউবয় হিসেবে তাকে তো আপনি পাবেন না, মিস্টার কুপার। লস অ্যাঞ্জেলেসের বড় ব্যবসায়ী এই লোক। কারখানার মালিক। আমার সন্দেহ এখন জোরদার হচ্ছে, তাকে কিডন্যাপই করা হয়েছিল। কিডন্যাপারদের হাত থেকে পালিয়েছে। কোন কারণে পুলিশের

কাছে যায়নি। কিডন্যাপাররা তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। ওদের ধরতে আপনি আমাদের সাহায্য করবেন?'

'করব,' জবাব দিতে একটুও দ্বিধা করলেন না কুপার।

'গুড। রবিন বলছে ফাঁদ পেতে ওদের ধরার চেষ্টা করলে কেমন হয়? আমিও তার সঙ্গে একমত। রবিন, কি ভাবে ফাঁদ পাতবে, ভেবেছ নাকি কিছু?'

মাথা নাড়ল রবিন। 'না। তুমি একটা বুদ্ধি বের করো।'

কুপারের দিকে তাকাল কিশোর। 'মিস্টার কুপার, আপনার দুই সহকারীর সাহায্যও লাগবে আমাদের। রস আর চাককে আমাদের ছদ্মবেশ নিতে হবে। আমাদের পোশাকগুলো পরে অন্ধকারে গিয়ে বোটে উঠবে।'

'কিডন্যাপাররা ভাববে আমরাই উঠেছি,' রবিন বলল। 'তারপর?'

'আমরা র‍্যাঞ্চের পোশাক পরে কাউবয় সেজে র‍্যাঞ্চের গাড়ি নিয়ে আগেই গিয়ে বসে থাকব। চোখ রাখব বোটের ওপর। দেখব, রস আর চাকের পেছনে কেউ লাগে কিনা। লাগলে তাকে ধরার চেষ্টা করব। কি মনে হয়, মিস্টার কুপার? কাজ হবে?'

একটা কথাও না বলে উঠে দরজার কাছে চলে গেলেন কুপার। গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'কোরিন, রস আর চাককে আসতে বলো তো।'

দুই কাউবয় এলে ওদেরকে তার পরিকল্পনার কথা বলল কিশোর। এক কথায় রাজি হয়ে গেল ওরা। লফারকে ওরাও পছন্দ করত। তা ছাড়া র‍্যাঞ্চের একঘেয়ে জীবনে উত্তেজনার খোরাক পেয়েছে।

'এইবার বলো,' কুপার বললেন, 'পোস্ট কার্ডের লেখাটার মানে কি?'

কিশোর হাসল। 'নিজেকে লফারের জায়গায় কল্পনা করুন। মেকসিকো থেকে পালিয়ে এসেছে সে। পকেটে টাকা নেই, সাহায্য করার কেউ নেই, বাড়তি যন্ত্রণা হিসেবে কিডন্যাপাররা লেগে আছে পেছনে। শেটল্যাণ্ড পনির ব্যাপারে জ্ঞান আছে তার। সেই জ্ঞানকে পুঁজি করে র‍্যাঞ্চে চাকরি নিয়েছে, দুটো কারণে—কিছু টাকা উপার্জন, এবং খাওয়া আর বিশ্রাম। কিন্তু এখানে থেকেও স্বস্তি পায়নি...'

'কেন?'

বুঝে ফেলল রবিন। বলল, 'মেকসিকোর বেশি কাছাকাছি বলে। কিডন্যাপারার সহজেই তার খোঁজ পেয়ে যেতে পারে, এই ভয়ে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আরও দূরে সরে যেতে চাইল সে। তখন ডেনভারের এক বন্ধুর কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখল। সম্ভবত জানতে চেয়েছে তার কাছে কোন চাকরি আছে কিনা। সেই বন্ধু জবাব দিয়েছে 'ইয়েস' বলে। এ ভাবেই জবাব দেয়ার কথা চিঠিতে লিখে দিয়েছিল লফার। কিন্তু ভুল করে মার্টির নাম সম্বোধন করে ফেলেছে।'

শিস দিয়ে উঠলেন কুপার। 'তারমানে ডেনভারে চাকরি করতে চলে গেছে! কি চাকরি?'

'যে ব্যাপারে সে বিশেষজ্ঞ,' জবাব দিল কিশোর। 'শেটল্যাণ্ড পনি। আমি

শিওর, ওখানকার কোন ঘোড়ার র‍্যাঞ্চেই পাওয়া যাবে তাকে।'

'ঠিক!' তুড়ি বাজালেন কুপার। 'অতি সহজ এই ব্যাখ্যাটা আগে আমার মাথায় ঢুকল না কেন?'

সূর্য ডোবার আগে আগে বেরিয়ে পড়ল রবিন আর কিশোরের পোশাক পরা দুই কাউবয়। ডকে এসে লাল-সাদা বোটটায় উঠল। তীরে কয়েকজন জেলে আর শ্রমিক ঘোরাঘুরি করছে। তাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল কিশোর-বেশী চাক, 'সব ঠিক আছে তো, রবিন?'

'মনে তো হয়,' রাকস্যাকটা ডেকে ফেলে জবাব দিল রস।

'ঘুরে তো দেখে এলাম। কি বুঝলে? ইয়োমার কোন হোটেলেই আছে লফার, তাই না? চলো, ওখানেই যাব।'

ডকের একপ্রান্তে নোঙর করা ছিল, অন্যপ্রান্তের দিকে চলতে শুরু করল বোট। কণ্ঠস্বর নামিয়ে রস বলল, 'কেমন করছি আমরা, চাক?'

'দারুণ! একেবারে কিশোর পাশা আর রবিন।'

ওদের ঘণ্টা দুই আগে কুপার র‍্যাঞ্চ থেকে একটা জীপ বেরিয়ে গেছে। ধুলোর মেঘ উড়িয়ে চলে গেছে ইয়োমার দিকে। বিশাল স্টেটসন হ্যাট আর ফ্লানেলের চেক শার্ট পরা চাক-বেশী কিশোর বসেছে চালকের আসনে। তার পাশে রসের ছদ্মবেশে রবিন। পায়ের ব্যথা অনেক কমেছে।

ইয়োমার পুলিশ হেডকোয়ার্টারে এসে ঢুকল দু-জনে। ডেস্কে বসে আছে সেই পুলিশ সার্জেন্ট, কয়েক দিন আগে যার সঙ্গে কথা বলেছিল ওরা। কিন্তু চিনতেই পারল না ওদেরকে। ভোঁতা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি সাহায্য করতে পারি?'

'চীফের সঙ্গে দেখা করতে চাই, প্লীজ। বলবেন কিশোর পাশা আর রবিন মিলফোর্ড কথা বলতে এসেছে।'

চমকে গেল সার্জেন্ট। বলল, 'আরে, তোমরা! চিনতেই পারিনি! কি হয়েছে?'

'ছোট্ট একটা ফাঁদ পেতেছি আমরা, সার্জেন্ট,' কিশোর বলল।

কয়েক মিনিট পর সংক্ষেপে সব কথা চীফকে জানাল সে আর রবিন।

মাথা ঝাঁকিয়ে চীফ বললেন, 'প্ল্যানটা ভালই মনে হচ্ছে। তোমাদের সঙ্গে অফিসার স্যাডি রোভারকে দিচ্ছি। সাদা পোশাকে যাবে।'

লম্বা, পেশীবহুল মানুষ স্যাডি রোভার। কি করতে চায়, তাকে বুঝিয়ে বলল কিশোর।

ইয়োমা বোট ডকের কাছে একটা বালির ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে বসল তিনজনে। ছোট ছোট অনেক জলযান আসছে আর যাচ্ছে। ক্রমাগত ঢেউ তুলছে পানিতে। ডকে এমন কয়েকজনকে দেখা গেল, ভাবসাব দেখে মনে হলো ওদের নৌকা বাঁধা আছে জেটিতে।

স্যাডি জানাল, ওরা সন্ধ্যা হলে নৌকা ছাড়বে। তাদের মধ্যে একজন মেকসিকান দৃষ্টি আকর্ষণ করল কিশোরের। ডকে সে-ই একমাত্র লোক, কোন বিশেষ নৌকার প্রতি যার নজর নেই। এক জায়গায় বসে তাকিয়ে আছে

অন্য পাড়ের দিকে।
ফিসফিস করে রবিন বলল, 'ওই যে, ওরা আসছে।'
আবার ডকে ভিড়ল লাল-সাদা বোটটা। নোঙর ফেলল। ডেকে দাঁড়ানো চাক আর রসের দিকে নজর এখন মেকসিকান লোকটার। ওরা দু-জন তীরে নেমে রাস্তা ধরে এগোল। উঠে দাঁড়াল লোকটা। কোন দিকে না তাকিয়ে রস আর চাকের পিছু নিল।
কিশোররাও উঠে দাঁড়াল। বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে মেকসিকান লোকটার পিছু নিল।
একটা হোটেলে ঢুকল চাক আর রস।
সাবধানে এগিয়ে গিয়ে হোটেলের জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল মেকসিকান।
'এই ব্যাটাই আমাদের লোক,' নিচু স্বরে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বলল স্যাডি।
নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়াল তিনজন লোক, টেরই পেল না মেকসিকান। খপ করে তার হাত চেপে ধরল স্যাডি। কঠিন স্বরে বলল, 'তোমাকে অ্যারেস্ট করা হলো!'
হাত ছাড়ানোর জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করল লোকটা। ছুটতে পারল না। তার অন্য হাত চেপে ধরল কিশোর। হোটেল থেকে বেরিয়ে এল চাক আর রস।
থানায় নিয়ে আসা হলো মেকসিকান লোকটাকে।
তার পকেট থেকে কাগজপত্র বের করে দেখে বললেন চীফ, 'নাম পেকারি সোয়ানো। বেআইনী ভাবে ঢুকেছে।' একজন সহকারীকে নির্দেশ দিলেন, 'হাজতে ভরো।'
অভিযান সফল হওয়ায় খুব খুশি চাক আর রস। হাত মেলাল দুই গোয়েন্দার সঙ্গে। কিশোর ওদের ধন্যবাদ দিল।
চাক বলল, 'আমরা তাহলে জীপটা নিয়ে যাই। কি হয়েছে শোনার জন্যে নিশ্চয় অস্থির হয়ে আছেন বস।'
'বাকিটা আর তাহলে দেখতে পারলেন না,' হেসে বলল কিশোর।
'আরও কিছু বাকি আছে নাকি?'
'সবে তো শুরু। আমার বিশ্বাস, আমাদের এই বন্দীটি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। যাবেও। কি বলেন, চীফ?'
হাসলেন চীফ। 'যাওয়াই উচিত। তাকে আমরা যেতে দিলে সোজা সে যাবে তার বন্ধুদের কাছে। হুঁশিয়ার করার জন্যে।'
পরিকল্পনাটা বুঝে গেল চাক। বলল, 'পুরোটা দেখতে পারলে ভালই হত। কিন্তু বস নিশ্চয় ওদিকে অস্থির হয়ে আছেন। বেশি দেরি করা ঠিক হবে না আমাদের।'
বেরিয়ে গেল চাক আর রস। তার একটু পরেই একজন অফিসার এসে জানাল, 'মেকসিকান লোকটা পালিয়েছে। হাজতের দরজায় তালা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল স্যাডি। হোলস্টারে থাবা দিয়ে দুই গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলো!'

বাইরে বেরিয়ে এল কিশোররা। একটা বাড়ির ছায়ায় হারিয়ে যেতে দেখা গেল পেকারিকে। স্যাডির সঙ্গে আরও তিনজন অফিসার রয়েছে। সবাই পিছু নিল লোকটার।

দ্রুত হাঁটছে পেকারি। কয়েকটা গলি পেরিয়ে একটা ছাউনির মধ্যে ঢুকল।

ছাউনিটা ঘিরে ফেলল সাদা পোশাকধারী পুলিশ।

খোলা দরজা দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। পেকারি বাদেও আর দু-জন লোক আছে, ওরাও মেকসিকান।

চোদ্দ

লোকগুলোকে ধরে থানায় নিয়ে আসা হলো। কিন্তু মুখ খোলানো গেল না ওদের। কিছুই বলল না। যতই প্রশ্ন করা হলো, কেবল জানি না, জানি না করল।

চীফ বললেন, 'মনে হচ্ছে এগুলো চুনোপুঁটি। আসলেই কিছু জানে না।'

রাতটা কুপারের র‍্যাঞ্চে কাটিয়ে পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়ল কিশোর আর রবিন। বোটে করে কলোরাডো নদী ধরে ফিরে এল ব্লাইদিতে। দুটো বাঁধ আর আঁকাবাঁকা নদীর বিপজ্জনক একশো মাইল পথ পেরোতে সারাটা দিনই প্রায় লেগে গেল।

ঘাটেই পাওয়া গেল বোটের মালিককে। ছুরি দিয়ে কেটে পুতুল বানাচ্ছে।

ভাড়ার টাকা গুনে দিল কিশোর। পকেটে ভরতে ভরতে জিজ্ঞেস বলল লোকটা, 'ভ্রমণটা হয়তো ভালই হয়েছে?'

কিশোর জবাব দিল, 'হয়তো।'

মোটেলে ফেরার পথে রবিন বলল হেসে, 'আমরা যাওয়ার পর বসে বসে শুধু পুতুলই বানিয়েছে হয়তো?'

কিশোরও হাসল, 'হয়তো। আলসে মানুষের অভাব নেই দুনিয়ায়।'

মোটেলে ফিরে মুসাকে পাওয়া গেল না। ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, ওয়ারনার বল নামে একজন লোকের সঙ্গে সারারাতের জন্যে বেরিয়েছে সে।

পরদিন সকালেও কিছুক্ষণ তার জন্যে অপেক্ষা করল কিশোর আর রবিন। শেষে দেরি হয়ে যাবে বুঝে বেরিয়ে পড়ল। এয়ারপোর্ট থেকে বিমানে করে ডেনভার রওনা হলো লফারকে খুঁজতে।

ডেনভার বিমান বন্দরের তথ্য কেন্দ্র থেকেই জানতে পারল কাছেই

শোবারন পনি র‍্যাঞ্চ নামে একটা ঘোড়ার র‍্যাঞ্চ আছে, যেটাতে শেটল্যাণ্ড পনি উৎপাদন করা হয়। আশেপাশে বেশ কয়েক মাইলের মধ্যে ওই একটা ঘোড়ার র‍্যাঞ্চই আছে।

ট্যাক্সি নিল কিশোর। পাহাড়ী পথ ধরে কয়েক মিনিটেই পৌঁছে গেল র‍্যাঞ্চটায়।

রবিন বলল, 'বেশি সহজে হয়ে গেল না? পাব তো লফারকে?'

'সহজ হলো কোথায়?' কিশোর জবাব দিল, 'কত ঘোরা ঘুরলাম। তারপর তো জানলাম। তাকে পাব কিনা এখনও শিওর না।'

র‍্যাঞ্চের সীমানায় ঢুকে একটা বাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সি।

নামতেই রবিনের চোখে পড়ল, একটা আস্তাবলে ঢুকছে লম্বা, চওড়া কাঁধওয়ালা একজন লোক। ইশারায় কিশোরকে আসতে বলে সেদিকে এগিয়ে গেল রবিন।

আস্তাবলে ঢুকল দু-জনে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাল। একসারি চারকোণা স্টল, ঘোড়া রাখা হয় ওগুলোতে। সব খালি, একটা বাদে। ওটাতে বদমেজাজী একটা ঘোড়াকে শান্ত করার চেষ্টা করছে লম্বা লোকটা, রবিন যাকে দেখেছে।

পেছনে এসে দাঁড়াল গোয়েন্দারা।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার লফার?'

ভীষণ চমকে ঝটকা দিয়ে ঘুরে তাকাল লোকটা। চোখে ভয়। বলল, 'আমার নাম নিক কোরাসন।'

'ভয় পাবেন না আমাদের, মিস্টার লফার,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'আপনার মামা ওয়াল্ট ক্লিঙ্গলস্মিথ আপনার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন। আমাদের পাঠিয়েছেন আপনাকে খুঁজে বের করার জন্যে।'

'কে তোমরা?'

'আমরা গোয়েন্দা। আমি কিশোর পাশা, ও রবিন মিলফোর্ড। আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি আমরা, মিস্টার লফার, বিশ্বাস করতে পারেন। বন্ধু হিসেবে নিতে পারেন আমাদের।'

'বিশ্বাস! বন্ধু!' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল লফার। তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'এই কথাগুলো আর বোলো না আমাকে! দুনিয়ায় বন্ধু বলে কিছু নেই, বিশ্বাসও নেই!'

'আপনার বন্ধু ব্রাউনের কি হয়েছে?'

'ও আমার বন্ধু নয়! আমিই হতে চেয়েছিলাম! গাধামির ফলও পেয়েছি হাতে হাতে!' তিক্তকণ্ঠে বলল লফার। 'সমস্ত কিছুর পরও যাকে খানিকটা বিশ্বাস করেছিলাম, সে-ও আমাকে বোকা পেয়ে ঠকাল। পটিয়ে-পাটিয়ে অ্যাডভেঞ্চারের লোভ দেখিয়ে বাড়ি থেকে বের করল, তারপর ধরে নিয়ে গেল মেকসিকোতে।'

'দু-জনে একসঙ্গে গিয়েছিলেন?' জানতে চাইল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল লফার। 'হ্যাঁ। রাতের বেলা, নৌকায় করে। আগেই খবর

দিয়ে রাখা হয়েছিল। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল নৌকা। রাতে চুরি করে বর্ডার পার হয়ে মেকসিকোতে ঢুকেছি। ওখানে নিজের দলের সঙ্গে দেখা করেছে লফার।'

শিস দিয়ে উঠল রবিন। 'মেকসিকান বিদ্রোহী?'

'না। ওই দল থেকে বেরিয়ে চলে এসেছে। নিজেই একটা দল গড়েছে। বেআইনী পথে টাকা কামানোর জন্যে।'

'তারমানে ব্রাউন ক্রিমিন্যাল!'

'হ্যাঁ।'

'তারপর, বলুন, আপনাকে নিয়ে গিয়ে কি করল?' জানতে চাইল কিশোর।

'সারাক্ষণ পাহারা দিয়ে রাখত। হুমকি দিত আমি পালানোর চেষ্টা করলে, পালিয়ে গিয়ে পুলিশকে খবর দিলে, আমার পরিবারের ক্ষতি করবে। তারপরেও পালালাম ঠিকই, কিন্তু পুলিশের কাছে গেলাম না স্ত্রী-পুত্রের ক্ষতির ভয়ে। নিরুদ্দেশ হয়ে গেলাম। মালগাড়িতে করে বর্ডারে চলে গেলাম। ব্রাউনকে একটা চিঠি লিখে দিলাম, আমি পুলিশের কাছে যাইনি, আমার পরিবারের যেন ক্ষতি না করে। কিন্তু আমার পেছনে ঠিকই লাগল ওরা। ওদের ধারণা, অনেক বেশি জেনে ফেলেছি আমি। মুখ বন্ধ করে দেয়া দরকার।'

'কিন্তু আপনাকে বেরোতে রাজি করাল কি করে ব্রাউন?'

'সেটা বোঝাতে পারব না,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লফার। 'বার বার বন্ধুদের বিশ্বাস করেছি, বার বার ওরা আমার সঙ্গে বেঈমানী করেছে। ব্যবসায় মার খেয়ে মাথাটা ঘোলা হয়ে গিয়েছিল। মনে করলাম, কোথাও বেরোলে হয়তো ভাল লাগবে। তাই ব্রাউন যখন বেড়াতে বেরোনোর কথা বলল, রাজি হয়ে গেলাম। প্লেন নিয়ে ওড়ার পর ব্রাউন বলল মরুভূমির দিকে যেতে, আমাকে নাকি একটা সারপ্রাইজ দেবে। ওখানে প্লেন রেখে আমাকে নিয়ে গিয়ে বোটে উঠল। আমি ভেবেছিলাম সে একজন দুঃসাহসী অ্যাডভেঞ্চারার। কিন্তু আমার ধারণা ভুল। সাধারণ একজন অপরাধী ছাড়া সে আর কিছুই নয়।'

'তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া উচিত,' কিশোর বলল। 'সেই কাজটাই করব। আপনার সাহায্য লাগবে আমাদের, মিস্টার লফার। বেআইনী কি কাজ করছে ব্রাউন, বলুন তো?'

ভয় ফুটল লফারের চোখে। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'না, ওসব কথা আমি বলতে পারব না! তাতে লাভও হবে না। মাঝখান থেকে আমার পরিবারের...'

'দেখুন, মিস্টার লফার, সারাজীবন পালিয়ে বেড়াতে পারবেন না আপনি। তাতে আপনার পরিবারেরও কোন লাভ হবে না। আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। আপনার স্ত্রী আর ছেলেরা অস্থির হয়ে গেছে আপনার জন্যে।'

চোখের কোণ ছলছল করে উঠল লফারের। 'কিন্তু কি করতে পারি

আমি, বলো? বাড়ি তো যেতে পারব না!'

'কেন পারবেন না?'

'ব্রাউন আমাকে খুন করবে! আমার ছেলেদের মেরে ফেলবে!'

'অত সহজ না!' জোর দিয়ে বলল রবিন। 'বলল, আর করে ফেলল! দেশে আইন-কানুন আছে। পুলিশের কাছে যান আপনি।'

আবার নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লফার। 'পুলিশের কাছে আমি যেতে পারব না। কারণ আমিও অপরাধ করে বসে আছি।'

'মানে?' জানতে চাইল বিস্মিত কিশোর।

'ব্রাউনও জানে এটা। তাকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিলে সে-ও আমাকে ধরিয়ে দেবে। আমার হাত দিয়ে বেশ কিছু জাল চেক এখানে ওখানে পাচার হয়ে গেছে।'

'চেক? কি ধরনের? আমেরিকান সরকারের চেক?'

'না, ব্যক্তিগত চেক।'

নানা ভাবে লফারকে বোঝাতে লাগল কিশোর আর রবিন কিছুতেই বাড়ি ফিরে যেতে রাজি করাতে পারল না। তবে একটা কথা দিল—ওদেরকে না জানিয়ে শোবারন র‍্যাঞ্চ ছেড়ে আর পালাবে না।

হাইওয়ের ধারে একটা রেস্টুরেন্টে এসে খাওয়া সারল দুই গোয়েন্দা। ওখান থেকে ফোন করল মুসাকে।

'মুসা? কিশোর। ডেনভার থেকে বলছি। খবর আছে।'

'আমার কাছেও আছে।' উত্তেজিত শোনাল মুসার কণ্ঠ। 'কিন্তু এত দেরিতে করলে? আমি তো ভেবেছিলাম আর করবেই না বুঝি! অনেক বড় একটা সূত্র পেয়েছি। আসো এখানে, বলব। ডেনভারে কি করছ তোমরা?'

'লফারকে খুঁজে বের করেছি।'

'খাইছে! সত্যি?'

'হ্যাঁ। তবে খবরটা কারও কাছে ফাঁস কোরো না। কাল সকালের প্লেনে আসছি আমরা।'

খাওয়ার পর আবার শোবারন র‍্যাঞ্চে ফিরে এল কিশোররা সারাদিন কাজ করে এখন বিশ্রাম নিচ্ছে শ্রমিকেরা। কেউ অলস ভঙ্গিতে বসে আছে বারান্দায়, কেউ তাস খেলছে, কেউ গল্প করছে। সবার থেকে আলাদা বসে একটা জিন মেরামত করছে লফার। আগের চেয়ে অনেকটা শান্ত লাগছে তাকে।

কিশোরদের দেখে উঠে এল লফার।

কিশোর বলল, 'লোকগুলো মনে হচ্ছে খুব ভাল।'

'হ্যাঁ,' লফার বলল। 'ভাল লোক। আমার আসল নাম কেউ জানে না এখানে। এদের মাঝে ভালই কাটে।'

হাঁটতে হাঁটতে মাঠের দিকে সরে গেল তিনজনে সেখানে চরছে ঘোড়ার পাল।

'কেন যে এখান থেকে বেরোতে চাইছেন না,' কিশোর বলল, 'মাথায়

ঢুকছে না আমার। জায়গাটা ভাল, আপনার জন্যে নিরাপদ, সবই বুঝলাম। কিন্তু এখানে থেকে তো জীবন কাটাতে পারবেন না। যদি কিছু মনে না করেন, আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি।'

'কি?' কিশোরের মুখোমুখি দাঁড়াল লফার। মনে হচ্ছে খানিকটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে।

'এখুনি লস অ্যাঞ্জেলেসে ফেরার দরকার নেই আপনার। আমাকে আর রবিনকে সাহায্য করতে পারেন। ব্রাউনকে ধরব আমরা। তাকে ধরে পুলিশের হাতে দেব। হয়তো এর জন্যে আপনার সামান্য অপরাধ মাপও হয়ে যেতে পারে। ব্রাউনের হাত থেকেও রেহাই পাবেন।'

দ্বিধা করল লফার। আস্তে করে হাত বাড়িয়ে কিশোরের একটা হাত চেপে ধরল, 'ঠিক আছে, আমি রাজি। প্রথমে কোথায় যেতে হবে?'

'ব্লাইদি।'

চমকে গেল লফার। 'কিন্তু ওখানে তো ব্রাউনের স্পাইরা আছে! দেখলেই চিনে ফেলবে আমাকে!'

'চিনবে না। ছদ্মবেশ পরিয়ে নিয়ে যাব।'

পনেরো

পরদিন মাঝবয়েসী একজন প্রৌঢ় র‍্যাঞ্চারের ছদ্মবেশে কিশোর আর রবিনের সঙ্গে প্লেন থেকে নামল লফার। সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটতে বলে দিয়েছে তাকে কিশোর। ভালই অভিনয় করছে সে।

মোটেলেই আছে মুসা। ওদের আসার অপেক্ষা করছে। লাফ দিয়ে উঠে এসে জড়িয়ে ধরল কিশোরকে। তারপর রবিনকে। হাত মেলাল। তাকাল লফারের দিকে।

পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর। সব কথা জানাল। ব্রাউনকে ধরার প্ল্যান করেছে যে বলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এবার তোমার দারুণ খবরটা বলে ফেলো! কি সূত্র পেয়েছ?'

'দু-দিন আগে রাতের বেলা ওয়ারনার বলের সঙ্গে মরুভূমিতে গিয়েছিলাম কিছু নিশাচর জানোয়ারের ছবি তোলার জন্যে। একটা ছবিতে জানোয়ারের সঙ্গে কি উঠেছে জানো? একটা লোকের ছবি। নদীর কাছ থেকে কোথাও সরে যাচ্ছিল সে।'

'এতে অবাক হওয়ার এমন কি ঘটল? রাতের বেলা নদী থেকে মরুভূমিতে নামতে পারে লোকে। তোমরাও তো গিয়েছ।'

'আসল কথাটা শোনোই না। লোকটা কে জানো? রকি বীচে তোমাদের ইয়ার্ডে যে আড়ি পেতে ছিল।'

'বলো কি!' এইবার অবাক হলো কিশোর। 'লস অ্যাঞ্জেলেসের সেই

বেয়ারা! হুঁম, এইটা একটা সূত্র বটে!'

ওদের কথা বুঝতে পারছে না লফার। তাকে বুঝিয়ে দিল কিশোর। চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলল, 'আমার ধারণা, ব্রাউনের দলের লোক ও। চিনতে পারছেন?'

'নাহ্। আমাকে যারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, ওরা মেকসিকান।' অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল লফার, 'তা থাকব কোথায় আমি? এই মোটেলে?'

'অসুবিধে কি?' রবিন বলল।

না, অসুবিধে নেই। রুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে রেস্টুরেন্টে ঢুকল চারজনে। খাওয়ার পর কিশোর বলল, 'এবার কাজের কথায় আসা যাক। মরুভূমিতে যাওয়ার কথা ভাবছি। নকশাগুলোর কাছে। তা ছাড়া ওখানে যখন ছদ্মবেশী বেয়ারাকে দেখা গেছে, কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয় আছে। ওখানে মাটি খোঁড়া হয়েছে, দেখেছি। আরও কোথাও খুঁড়েছে কিনা দেখব।'

'যারা খুঁড়েছে তাদের সঙ্গে ব্রাউনের দলের সম্পর্ক আছে ভাবছ নাকি?' রবিনের প্রশ্ন।

'থাকতেও পারে। রিপ্লিতে নদীর ধারে একটা কেবিন ভাড়া নেব আমরা। ওখানে থাকব। বোট ভাড়া করব। তাতে যতবার খুশি নদী পেরিয়ে মরুভূমিতে যাতায়াত করতে পারব।'

এই পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি খুশি হলো লফার। কারণ লোকালয়, বিশেষ করে ব্লাইদি থেকে সরে যেতে পারবে।

'বেশ, তাহলে ওই কথাই রইল,' কিশোর বলল। 'সকালেই রওনা হব আমরা। কারও কোন কথা আছে?'

'এক কাজ কোরো,' মুসা বলল, 'তোমরা তিনজন চলে যেয়ো। আমি বরং ব্লাইদি থেকে বোট ভাড়া করে, বাজার করে নিয়ে যাব। খাবার তো লাগবে। সঙ্গে করে আমার বন্ধু ওয়ারনার বলকে নিতে চাই। ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়। দরকার পড়লে আমাদের সাহায্যও করতে পারবে।'

'মন্দ বলোনি। কেবিনটা বরং তার নামেই ভাড়া করব। তাতে খোঁজ-খবর নিলেও আমাদের শত্রুরা কিছু সন্দেহ করতে পারবে না।'

পরদিন দুপুরে রিপ্লিতে পৌঁছে একজন কৃষকের কাছ থেকে একটা কেবিন ভাড়া করল কিশোররা। কেবিনটা পড়েছে নদীর এপারে ক্যালিফোর্নিয়ার সীমানায়। বাড়ির পেছনে ছড়ানো বারান্দা। ওখানে দাঁড়ালে নদী ও নদীর অন্য পাড়ে অ্যারিজোনার বিশাল টিলা আর পাহাড়গুলো চোখে পড়ে, যেখানে রয়েছে দানবীয় সব নকশা। হলুদ রঙের সুন্দর টামারিস্ক গাছ ঘিরে রেখেছে কেবিনটাকে।

'বাসা পছন্দ হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কৃষক।

'খুউব,' জবাব দিল কিশোর।

'তবে একটা ব্যাপারে সাবধান থাকবে।'

'কি?' সতর্ক হয়ে উঠল কিশোর। ভাবল চোর-ডাকাতের কথা বলবে বুঝি।

'সাপ। র‍্যাটল স্নেক।'

কয়েক মিনিট পরই কৃষকের কথার প্রমাণ পাওয়া গেল। বাড়ির চারপাশটা ঘুরে দেখার জন্যে বারান্দা থেকে নেমেছিল লফার। কিন্তু কয়েক পা এগোতে না এগোতেই বালির মধ্যে থেকে ফোঁস করে উঠল সাপ। আরেকটু হলেই তার পায়ে কামড়ে দিয়েছিল। লাফ দিয়ে এসে আবার বারান্দায় উঠল সে।

রবিন আর কিশোর মিলে সাপটাকে মেরে ফেলল।

কাঁপতে কাঁপতে লফার বলল, 'র‍্যাটলের বিষ যে কি জিনিস, হাড়ে হাড়ে জানা আছে আমার। ছোটবেলায় একবার কামড় খেয়েছিলাম। নেহায়েত আয়ু আছে, তাই বেঁচেছি।'

কেবিনের ভেতরও সাপ থাকতে পারে ভেবে প্রতিটি ঘর ভালমত খুঁজে দেখল ওরা।

রবিন বলল, 'আর থাকতে পারছি না আমি। পেটের মধ্যে কিচ্ছু নেই। খাওয়া দরকার।'

খাওয়ার কথায় মুসার কথা মনে পড়ল কিশোরের। বলল, 'মুসারা তো এখনও আসছে না।'

সঙ্গে করে স্যাণ্ডউইচ এনেছে ওরা। খেয়ে নিল।

ইতিমধ্যে গোয়েন্দাদের ওপর অনেকটা বিশ্বাস এসেছে লফারের। নিজে নিজেই বলল, 'জানলে সব বলতাম তোমাদের কিন্তু আমিও তেমন কিছু জানি না।'

'কোন্ ব্যাপারে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর

'এই ব্রাউনের দলের ব্যাপারে।'

'যা জানেন তাই বলুন। তাতেও সাহায্য হবে।'

'আসলে কিছুই জানায়নি ওরা আমাকে। ওদের দলে যোগ দিতে রাজি হইনি। ওদের আস্থা অর্জন করতে পারিনি।'

'ওদের কাজটা কি, সেটা কি বলতে পারবেন?'

'শিওর না। অনুমান করতে পারি কেবল। গোড়া থেকেই বলি। বর্ডার পেরোনোর পর একটা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলল আমাকে ব্রাউন। আশেপাশে আর কোন বাড়িঘর নেই। বাড়িটায় তিনজন মেকসিকান আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ওদের হাবভাব ভাল লাগল না কেমন করে যেন তাকাচ্ছিল আমার দিকে। সবার মুখেই খালি টাকার গল্প; কি করে অল্প সময়ে বেশি টাকা হাতানো যায়। সন্দেহ জাগল আমার। বোকার মত সেটা ফাঁস করে দিলাম ওদের কাছে। বললাম, ওদের সঙ্গে থাকব না। কিন্তু আমাকে আটকে ফেলল ব্রাউন। বেরোতে দিল না।

'দুই বার আমাকে শহরে নিয়ে গেছে সে। ভয় দেখিয়ে আমাকে দিয়ে তার জাল চেক খাবারের দোকান থেকে ভাঙাতে বাধ্য করেছে। একটা মেকসিকান ব্যাংকের নামে ওই চেকগুলো তৈরি হয়েছে যার নামে করা হয়েছে, সেটাও ছদ্মনাম।'

'পালালেন কখন?'

'বলছি। ওদের বেআইনী কাজে আমাকে যোগ দেয়ার জন্যে চাপ দিয়ে চলল ব্রাউন। কিছুতেই আমাকে রাজি করাতে না-পেরে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিল একটা নিরালা জায়গায়। ঘরে আটকে সারাক্ষণ আমাকে পাহারা দিয়ে রাখা হত, সে-কথা তো বলেইছি। ওদের কাজের ব্যাপারে আমার সামনে আর মুখ খুলত না। আড়ি পেতে থেকে কথা শোনার চেষ্টা করেছি। জিঙ্ক প্লেটের কথা বলতে শুনে অনুমান করলাম কোন কিছু জাল করার ব্যাপারে আলোচনা করছে ওরা।'

'কি জাল করছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'তা বলতে পারব না।'

হঠাৎ বলে উঠল কিশোর, 'জবাবটা আমি বোধহয় দিতে পারব, মিস্টার লফার। কোন আমেরিকানের নাম ওদেরকে বলতে শুনেছেন?'

'শুনেছি। ডগলাস বার্ড।'

চট করে পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর আর রবিন। মরুভূমির গর্তে পাওয়া রুমালটার কোণে লেখা ছিল D. এখন বুঝল ওটা ডগলাসের নামের আদ্যক্ষর।

চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'ডগলাস বার্ডই আমাদের ছদ্মবেশী বেয়ার!'

লফার বলল, 'তার দু-জন সহকারী আছে। সিজার এবং মারফি।'

'তাই নাকি?' কিশোর বলল, 'তাহলে আপনার অফিসে ওই দু-জনই গিয়েছিল আপনার সেক্রেটারির কাছে খোঁজ নিতে। তাকে ভয় দেখিয়েছে, রাতের বেলা মরুভূমিতে বার্ডের ছবিই উঠে গেছে মুসার ক্যামেরায়। রকি বীচে তার মাথায় বাড়ি মেরে ছবি কেড়ে নিয়ে গেছে এই লোকই।'

'একটা ব্যাপার মেলাতে পারছি না,' রবিন বলল।

'কি?'

'একটা পাথর জ্যাসপার। মরুভূমিতে কুড়িয়ে পেয়েছি, আপনার প্লেনটা যেখানে পাওয়া গেছে, তার কাছে। মিস্টার লফার, দামী চোরাই পাথরেরও ব্যবসা করে নাকি ব্রাউনের দল? পাথর নিতেই হয়তো মরুভূমিতে গিয়েছিল বার্ড, মুসার ক্যামেরায় তার ছবি উঠে গেছে?'

'উঁহু!' অবাক হয়ে মাথা নাড়ল লফার। 'আমার তো মনে হয় [illegible] পাথর-টাথরের কথা কখনও বলতে শুনিনি ওদের।'

'তাহলে অন্য কোন কারণে মরুভূমিতে গেছে বার্ড,' কিশোর বলল, 'আবারও যেতে পারে। কখন যাবে জানি না। ওকে ধরতে হলে রাতের বেলা ওখানে হাজির থেকে পাহারা দিতে হবে আমাদের।'

ষোলো

ইঞ্জিনের মৃদু ফটফট শব্দ ভেসে এল নদীর দিক থেকে। বাড়ল শব্দটা। কথা থামিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল কিশোর আর রবিন। বড় একটা মোটরবোট আসতে দেখল। তাতে দু-জন লোক।

'মনে হয় মুসারা আসছে,' রবিন বলল।

কাছে এল বোটটা। মুসাকে চিনতে অসুবিধে হলো না। হাত নেড়ে চিৎকার করে তাকে ডাকতে লাগল ওরা।

বোটের নাক ঘুরে গেল। এগিয়ে এসে কেবিনের নিচে নদীর ঢালে তৈরি জেটিতে ভিড়ল।

একজন সুদর্শন তরুণকে নিয়ে নেমে এল মুসা। বয়েস বাইশ-তেইশ হবে। রোদের মধ্যে থাকতে থাকতে লোকটার চামড়া উজ্জ্বল বাদামী হয়ে গেছে। মাথা ভর্তি চুলের আসল রঙ ছিল সোনালি, এখন সাদা হয়ে গেছে মরুভূমির কড়া রোদে ঘুরতে ঘুরতে।

কিশোর আর রবিনের সঙ্গে ওয়ারনার বলের পরিচয় করিয়ে দিল মুসা।

হাত মেলানো আর কুশল বিনিময়ের পালা শেষ হলে হাতে হাতে বোট থেকে খাবারের প্যাকেটগুলো নামিয়ে আনল ওরা। কেবিনে নিয়ে এল।

মার্টি লফারের সঙ্গেও বলের পরিচয় করিয়ে দিল মুসা। হাসিখুশি লোকটাকে পছন্দ করল সবাই।

তিন গোয়েন্দার সব সদস্যই হাজির। রাতের বেলা কি ভাবে পাহারা দেবে, এই নিয়ে আলোচনায় বসল সবাই।

সিদ্ধান্ত হলো, বোটে করে অপর পারে চলে যাবে ওরা। টিলার ওপর উঠে লুকিয়ে থাকবে। ওখান থেকে আশপাশে বহুদূর চোখে পড়ে। কেউ এলে সহজেই দেখতে পাবে। বার্ড কিংবা তার সাঙ্গপাঙ্গরা এলে, তাদের ধরা হবে।

বিকেল হয়ে গেল। শুধু স্যাণ্ডউইচ খেয়ে আর কতক্ষণ থাকা যায়। খিদে পেয়ে গেল ওদের। রান্না চড়ানো দরকার। লফার বলল, 'ঘোড়া পোষা ছাড়া আরেকটা কাজ ভাল করতে পারি আমি। রান্না। করতে দিয়েই দেখো।'

কোন আপত্তি নেই কারও। সত্যি প্রমাণ করে দিল লফার, রান্নায়ও তার চমৎকার হাত। খেয়ে সবাই প্রশংসা করল।

বারান্দায় এসে বসল সবাই। গল্প করতে লাগল। সূর্য ডুবতে দেরি নেই। কেবিন ঘিরে রাখা গাছের জটলার দিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। চিৎকার করে উঠল, 'খাইছে! দেখো, কে এসেছেন!'

ফিরে তাকাল সবাই।

মুসার মতই অবাক হয়ে গেল কিশোর আর রবিনও।

মিস্টার সাইমন!

হাসিমুখে এগিয়ে এলেন ডিটেকটিভ। তাঁকে এখানে দেখতে পাবে কল্পনাই করেনি তিন গোয়েন্দা। লাফ দিয়ে উঠে গেল এগিয়ে আনার জন্যে।

কেন এসেছেন, জানা গেল শিগগিরই। হাত-মুখ ধুয়ে, খেয়েদেয়ে সবার সঙ্গে বারান্দায় এসে বসলেন সাইমন। হেসে বললেন, 'কিশোর, কয়েক দিন ধরে তোমার আর রবিনের পিছে লেগে রয়েছি আমি। কলোরাডো নদী ধরে গেলে তোমরা, ফিরেও এলে। খুঁজতে খুঁজতে মিস্টার লফারের বন্ধু কুপারের র‍্যাঞ্চে গিয়ে হাজির হলে। আমিও গিয়েছি। মিস্টার কুপার আমাকে সব বলেছেন।'

রবিন বলল, 'কিছুই বুঝতে পারছি না আমি, স্যার। গোড়া থেকে বলুন। আমাদের পিছু নিলেন কেন?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নদীর পানির দিকে তাকিয়ে রইলেন সাইমন। কোনখান থেকে শুরু করছেন ভাবছেন যেন। বললেন, 'মিস্টার লফারকে খুঁজে বের করার দায়িত্বটা তোমাদের দেয়ার আগেই আরেকটা কেস পেয়েছিলাম আমি, একটা চেক জালিয়াতির কেস। সরকারি চেক জাল করা হচ্ছে। পুলিশ কোন কিনারা করতে পারছিল না।'

'চেক জালিয়াতি!' মুসা বলে উঠল। 'কিশোর, আমি যেটা পেয়েছিলাম, ওটাও একই দলের কাজ নয়তো?'

মুসা কি ভাবে চেক পেয়েছিল, সাইমনকে জানাল কিশোর।

মানিব্যাগ থেকে একটা চেক বের করলেন তিনি। মুসার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'দেখো তো এটার মত কিনা?'

একবার দেখেই মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক এই জিনিস। তবে ওটাতে টাকার অঙ্ক খুব কম ছিল।'

'তাহলে আর কোন সন্দেহ নেই,' চেকটা আবার মানিব্যাগে ভরতে ভরতে হাসলেন সাইমন। 'তোমরা আর আমি একই কেসে কাজ করছি।'

'আপনি মেকসিকোতেও গিয়েছিলেন, না?' জানতে চাইল কিশোর।

'হ্যাঁ। জালিয়াতদের ছাপাখানাটা খুঁজে বের করার জন্যে। মেকসিকান পুলিশের সহায়তায় বেরও করেছি, কিন্তু পালের গোদাটাকে ধরতে পারিনি। পালিয়েছে। আমার বিশ্বাস, আমেরিকায় ঢুকে পড়েছে ওরা।'

'ওখানে পুলিশের হাত থেকে আপনিই ছাড়িয়েছেন আমাদের।'

হাসলেন ডিটেকটিভ। মাথা ঝাঁকালেন।

'আমরা মেকসিকোতে আছি, পুলিশের হাতে ধরা পড়েছি, জানলেন কি করে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'তোমাদের সেই স্টেশন মাস্টার কাপারিলো তোমাদেরকে ট্রেনে তুলে দিয়েই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। পুলিশ আমাকে জানিয়েছে। একজন আমেরিকানের পেছনে আরও দু-জন আমেরিকান লেগেছে শুনে অবাক হয়েছিল ওরা। সন্দেহ হয়েছিল, আমি হয়তো কিছু জানতে পারি।

তাই জানিয়েছে। চেহারার বর্ণনা শুনেই বুঝে গেলাম, তোমরা ছাড়া আর কেউ নয়। পুলিশকে নিয়ে ছুটলাম সেই নির্জন স্টেশনে। মরুভূমির মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে নিতান্ত ভাগ্যক্রমেই আবিষ্কার করে ফেললাম জালিয়াতদের ছাপাখানা।'

'তারমানে না জেনেই আপনার কেসের সমাধানটাও আমরাই করে দিলাম,' হেসে বলল রবিন।

'হ্যাঁ, অনেক সাহায্য করেছ তোমরা,' স্বীকার করলেন সাইমন। 'মালগাড়িতে করে তোমাদের পিছু নেয়ার ব্যাপারটাও একটা সূত্র দিয়েছিল আমাকে। ভাবলাম, জালিয়াতদের সর্দারও ওই পথেই সীমান্ত পেরোনোর চেষ্টা করবে না তো? তক্ষুণি পুলিশকে সতর্ক করে দিলাম। বললাম, সীমান্তের কাছে যত ট্রেন থামে সব চেক করতে।'

'আপনি জানতেন, তাতে আমরাও ধরা পড়ব। বলে দিলেন, আমাদের ধরলেও যাতে ছেড়ে দেয়া হয়, তাই না?'

আবার মাথা ঝাঁকালেন ডিটেকটিভ। 'ঠিকই আন্দাজ করেছ। বুঝে গিয়েছিলাম, মিস্টার লফারের খোঁজ তোমরা পেয়ে গেছ। তাঁর চিহ্ন অনুসরণ করেই এগিয়ে যাচ্ছ। তাই আমিও তোমাদের পিছু নিলাম। আমার সন্দেহ হয়েছিল, জালিয়াতদের সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ আছে। তোমরা তাঁকে খুঁজে বের করতে পারলে তিনি তখন আমাকে তাদের কাছে যাওয়ার পথ দেখাতে পারবেন।

'প্রেসটার ওপর নজর রেখেছে পুলিশ। কাউকে এখনও গ্রেপ্তার করেনি। জালিয়াতদের বুঝতেই দেয়া হয়নি যে ওটা আবিষ্কার হয়ে গেছে। জানলে সতর্ক হয়ে গা ঢাকা দিতে পারে রাঘব বোয়ালগুলো। ওদেরকে আগে ধরতে পারলে চুনোপুঁটিগুলোকে ধরা কিছু না। খবর পেয়েছি, আজ রাতে নতুন ছাপা অনেক জাল চেক আসবে একটা বিশেষ জায়গায়। সেখান থেকে ছড়িয়ে দেয়া হবে সারা আমেরিকায়।'

'বিশেষ জায়গাটা কোথায়, বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি,' কিশোর বলল। 'নদীর ওপারে টিলার কাছে, যেখানে দানবীয় নকশা আঁকা আছে। ওখানে প্লেন থেকে ফেলে দেয়া হয় জাল চেকের বাণ্ডিল, নিচে লোক থাকে, তারা ওগুলো নিয়ে নদীপথে ছড়িয়ে পড়ে, তুলে দেয় বিভিন্ন শহরের এজেন্টদের কাছে। তাই তো'

'আমিও ঠিক একই অনুমান করেছি,' সাইমন বললেন।

'আজ রাতে ওদের ওপর হামলা চালানোর কথা ভাবছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি আসায় ভালই হলো। আমরাও আজ রাতে ওখানে গিয়ে পাহারা দেয়ার প্ল্যান করেছিলাম। কি ঘটছে জানতাম না। জানা থাকায় এখন সুবিধে হবে।'

'তাহলে আর বসে আছি কেন?' উত্তেজিত হয়ে বলল মুসা। 'আমরা

ছয়জন। লোক কম না। দু-চারজন হলে সহজেই কাবু করে ফেলতে পারব। নাকি পুলিশ নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন?'

'না,' মাথা নাড়লেন সাইমন। 'বেশি লোকের আনাগোনা হলে টের পেয়ে যাবে ডাকাতেরা। প্লেন থেকে চোখেও পড়ে যেতে পারে। চেকগুলো হয়তো তখন ফেলবেই না।'

সতেরো

রাত আরেকটু বাড়তে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল সবাই। মুসার নিয়ে আসা বোটটায় চড়ল।

নদীর ওপারে তারাখচিত আকাশের পটভূমিতে মাথা তুলে রেখেছে টিলার চূড়া। কালো, কেমন ভূতুড়ে দেখাচ্ছে।

বোটের হাল ধরেছে বল। ইঞ্জিনের শব্দ শুনলে ডাকাতরা হুঁশিয়ার হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে সরাসরি না গিয়ে প্রথমে খানিকটা উজানে নিয়ে এল বোট। তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। স্রোতের টানে ভাটির দিকে আপনাআপনি ভেসে চলল বোট। টিলার কাছাকাছি আসার পর নোঙর করল সে।

নিঃশব্দে মাটিতে নামল সবাই। পাড়ের ওপর উঠে এগিয়ে চলল সারি দিয়ে। বালি পার হয়ে এসে দাঁড়াল একশো ফুট উঁচু টিলার গোড়ায়। ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওপরে।

এদিকের মরুভূমি বলের অতি পরিচিত। রাতে চলতেও অসুবিধে হয় না। তাই নেতৃত্বটা সে-ই নিল। আগে আগে চলল।

এদিকের ঢাল বড় বেশি খাড়া। তার ওপর রয়েছে আলগা পাথর। পা পড়লে আর রক্ষা নেই। পিছলে পড়তে হবে। কোন রকম শব্দও করা চলবে না, শত্রুদের কানে চলে যেতে পারে। সুতরাং গতি হয়ে গেল খুবই ধীর।

তবে অবশেষে চূড়ার কাছে পৌঁছাল দলটা। মাথা তুলেই ঝট করে নামিয়ে ফেলল বল ফিসফিস করে জানাল, চারটে ছায়ামূর্তিকে চোখে পড়েছে।

সাইমন বললেন, ভাগাভাগি হয়ে এগোতে হবে এবার।

কিশোর আর রবিন ডানে সরে গেল। সাবধানে উঠে এল মালভূমির মত সমতল চূড়াটায়। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসল।

কিশোরের কাঁধে হাত রেখে আলতো চাপ দিল রবিন। নীরবে হাত তুলে দেখাল। তারার আলোতেও ঝোপের পাশের গুহামুখটা নজরে পড়ছে। আগের বার দিনের বেলা কেন নজরে পড়েনি বুঝতে অসুবিধে হলো না।

মুখের অর্ধেকটা ঝোপের আড়ালে থাকে। বাকি অর্ধেকটায় পাথর চাপা দিয়ে রাখলে সহজে কারও চোখে পড়বে না। চোরাই মাল কিংবা জাল চেক লুকিয়ে রাখার চমৎকার জায়গা।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একটা প্লেনের ইঞ্জিনের গুঞ্জন শোনা গেল।

একসঙ্গে জ্বলে উঠল অনেকগুলো আলো। আচমকা আলোকিত করে ফেলা হলো চূড়ার একাংশ। বৈদ্যুতিক লণ্ঠন জ্বেলে দানবীয় নকশাটার বাঁ হাতের ওপর দাঁড়িয়ে গেছে চারজন লোক। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। একজনকে চিনতে পারল কিশোর—ডগলাস বার্ড, অন্য তিনজন অপরিচিত। না না, আরও একজনকে চেনা গেল। সবুজ মোটরবোট চুরি করেছিল যে লোকটা, পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিল, এ সেই লোক।

উড়ে এল প্লেনটা। একটা আলোও জ্বালেনি। টিলার মাথায় চক্কর দিল দু-বার। কালো আকাশের পটভূমিতে ভালমতই চোখে পড়ছে ওটাকে। হঠাৎ সাদাটে একখণ্ড ধোঁয়ার মত কি যেন ছিটকে বেরোল ওটা থেকে।

চিনে ফেলল কিশোর। 'প্যারাশুট!'

সরে যেতে লাগল প্লেনটা। তারমানে ওটার কাজ শেষ, চলে যাচ্ছে এখন।

নেমে আসছে প্যারাশুট। কোন মানুষ নেই। দড়িতে বাঁধা বড় প্যাকেটের মত একটা জিনিস ঝুলছে। দানবের গায়ের ওপর নামল ওটা। দোল খেয়ে বিশাল এক ছাতার মত ধসে পড়ল প্যারাশুটটা। ঘিরে ফেলল চার লণ্ঠনধারী। আলো নিভিয়ে ফেলেছে। প্যারাশুট থেকে প্যাকেটটা খুলতে ব্যস্ত হলো। আক্রমণ করার এটাই উপযুক্ত সুযোগ।

রবিনকে নিয়ে উঠে দৌড় দিল কিশোর। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, আরও চারটে ছায়ামূর্তি বিভিন্ন দিক থেকে ছুটে আসছে।

এ রকম কোন পরিস্থিতির জন্যে তৈরি ছিল না ডাকাতেরা। চমকে গেল। ওরা আঘাত হানার আগেই ওদের ওপর এসে পড়ল আঘাত। পাল্টা আঘাত হানার সুযোগ পেল না তেমন। যোদ্ধা হিসেবেও ওরা ভাল না। কারাত জানা চার গোয়েন্দা, সেই সঙ্গে বাড়তি আরও দু-জন লোক, এতজনের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। তাছাড়া সাইমনের কাছে রয়েছে পিস্তল।

কাবু করে ফেলা হলো চার ডাকাতকে।

হঠাৎ পাথর গড়ানোর শব্দ হলো। ঝট করে ঘুরে তাকাল মুসা। চোখে পড়ল দ্রুত ঢালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আরেকটা ছায়ামূর্তি। ডাকাতদের আরেকজন। 'ধরো, ধরো ব্যাটাকে!' চিৎকার করে দৌড় দিল সে।

পালাতে পারল না লোকটা। ডাইভ দিয়ে তাকে নিয়ে মাটিতে পরল মুসা।

লোকটার মুখে টর্চের আলো ফেলতেই চমকে উঠল লফার, 'ব্রাউন!'

'হ্যাঁ, এই লোকটাই পালের গোদা,' মিস্টার সাইমন বললেন। 'আপনার

বন্ধু।'

চারজনকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল সে। প্লেনের দিকে নজর ছিল বলে প্রথমে আমাদের কাউকে চোখে পড়েনি। দলের চারজন লোককে আক্রান্ত হতে দেখে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল সে। ওরা ধরা পড়ার পর পালাতে চেয়েছিল। কিন্তু সর্বনাশ করে দিল পাথরটা। ওটাতে লাথি লেগে শব্দ হয়ে গিয়েছিল। দেখে ফেলেছিল মুসা।

দড়ির অভাব নেই। প্যারাশুট থেকে দড়ি কেটে নিয়ে পাঁচজনকে শক্ত করে বেঁধে ফেলা হলো। ঝোপ আর পাথরের আড়ালে খুঁজে দেখা হলো আর কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। না, আর কেউ নেই।

প্যারাশুটে করে নামিয়ে দেয়া প্যাকেটটা খুললেন সাইমন। বেরিয়ে পড়ল নিখুঁত ভাবে বাণ্ডিল করা হাজার হাজার জাল চেক। ইউনাইটেড স্টেটস গভর্নমেন্টের নামে ছাপা।

'যাক, প্রমাণ সহ হাতেনাতে ধরা পড়ল,' সন্তুষ্ট হয়ে বললেন সাইমন। 'অস্বীকার আর করতে পারবে না কিছু।'

একটা টর্চ হাতে উঠে দাঁড়াল কিশোর। বলল, 'আমার সঙ্গে আসুন। একটা জিনিস দেখাব।'

ঝোপের ধারে গুহামুখটার কাছে সবাইকে নিয়ে এল সে। আলো ফেলে দেখে বোঝা গেল, গুহা নয়, বড় গর্ত। ভেতরে পাওয়া গেল দড়ির বাণ্ডিল, মাটি খোঁড়ার যন্ত্রপাতি, আর আরও এক বস্তা জাল চেক।

আঁতকে গেল মুসা। 'বাপরে বাপ, কত! সব বাজারে ছাড়তে পারলে সর্বনাশ হয়ে যেত!'

আসল কাজ শেষ। এবার বন্দিদের নিয়ে যেতে হবে। সেটা একটা বড় সমস্যা। সমাধান দিল মুসা। সে আর বল বোট নিয়ে যাবে পুলিশকে খবর দিতে। অন্যেরা ততক্ষণ ওখানেই বসে পাহারা দেবে বন্দিদের।

মুসা আর বল চলে গেল।

লণ্ঠন জ্বেলে বন্দিদের কাছে বসে রইল অন্য চারজন।

'আমাকে পুলিশে দিলে লফারও বাঁচতে পারবে না,' আচমকা পাতলা, নাকি গলায় বলে উঠল ব্রাউন। 'সে-ও আমাদের দলে ছিল।'

'না, ছিল না,' জোর প্রতিবাদ করলেন সাইমন। 'তোমাদের ভয়ে বহুদিন ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে সে।'

'তাতে কি? আমাদের সঙ্গে কাজ করার পর পালিয়েছে। আমার কাছ থেকে জাল চেক নিয়ে বাজারে ছেড়েছে। বিশ্বাস না হলে জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

বিষণ্ন স্বরে জবাব দিল লফার, 'ও ঠিক কথাই বলেছে। আদালতে দোষ স্বীকার করতে রাজি আছি আমি।'

'তা কেন করবেন?' কিশোর বলল। 'আপনি তো আর ইচ্ছে করে করেননি। প্রাণের ভয় দেখিয়ে আপনাকে করতে বাধ্য করা হয়েছে।'

'সেটা প্রমাণ করতে পারবে না সে,' খিকখিক করে হাসল ব্রাউন। 'তবে জাল চেক দিয়ে যে জিনিস কিনেছে আমি প্রমাণ করতে পারব। কোন্ কোন্ দোকানে চেক ভাঙিয়েছে সে, মনে আছে আমার। ওরা সাক্ষ্য দেবে, চেকগুলো ব্রাউন ওদের দিয়েছে। পুলিশ আমার কিছুই করতে পারবে না। কারণ একটা চেকও আমি নিজের হাতে ভাঙাইনি। মরলে আর সবাই মরবে। আমার কিছুই হবে না।'

খেপা কুকুরের মত দাঁত খিঁচাল বার্ড। ভীষণ রাগে চেঁচিয়ে উঠল, 'শয়তান! বদমাশ! তুমি নিজে ভাল থেকে আমাদের বিপদে ঠেলে দেয়ার ফন্দি করেছিলে! দাঁড়াও, আমিও ছাড়ব না! আমি সাক্ষ্য দেব, লফার নির্দোষ, তুমি জোর করে ওকে দিয়ে বেআইনী কাজ করিয়েছ!'

'গুড,' মাথা দোলালেন সাইমন, 'তাতে তোমার ভালই হবে। শাস্তির পরিমাণ কমবে। কি কি জানো তুমি, বলো তো?'

বার্ড বলল, 'মাস চারেক আগে মরুভূমির ওপর দিয়ে প্লেনে করে ওড়ার সময় দানবীয় নকশাগুলো চোখে পড়ে আমাদের। একটা গুজব কানে এনেছিল ব্রাউনের, কোন একটা টিলার ওপরের একটা দানবের হাত গুপ্তধনের খনির দিকে নির্দেশ করে আছে। এই টিলার ওপরে দানবটা দেখতে পেয়ে সেই কথাই মনে পড়ল তার। আমাকে বলল সে-কথা। দু-জনে মিলে তখন নানা জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ করলাম। তারপর সত্যি সত্যিই পেয়ে গেলাম লুকিয়ে রাখা সোনা।'

'সোনা!' প্রতিধ্বনি করল যেন কিশোর। 'কোথায়? কোন্‌খানে?'

'যে গর্তটা তোমরা দেখেছ একটু আগে। দানবের হাত নয়, একটা পা নির্দেশ করছে গর্তটা।'

'কি ধরনের সোনা?' জানতে চাইলেন সাইমন।

'ইনডিয়ানদের সোনা। জানাজানি হলে খোয়াতে হতে পারে। তাই আমেরিকায় বিক্রি করার সাহস পেলাম না। নিয়ে গেলাম মেকসিকোয়। টাকাটা দু-জনে ভাগ করে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ব্রাউনের মাথায় একটা শয়তানি বুদ্ধি এল। সে বলল, এই টাকা খাটিয়ে আরও অনেক অনেক বেশি টাকা আমরা আয় করতে পারি।'

'বুদ্ধিটা কি?'

'সে বলল, একটা ছাপাখানা করতে পারি আমরা। সেটাতে জাল নোট আর চেক ছাপতে পারি। সারা আমেরিকায় সে-সব ছড়িয়ে দিয়ে কোটি কোটি টাকা আয় করব। রাজি হয়ে গেলাম। ছাপাখানা হল। জাল চেক ছাপা হতে লাগল। প্লেনে করে সেগুলো বর্ডার পার করে এনে এই টিলায় নামানোর ব্যবস্থা হলো। নির্জন জায়গা এটা। রাতে তো দূরের কথা, দিনেও সাধারণত আসে না এখানে লোকে। ঠিক হলো, এখানে এনে জমা করে রাখা হবে চেকগুলো। তারপর ধীরে ধীরে চালান করে দেয়া হবে বিভিন্ন শহরে। বাতিগুলোসহ প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস ওই গর্তে লুকিয়ে রাখতাম

আমরা।'

'বুঝলাম,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কিন্তু লফার এর মধ্যে এলেন কি করে?'

'সেটাও ব্রাউনের আরেকটা কুবুদ্ধি,' ঘৃণায় মুখ বাঁকাল বার্ড। 'তার ওপর যাতে পুলিশের নজর না পড়ে সে-জন্যে একজন সৎ, ভাল মানুষকে সামনে রাখতে চেয়েছিল। ভেবেছিল, ব্যবসায় মার খেয়েছে লফার, এই সুযোগে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাকে দলে টানতে পারবে। পারল না। জোর করে তাকে দিয়ে কাজ করানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই করতে পারল না। পালিয়ে গেল লফার। অনেক কিছু জেনে ফেলেছে ততদিনে সে। সুতরাং তার মুখ বন্ধ করাটা জরুরী। আমাকে পাঠাল রকি বীচে। ব্রাউন ভেবেছিল লফার তার মামার বাড়িতেই গিয়ে উঠেছে। গিয়ে জানলাম তার মামা ডিটেকটিভ ভিকটর সাইমনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে তার ভাগ্নেকে খুঁজে বের করে দেয়ার জন্যে। মোটর সাইকেল নিয়ে মিস্টার স্মিথের পিছে পিছে গেলাম সেখানে। সেখান থেকে স্যালভিজ ইয়ার্ডে।'

'মুসার মাথায় বাড়ি মেরেছিল কে? আপনি?'

গম্ভীর হয়ে বলল বার্ড, 'হ্যাঁ। তাকে বেহুঁশ না করে ছবিগুলো আনা যেত না তার কাছ থেকে। ওঅর্কশপের দরজায় নোটটাও আমি রেখেছি। বললাম যখন, সব কথাই বলি। রকি বীচ থেকে একটা ভাড়া করা প্লেনে তোমাদের অনুসরণ করলাম আমি। স্যান বারনাডিনোতে ওই প্লেনটাই ধাক্কা মারতে যাচ্ছিল তোমাদের। পাইলটটা একটা গাধা। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকে। প্রথমে বুঝতে পারিনি, তাহলে তাকে নিতাম না। আরেকটু হলেই তোমাদেরও মেরেছিল, আমাকেও। যাই হোক, ব্লাইদিতেও লফারের প্লেনে তোমাদের হুমকি দিয়ে নোট আমিই রেখেছিলাম। রাতের বেলা চুরি করে ঢুকেছিলাম হ্যাঙ্গারে।'

'নোট লিখতে গিয়ে তো রীতিমত কাণ্ড করেছেন। একবার আর্টিস্ট, একবার কবি!' রবিন বলল। 'এ সব করতে গেলেন কেন?'

'ভাবলাম, খানিকটা অন্য রকম করে দিলে হুমকির গুরুত্ব বাড়বে।'

'তা বেড়েছে বটে,' স্বীকার করল কিশোর। জানতে চাইল, 'তিন মেকসিকানকে আমাদের পেছনে আপনারাই লাগিয়েছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।' আফসোস করে বলল বার্ড, 'ইস্, সোনাগুলো পাওয়ার পর ব্রাউনের কথা কেন যে শুনলাম! অত লোভ না করে আমার ভাগের টাকাটা নিয়ে নিলেই হত...'

'আচ্ছা, আরেকটা কথা। মরুভূমিতে একটা দামী পাথর কুড়িয়ে পেয়েছি আমরা। ওটা সম্পর্কে কিছু জানেন নাকি?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল বার্ড। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'নাহ্, পাথরের ব্যাপারে কিছু জানি না আমরা। তবে পর্বতের ওদিকে পাথর খুঁজতে যায় অনেকে। নিয়ে আসার সময় হয়তো ওদেরই কারও কাছ

থেকে কোনভাবে পড়ে গেছে ওটা।'

'হুঁ,' বিড়বিড় করল কিশোর, 'তাই হবে!'

পুলিশ নিয়ে মুসাদের ফিরতে অনেক সময় লাগল।

বন্দিদের নিয়ে চলে গেল পুলিশ। তাদের সঙ্গে গেলেন সাইমন। লফারও গেল। সমস্যা মিটে যেতেই বাড়ি যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।

কেবিনে ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা। সঙ্গে ওয়ারনার বল।

রাত আর বেশি বাকি নেই।

মৃত্যুঘড়ি

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬

ইয়ার্ডের গেট দিয়ে বেরোতে যাবে এই সময় কিশোরের সামনে এসে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। লম্বা, বেশ ভালো স্বাস্থ্য। রিমলেস চশমার ভেতর দিয়ে তাকালেন ওর দিকে।

বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। তাই ঘুরতে বেরোচ্ছিল তিন গোয়েন্দা। সঙ্গে ওদের বন্ধু টমাস মার্টিন। পাহাড়ের দিকটায় ঘুরতে যাওয়ার ইচ্ছে।

'তুমি নিশ্চয় কিশোর পাশা?' হাত বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক। 'আমি অ্যালেক্স ককার। ব্যাংকে কাজ করি। মিস্টার ভিকটর সাইমন তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। কথা বলার সময় হবে?'

'হবে, আসুন।'

অ্যালেক্স ককারডেনাল কিশোর। বে? 'ছ ককারকে এনে ওঅর্কশপে বসাল কিশোর।

কোন রকম ভূমিকার মধ্যে গেলেন না তিনি। বললেন, 'একটা বিশেষ কাজে এসেছি। মিস্টার সাইমনের কাছে গিয়েছিলাম। তাঁর সময় নেই। বললেন, তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারবে।'

'বলুন কি করতে পারি?'

'পোশাক দেখে তো মনে হচ্ছে ঘুরতে যাচ্ছ।' কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ককার বললেন, 'এক কাজ করতে পারো, ম্যানিলা রোডের দিকে চলে যাও। বন্দর পেরিয়ে গিয়ে মোড় নিলেই ম্যানিলা রিভার। নদীর কিনার ধরে বনের মধ্যে ঢুকে যেয়ো।'

'কেন?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল কিশোর।

'রিভেরা হাউসটা পেয়ে যাবে। অনেক পুরানো বাড়ি। নাম শুনেছ?'

'শুনেছি,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'পাথরে তৈরি। টালির ছাত। মেইন রোড থেকে অনেকখানি ভেতরে। বহুদিন ধরে ওখানে কেউ বাস করে না।'

'কার কাছে শুনলে?'

'বাবার কাছে। আমার বাবা সাংবাদিক।'

'ও। ঘুরতে গেলে ওদিকটায় একবার ঘুরে এসো।'

'কেন?' আবার প্রশ্ন করল কিশোর।

'একটা রহস্য দিতে পারব। আগে দেখে এসো। তারপর কথা। এখন যাই। পরে আসব আবার।'

ওদেরকে একটা ধাঁধার মধ্যে রেখে বেরিয়ে গেলেন ককার। গেটের

বাইরে গাড়ি রেখেছেন। তাতে চেপে চলে গেলেন।

গোয়েন্দারাও রওনা হলো আবার। বন্দর পার হয়ে এসে কিছুদূর এগোতে ম্যানিলা রিভারের ওপরের ব্রিজটা চোখে পড়ল। মোড় নিয়ে দ্রুত এগোল সেদিকে। নদীর ধার ধরে এগোতে এগোতে আইভি লতায় ছাওয়া পাথরের দেয়াল চোখে পড়ল। ঘন হয়ে জন্মানো ছোট ছোট গাছপালা প্রায় আড়াল করে রেখেছে দেয়ালটা। ফাঁক দিয়ে একআধটু চোখে পড়ে ছাতের টালি।

'ওটাই রিভেরা হাউস,' রবিন বলল।

'যদ্দূর জানি, বাড়ির মালিক বুড়ো রিভেরা মারা যাওয়ার পর আর কেউ বাস করতে আসেনি,' টম বলল। 'বুড়ো নাকি আজব লোক ছিল।'

থমকে দাঁড়াল মুসা। 'আজব মানে? মরেটরে ভূত হয়নি তো আবার!'

'আরে দূর!' হাত নেড়ে মুসার কথাকে উড়িয়ে দিল কিশোর। 'চলো, ঢুকে দেখি কি আছে? কেন আসতে বললেন ককার, জানতে হবে।'

মিনমিন করে আরেকবার আপত্তি জানাল মুসা। কিন্তু তিনজনের চাপে আপত্তি টিকল না তার।

মেইন গেটটা খোলা। অবাক লাগল ওদের। আরও অবাক হলো, যখন ড্রাইভওয়েতে গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পেল।

সামনের বিশাল ধূসর অট্টালিকাটার দিকে তাকিয়ে সাবধানে ড্রাইভওয়ে ধরে এগোল চারজনে। দুই ধারে ঘন হয়ে জন্মেছে গাছ আর ঝোপঝাড়। নীরবতার মধ্যে হঠাৎ শোনা গেল ভারি গলায় ডাক, 'অ্যাই, দাঁড়াও!'

পুলিশের পোশাক পরা এক লোক বেরিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে। মাথার হেলমেট বলে দিল মোটর সাইকেল নিয়ে এসেছে, মোটর সাইকেল পেট্রলম্যান। চেনে ওকে ছেলেরা। রকি বীচ থানার অফিসার, মরিস ডুবয়।

'কি ব্যাপার, ডুবয়, আপনি এখানে?' জানতে চাইল রবিন।

'চোর তাড়া করে এসেছি। বন্দরে ইদানীং বড় বেশি চোরের উৎপাত হচ্ছে। ম্যানিলা রোড ধরে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি কালো রঙের বিরাট একটা লিমুজিন গাড়ি ছুটে আসছে। গতি না কমিয়ে এত জোরে মোড় ঘুরল, সন্দেহ হলো আমার। পিছু নিলাম।'

'ধরতে পারেননি?'

'না, পালাল।'

ওদের সঙ্গে এগোল অফিসার ডুবয়। বাড়ির সদর দরজার সামনে মোটর সাইকেলটা রাখা। তাতে চেপে স্টার্ট দিল। বিকট গর্জন করে উঠল শক্তিশালী ইঞ্জিন। ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি ভেবে এখানে?'

'ঘুরতে,' জবাব দিল কিশোর।

'কেস?' হাসল অফিসার।

'হতে পারে। এখনও জানি না। ফিরে গেলে বোঝা যাবে। বাড়িটা সম্পর্কে কিছু জানেন নাকি?'

ক্লাচ চেপে গিয়ার দিল ডুবয়। 'তেমন কিছু না। অনেক দিন থেকে খালি পড়ে আছে, ব্যস, এটুকুই। গেটটা খোলা পেয়ে অবাকই লাগল। মনে হলো

এ বাড়িতেই ঢুকে পড়ল কালো গাড়িটা। তবে কোথাও দেখতে পেলাম না। চোখের ভুল ছিল বোধহয়। চলি।'

'যান। গেট আমরা বন্ধ করে দিয়ে যাব।'

ক্লাচ ছাড়তেই লাফ দিয়ে আগে বাড়ল মোটর বাইক। বেরিয়ে গেল ডুবয়। ধীরে ধীরে কমে গেল ইঞ্জিনের শব্দ। স্তব্ধ নীরবতা যেন গ্রাস করল ছেলেদের।

দুই

পরিত্যক্ত বাড়ির ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে টম বলল, 'বাড়িটার কিন্তু কোন বদনাম শুনিনি কখনও!' আড়চোখে মুসার দিকে তাকাল সে। 'কক্ষনো কেউ বলেনি এখানে ভূতের উপদ্রব আছে!'

মুসাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি কিশোর বলল, 'এসো, ঘুরে দেখি। ককারের কথায় মনে হলো অদ্ভুত কিছু ঘটছে এখানে। রবিন, তুমি আর টম দরজা-জানালাগুলো দেখো; বন্ধ, নাকি খোলা। আমি আর মুসা চারপাশটা দেখব।'

আলাদা হয়ে গেল ওরা। বিশাল বাড়িটার পেছনে চলে এল কিশোর আর মুসা।

নিচের দিকে চোখ পড়তে আচমকা থেমে গেল কিশোর। 'মুসা, দেখো!'

'কি?' ঘন হয়ে জন্মানো ঘাসের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেল না মুসা।

লম্বা ঘাসের ডগা সরিয়ে মাটি দেখাল কিশোর। 'এইবার দেখেছ? পায়ের ছাপ। কাল রাতে এসেছিল এখানে কেউ। হেঁটেছিল। দেখছ না, ঘাসের ডগা ভাঙা? শিশির পড়ে মাটি ভিজে নরম হয়ে গিয়েছিল তখন।'

'খাইছে, কিশোর, তোমার ওগুলো চোখ না, এক্স-রে মেশিন!'

মুসার কথার জবাব না দিয়ে পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগোতে শুরু করল কিশোর। চত্বর পেরিয়ে চলে এল ঘন গাছের জটলার দিকে। নদীর দিকে চলে গেছে পায়ে চলা পথ। পায়ের ছাপ সেদিকেই গেছে।

'মাছ ধরতে এসেছিল বোধহয় কেউ,' অনুমান করল মুসা

'কি জানি!' কথাটা ঠিক মেনে নিতে পারল না কিশোর।

ঘুরতে ঘুরতে এসে একখানে মিলিত হলো আবার চারজনে

'কিছু পেলে?' রবিনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ। সামনের দরজার তালায় আঁচড়ের দাগ দেখলাম। অন্ধকারে কেউ খোলার চেষ্টা করেছিল মনে হয়।'

পায়ের ছাপের কথা জানাল কিশোর। মাথা নেড়ে বলল, 'তেমন কিছু পেলাম না। এতে বোধহয় সন্তুষ্ট করা যাবে না মিস্টার ককারকে।'

'আর কি দেখাতে চেয়েছিলেন তিনি?' টমের প্রশ্ন।

'বুড়ো রিভিয়েরার ভূত,' হেসে বলল টম।

'দূর, ওসব অলক্ষুণে কথা বোলো না তো!' হাত নেড়ে বলল মুসা। 'আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। খিদেয় পা কাঁপছে।'

হেসে ফেলল সবাই।

পাথরের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আনমনে বিড়বিড় করল রবিন, 'এতবড় বাড়ি, এত পুরানো, খালি পড়ে আছে ভাবতে পারছি না। এই মুহূর্তে ভেতর থেকে কেউ গোপনে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে জানলেও অবাক হব না।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো কিশোর। 'পায়ের ছাপ আর তালায় আঁচড়ের দাগকে উড়িয়ে দিতে পারছি না। নিশ্চয় কোন মানে আছে এ সবের। ককারকে বলব। দেখি, কি বলেন।'

মাথার ওপরের শূন্য, কালো জানালাটার দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি দেখা দিল মুসার চোখে। 'দেখো, এ সব শুনতে একটুও ভাল লাগছে না আমার! আমি গেলাম!'

গেটের দিকে হাঁটা দিল সে। হেসে তার পিছু নিল টম আর রবিন। কিশোরও চলল, তবে সে চিন্তিত। হাসিতে যোগ দিতে পারছে না। নিশ্চিত হয়ে গেছে, কোন রহস্য আছে বাড়িটার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখন ককারের সঙ্গে কথা বলতে চায়। বাড়ি ফিরেই যোগাযোগ করতে হবে।

বাইরে এসে গেটটা লাগিয়ে দিল সে। চাবি নেই, তালা দিতে পারল না।

ম্যানিলা রোডে ফিরে এল ওরা। ঝলমলে উজ্জ্বল রোদ।

'ওরকম একটা পোড়ো বাড়ির প্রতি আগ্রহী হলেন কেন ককারের মত একজন ব্যাংকার?' রবিনের মাথা থেকেও ভাবনাটা যাচ্ছে না।

'বাবারে, ওসব কথা বাদ দাও না এখন!' বাধা দিল মুসা। 'খাওয়ার জন্যে বসার জায়গা দেখো।'

খোঁচা দিল টম, 'খাওয়ার পর ঘুমের জায়গা লাগবে না?'

'দেখো, ইয়ার্কি মেরো না। খাওয়া ছাড়া কেউ বাঁচতে পেরেছে? ঘুম ছাড়া কারও শরীরের ক্ষয় পূরণ হয়েছে?'

'তা হয়নি। তবে তোমার পূরণটা আজকাল একটু বেশিই হচ্ছে। বয়েসের তুলনায় দৈত্য।'

জবাব দিল না মুসা। চারপাশে তাকিয়ে জায়গা খুঁজতে শুরু করেছে তার চোখ। রিভেরা এস্টেট পেছনে ফেলে এসেছে। ডানে উঠে গেছে ঘন বনে ছাওয়া পাহাড়ের ঢাল। বাঁয়ে গমের খেত, শস্য কাটার পর খড়গুলো এখন রোদে শুকিয়ে বাদামী হয়ে গেছে। খেতের প্রান্তে বিশাল এক ওক গাছ ডালপালা ছড়িয়ে ছায়া ফেলেছে, লোভ দেখাচ্ছে যেন ওদের।

'জায়গা পাওয়া গেছে,' হাত তুলে দেখাল মুসা। 'প্রথমে খাওয়া, তারপর ঘুম।'

মাথা নাড়ল টম, 'ওখানে হবে না।'

'কেন?' ভুরু কোঁচকাল মুসা।

'পানি নেই।'

তাই তো! সুতরাং পানির জন্যে আরও আধঘণ্টা হাঁটতে হলো ওদের। পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্নাটা চোখে পড়ল মুসার। সবুজ তৃণভূমির মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে টলটলে পানির নহর।

'আহ্, দারুণ!'

'দারুণ তো বুঝলাম,' রবিন বলল, 'বসবে কোথায়? ছায়ার তো চিহ্নও নেই এখানে।'

'দূর! খালি বাগড়া দেয়!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। কিন্তু ছায়া না থাকলে যে বসা যাবে না, মনে মনে এ কথাটা সে-ও স্বীকার করল।

আবার হাঁটতে হলো। দুই ধারে চেপে আসতে শুরু করল বন। ছোট একটা খাঁড়ির ধার দিয়ে গেছে পথ। ওপর থেকে গর্তে ঝরে পড়ছে ঝর্না।

খুশি হলো মুসা। বসার এত চমৎকার জায়গা আর পাওয়া যাবে না। গাছের ছায়া আছে, রোদ আছে, পানিও আছে। আর কি চাই!

বসে পড়ল ওরা। ব্যাগ খুলে ডিম আর মুরগীর মাংসের পুর দেয়া স্যাণ্ডউইচ বের করল মুসা। আর আছে আপেলের জেলি, চকোলেট কেক এবং ফ্লাস্ক ভর্তি বরফ মেশানো দুধ।

খাওয়ার জন্যে মুসাই তাগাদা দিয়েছে বেশি। কিন্তু খেতে বসে আবিষ্কার করল অন্য তিনজন, ওদেরও খিদে পেয়েছে ভীষণ। দেখতে দেখতে সাবাড় করে ফেলল সমস্ত খাবার। ঝর্না থেকে পানি খেয়ে এসে গাছের ছায়ায় যার যে ভাবে ইচ্ছে শুয়ে পড়ল।

চিত হয়ে শুয়ে আকাশ দেখছে কিশোর। গাছের ডালে শিস দিচ্ছে একটা নাম না জানা পাখি। আরেকটা ছোট আকারের সবুজ পাখি ডাল থেকে মাঝে মাঝেই শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে পোকা শিকার করছে। ফড়িং উড়ছে নানা রঙের।

আহ্, এই তো জীবন! আবেশে চোখ মুদে এল তার।

তিন

ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেল ওদের।

রকি বীচে ফিরে মুসা আর টম চলে গেল বেসবল প্র্যাকটিস করতে। রবিন আর কিশোর ইয়ার্ডে ফিরে এল।

মেরিচাচী জানালেন, মিস্টার ককার এসে বসে আছেন অনেকক্ষণ।

রবিন আর কিশোর বসার ঘরে ঢুকে দেখল অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন তিনি। সাড়া পেয়ে ফিরে তাকালেন। এবারও কোন ভূমিকা না করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি দেখে এলে?'

কিশোর বলল, 'গিয়ে দেখি গেট খোলা। চোর তাড়া করে ভেতরে

ঢুকেছে একজন পুলিশ অফিসার। সে বেরিয়ে যাওয়ার পর পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছি···'

'পায়ের ছাপ!' বাধা দিলেন ককার, 'কখন এসেছিল লোকটা?'

'রাতে কোন সময়, শিশির পড়ার পর।'

'কিন্তু গেট! কাল রাতে বেরোনোর সময় নিজের হাতে তালা লাগিয়েছি আমি!'

যেন বিদ্যুতের শক খেয়ে ঝট করে সোজা হয়ে বসল দুই গোয়েন্দা।

'আপনি লাগিয়েছেন?' প্রশ্ন করল অবাক রবিন।

'হ্যাঁ। কারণ বাড়িটার মালিক এখন আমি।'

'আপনি!' আরও অবাক হলো রবিন।

'হ্যাঁ। কাল অন্ধকার হওয়ার আগ পর্যন্ত ওখানে ছিলাম আমি। তোমাদের কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে, আরও কেউ ছিল ওখানে। কিংবা আমি আসার পর ঢুকেছিল। আমার ওপর হামলা চালানোর জন্যেও হতে পারে।'

'মিস্টার ককার,' হাত তুলল কিশোর, 'আশা করি আমাদের ওপর আপনার বিশ্বাস জন্মেছে?'

ভুরু কোঁচকালেন ককার। 'অবিশ্বাস করেছি কি করে বুঝলে?'

'এটুকু না বুঝলে আর এতদিন গোয়েন্দাগিরি করতে পারতাম না, এত কেসের সমাধান করতে পারতাম না। আপনি আসলে ভিক্টর সাইমনের কথা বিশ্বাস করে আমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারেননি। সে-জন্যে সকালে সব কথা না বলে শুধু বাড়িটা দেখে আসার কথা বলেছেন। বুঝতে চেয়েছেন, আমাদের দিয়ে আপনার কাজ হবে কিনা। পরীক্ষা তো করলেন, কি মনে হলো, হবে?'

মাথা ঝাঁকালেন ককার, 'হবে।'

'তাহলে আর অন্ধকারে না রেখে সব খুলে বলুন।'

সোফায় নড়েচড়ে আরাম করে বসলেন ককার। বললেন, 'খামখেয়ালী লোক ছিলেন ফ্র্যান্সিস রিভেরা, হয়তো জানো। রকি বীচ লাইব্রেরিকে দান করে গেছেন তাঁর এস্টেট। লাইব্রেরির কাছ থেকে কিছুদিন আগে বাড়িটা কিনেছি আমি। কিছু মেরামত-টেরামত করিয়ে নিয়ে পরে বেশি দামে বিক্রি করে লাভ করার আশায়। কেনার পর বাড়িটা ভাল করে দেখতে গিয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করলাম।'

সামনে গলা বাড়িয়ে দিল রবিন, 'কি?'

'তিনতলায় একটা গুপ্তঘর। বিল্ডিঙটার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় তৈরি হয়েছে ওটা। রীতিমত একটা ব্যাংকের ভল্ট যেন। অগ্নিনিরোধক, কোন জানালা নেই। গোপন ভেন্টিলেটরের সাহায্যে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা। একমাত্র দরজার পাল্লাটা তৈরি হয়েছে খুব ভারি করে ইস্পাত দিয়ে। বন্ধ করার জন্যে টাইম লক লাগানো আছে।'

'ওরকম একটা ঘর কি কাজে লাগত রিভেরার?'

'খামখেয়ালী, বললামই তো, মাথায় ছিট,' মৃদু হাসলেন ব্যাংকার।

'ব্যাংককে বিশ্বাস করে না, এ রকম বহু লোক আছে, তিনিও তাদের একজন। দামী জিনিসপত্র ওই গুপ্তঘরে রাখতেন। নিজেকে লুকিয়ে রাখার জায়গা হিসেবেও ব্যবহার করতেন ঘরটাকে। দামী জিনিস লুকানো আছে কিনা দেখার জন্যে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি আমি ওখানে, পাইনি। রিভেরার এক বিশ্বস্ত চাকর সমস্ত জিনিস তুলে দিয়েছে লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের হাতে।

'তা দিক, আমার মাথাব্যথা নেই। আমি কেবল বাড়িটা কিনেছি। তা-ও বসবাসের জন্যে নয়, ব্যবসা করার জন্যে। তবে গুপ্তঘরটা খুব পছন্দ হয়েছে আমার। রিভেরার মতই ওখানে গিয়ে মাঝে মাঝে নিজেকে লুকিয়ে ফেলি। নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে কাজ করার এত চমৎকার জায়গা আর হয় না। নিজের ব্যক্তিগত অফিস বানিয়েছি ঘরটাকে।

'জটিল হিসেব-নিকেশের কাজ করতে হলে এখন ওখানে গিয়ে ঢুকি আমি। ছোট একটা টেবিল, একটা কম্পিউটার আর কিছু ফাইলপত্র রেখে দিয়েছি। ঘর থেকে বেরোনোর সময় টাইম লক সেট করে দিই। তারপর আর কেউই, এমনকি আমিও নির্দিষ্ট সময়ের আগে আর ঢুকতে পারি না। ঠিক যতটায় সময় সেট করা থাকে কাঁটায় কাঁটায় ততটায় খোলে তালাটা, তার আগে কিছুতেই নয়।'

'জানি,' এতক্ষণে কথা বলল কিশোর, 'টাইম লকের এটাই বিশেষত্ব। নির্দিষ্ট সময়ে তালা খুলে যাওয়ার আগে কেউ ঢুকতে পারে না।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন ব্যাংকার। 'কিন্তু আমি যদি বলি আমার অনুপস্থিতিতে কেউ ওঘরে ঢুকেছিল, একবার নয়, একাধিকবার, তাহলে?'

'তালাটা নষ্ট না তো?' রবিনের প্রশ্ন।

'মোটেও না। একদম ঠিক। ভালমত পরীক্ষা করে দেখেছি আমি।'

'তারমানে আপনি চাইছেন,' কিশোর বলল, 'ঘরটার তদন্ত করি আমরা? কি করে কে ঢুকল, বের করি?'

মাথা ঝাঁকালেন ককার। 'হ্যাঁ। যখন-তখন ওবাড়ির যে কোন ঘরে ঢোকার জন্যে তোমাদের ডুপ্লিকেট চাবি বানিয়ে দেব...' বলবেন কি বলবেন না, দ্বিধা করতে করতে বলেই ফেললেন, 'আরেকটা ব্যাপার, কতখানি গুরুত্ব দেব বুঝতে পারছি না...আমার প্রাণ নাশের হুমকিও দিতে আরম্ভ করেছে!'

'কোথায়? কখন?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

গম্ভীর মুখে মানিব্যাগ থেকে ভাঁজ করে রাখা দুই টুকরো কাগজ বের করলেন ককার। একটা দিলেন রবিনকে, আরেকটা কিশোরকে।

রবিন আগে খুলল। পেন্সিলে লেখা রয়েছে:

চিরকালের জন্যে এই বাড়ি ছাড়ো,
নইলে কপালে মরণ আছে।

অন্য কাগজটা পড়ল কিশোর:

ঘড়ি যখন টিক টিক করবে,
তখন আসবে মরণ!

মুখ তুলে তাকাল সে, 'কি বলতে চায়?'

'সেটা জানার জন্যেই ভাল গোয়েন্দা দরকার আমার,' ককার বললেন। 'কাগজগুলো কোথায় পেয়েছি আন্দাজ করতে পারো?'

'গুপ্তঘরে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর।

অবাক হয়ে গেলেন ককার, 'কি করে বুঝলে?'

'স্রেফ অনুমান। ওখানে পেয়েছেন বলেই এতটা উদ্বিগ্ন হয়েছেন। তা ছাড়া বললেনই তো, আপনার অবর্তমানে লোক ঢুকেছে ওঘরে।'

'কখন পেয়েছেন এগুলো?' জানতে চাইল রবিন।

'তোমার হাতেরটা চারদিন আগে। আর অন্যটা কাল রাত আটটায়। সে-জন্যেই এসেছিলাম আজ সকালে,' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ব্যাংকারের চেহারা। 'বললে কাল রাতে ওবাড়িতে ঢুকেছিল কেউ, তারমানে আমাকে খুন করতে এসেছিল!'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'হুঁ, যে লিখেছে সে সব জানে—আপনি কখন থাকেন না থাকেন। প্রতিশোধ নিতে চায় এমন কোন শত্রু আছে আপনার?'

'যদ্দূর জানি, নেই। শত্রু তৈরি হয় এমন কোন কাজ করি না আমি।'

আগের প্রসঙ্গে এল রবিন, 'মিস্টার ককার, ঘরে ঢোকার অন্য কোন পথ নেই তো? দেয়ালগুলো ভালমত দেখেছেন?'

'দেখেছি। কিছুই নেই। আমার জিনিসপত্র আর একটা ফায়ারপ্লেস বাদে ঘরে অন্য কোন জিনিসও নেই। চিমনির মুখে শিক লাগানো। তা ছাড়া চিমনির নলটা এত সরু, মানুষ ঢুকতে পারবে না।'

'কাগজ তো ফেলতে পারে?'

মাথা নাড়লেন ককার। 'তা পারে। তাহলে পাওয়া যেত চিমনির তলায়। কিন্তু পেয়েছি ঘরের মাঝখানে, কার্পেটের ওপর।'

'আপনি ছাড়া ঘরটার কথা আর কে জানে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'তালাটা খুলতে জানে আর কেউ?'

'ঘরটার কথাই কাউকে বলিনি। সুতরাং তালার কথা জানার প্রশ্নই ওঠে না। রিভেরার চাকরও নেই যে সে বলে দেবে।'

'হুঁ। আমরা আপনাকে সাহায্য করব। একটা কাজ করলে কি অসুবিধে হবে—আমরা আপনাকে ঢুকতে না বলা পর্যন্ত ওবাড়ি থেকে দূরে থাকতে পারবেন?'

'পারব। ঠিক আছে, আজ উঠি। চাবি তৈরি হয়ে গেলে তোমাদের জানাব।'

ককার বেরিয়ে যাওয়ার পর ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল দুই গোয়েন্দা।

রবিন বলল, 'আজব কাণ্ড! টাইম লক লাগানো থাকলে দরজা খোলা অসম্ভব। ঢুকল কোন পথে? নিশ্চয় অন্য কোন পথ আছে।'

'আজ রাতেই দেখতে যাব রিভেরা হাউসে। তুমি বাড়িতে ফোন করে দাও। বলো ফিরতে দেরি হবে।'

চার

অন্ধকার নামলে বেরিয়ে পড়ল দু'জনে। রবিনের ফোক্স ওয়াগেন গাড়িটা নিল। মুসাদের বাড়িতে পার্টি হচ্ছে। সে যেতে পারল না। পার্টিতে ওদের যেতে বলেছিল সে, কেন যাওয়া হবে না খুলে বলেছে কিশোর। আর কিছু বলেনি মুসা। চাপাচাপি করেনি। জানে, কিশোরের কাছে কেসের তদন্ত সবার আগে, সেটা বাদ দিয়ে দাওয়াত খেতে যাবে না।

রিভেরা হাউস থেকে বেশ কিছুটা দূরে গাড়ি রাখল রবিন। বাকি পথ হেঁটে যাবে ওরা। ভেতরে কেউ থেকে থাকলে ইঞ্জিনের শব্দে যাতে সতর্ক হতে না পারে।

হেঁটে এগোল ওরা।

বিশাল গেটটা খোলা। আকাশে মেঘ করেছে। ঢাকা পড়েছে চাঁদ। বাতাস গরম, আঠা আঠা।

থমকে দাঁড়াল কিশোর। 'সকাল বেলা আমি লাগিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর কেউ ঢুকেছে। হয়তো আছে এখনও।'

'ড্রাইভওয়েের দিকে নজর রাখতে পারে। অন্য কোনখান দিয়ে ঢোকা উচিত।'

দেয়ালের ধার ধরে ঘুরে একটা ঘন জংলা জায়গায় চলে এল ওরা।

শক্ত একটা লতা ধরে টান দিয়ে কতটা শক্ত দেখতে দেখতে রবিন বলল, 'টপকানো কঠিন হবে না। বেয়ে উঠে যাওয়া যাবে।'

নিরাশ করল তাকে কিশোর। 'দেয়ালের ওপর ভাঙা কাঁচ বসানো। সকালে দেখেছি। সহজে ঢোকার ব্যবস্থা রাখেননি ফ্র্যান্সিস রিভেরা।'

'তাহলে?'

'খুঁজতে হবে।'

দেয়ালের ধার ঘেঁষে বড় গাছ তেমন নেই। খুঁজে খুঁজে অবশেষে পাওয়া গেল একটা। তার একটা ডাল দেয়ালের ওপর দিয়ে চলে গেছে অন্যপাশে, বাড়ির ভেতরে।

গাছে উঠে ডাল বেয়ে কাঁচ এড়িয়ে অন্যপাশে চলে আসতে পারল দু'জনে। ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। মাটি বেশি নিচে না। হাত ছেড়ে দিতে নিরাপদেই নামল মাটিতে।

বিদ্যুৎ চমকাল। গুড়ুগুড়ু শব্দ হলো আকাশে। গুড়ি মেরে বাড়ির সামনের খোলা জায়গায় চলে এল ওরা।

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। বিকট শব্দে বাজ পড়ল। গাছের পাতায় প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে বয়ে গেল এক ঝলক ঝোড়ো হাওয়া। ঝড় আসতে দেরি নেই।

খপ করে রবিনের হাত চেপে ধরল কিশোর। 'শুনছ! দৌড়ানোর শব্দ!'

কান খাড়া করে রইল দু'জনে। বাতাস, বজ্রপাত, গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দের মাঝেও পায়ের শব্দ কানে আসতে লাগল ওদের। ডালে পা পড়ে মট করে ভাঙল, জুতোতে ঠোকা লেগে গড়িয়ে সরে গেল একটা পাথর, শুনতে পেল ওরা।

বিদ্যুতের আলোয় লম্বা একজন মানুষকে বারান্দার দিকে ছুটে যেতে দেখা গেল। বারান্দায় উঠে সামান্য নুয়ে দরজার তালায় চাবি ঢোকাল খোলার জন্যে।

'ককার!' ফিসফিস করে বলল রবিন।

'তুমি শিওর! তাঁকে তো আসতে মানা করেছিলাম!'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল লোকটা।

বৃষ্টির বেগ বেড়েছে। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে আছে দুই গোয়েন্দা, আলো জ্বলার অপেক্ষায়।

কিন্তু জ্বলল না।

'ককার হলে আলো জ্বালছেন না কেন?' অধৈর্য স্বরে বিড়বিড় করল রবিন। 'কারও দেখে ফেলার ভয়ে? বাড়িটা যদি তাঁরই হয়, ভয় কিসের?'

'হয়তো ককার নয়।'

'তাঁর মতই তো লাগল। একই রকম শরীর-স্বাস্থ্য। গাড়ির শব্দ কিন্তু শুনলাম না। তারমানে আমরা আসার আগেই ঢুকেছেন।'

'গুপ্তঘরে চলে গেছেন হয়তো!'

'কিংবা তাঁর কিছু হয়েছে! হুমকি দিয়ে নোট লিখেছে যে লোক, সে হয়তো ঘাপটি মেরে ছিল ভেতরে, তাঁরই অপেক্ষায়।'

'চলো, দেখি।'

দরজার দিকে দৌড় দিল দু'জনে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। 'দাঁড়াও! লোকটা ককার না-ও হতে পারে। অন্য কেউ হতে পারে। ঢোকার সময় লোকটাকে মোটেও অস্থির মনে হয়নি। অথচ ককার যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, খুব নার্ভাস মনে হয়েছে তাঁকে। দাঁড়াও, দেখি আর কিছুক্ষণ।'

ঝোপের ধারে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল দু'জনে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। বিদ্যুতের আলোয় লাগছে রূপালী চাদরের মত।

রবিন বলল, 'আবার পায়ের শব্দ শুনলাম মনে হলো!'

কান পেতে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা বড় ঘরের জানালায় আলো জ্বলতে দেখল ওরা।

'এসো, দেখব,' উঠে দাঁড়াল কিশোর।

মাথা নিচু করে একছুটে সামনের খোলা জায়গাটুকু পেরোল ওরা। মাথায় আর পিঠে আঘাত হানছে বড় বড় ফোঁটা। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে।

জানালার কাছে পৌঁছে গেল দু'জনে। এখানে গায়ে বৃষ্টি লাগে না। ঘর থেকে কেউ দেখতেও পাবে না ওদের। আরেকটা ছোট জানালার কাছে সরে

এল।

জানালাটা অনেক ওপরে। দুই হাতের আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে পেটের ওপর রেখে মইয়ের ধাপ তৈরি করল কিশোর। তাতে পা রেখে উঠে দাঁড়াল রবিন। জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল।

'কি দেখছ?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'একটা লিভিং রুম। কাপড়ে মোড়া আসবাব, প্যানেল করা দেয়াল, ঝাড়বাতি। মানুষ নেই।'

'তাহলে আলো জ্বালল কে?'

'সুইচ হয়তো অন করাই ছিল। কারেন্ট চলে গিয়েছিল। আবার এসেছে। আপনাআপনি জ্বলেছে আলোটা।'

'আর কি আছে?'

'ভারি দরজা। এককোণে অনেক বড় একটা ঘড়ি, গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক। সামনের দিকে পুরোটা কাঁচে ঢাকা। পিতলের বিরাট পেণ্ডুলাম। এখান থেকেও টিক টিক শুনতে পাচ্ছি।'

'টিক টিক?' রবিনের ভারে আস্তে আস্তে সামনের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে কিশোর। 'খালি বাড়িতে ঘড়ি চলছে!'

রবিনেরও মনে পড়ে গেল নোটটার কথা:

ঘড়ি যখন টিক টিক করবে,
তখন আসবে মরণ!

'তুমি নামো, আমি দেখি,' কিশোর বলল।

লাফ দিয়ে নামল রবিন।

একই ভাবে তার হাতে ভর দিয়ে উঠে গেল কিশোর।

'কে চালাল ঘড়িটা?' দেখতে দেখতে বলল সে। নিজের হাতঘড়ির সঙ্গে সময় মিলিয়ে নিল। 'একেবারে সঠিক সময়।'

দপ করে ঘরের আলো নিভে গেল। আবার ঢেকে গেল অন্ধকারে। ঠিক একই সময়ে ঝিলিক দিয়ে উঠল তীব্র আলো। বজ্রপাতের বিকট শব্দ হলো।

পরক্ষণে শোনা গেল রক্ত-হিম-করা তীক্ষ্ণ চিৎকার।

পাঁচ

চিৎকার থামতেই কাঠের বারান্দায় শোনা গেল পদশব্দ। পলকের জন্যে দেখা গেল একটা ছায়ামূর্তিকে। লাফ দিয়ে বাগানে নেমে লাফাতে লাফাতে চলে গেল ড্রাইভওয়ের দিকে।

'ধরো! ধরো!' বলে চিৎকার দিয়েই পিছু নিল কিশোর।

সে ড্রাইভওয়েতে ওঠার আগেই গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল মূর্তিটা। তার জুতোর শব্দ কানে আসছে।

কিশোরকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে রবিন। লোকটাকে দেখতে পেল আবার। গতি বাড়াল সে।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সামনের লোকটা। ছুটতে পারছে না আর তেমন। ধরে ফেলল রবিন।

আবার বিদ্যুৎ চমকাল।

ভীত-সন্ত্রস্ত, পরিচিত মুখটা দেখে বিস্ময়ের সীমা রইল না ওদের।

এ কি! ডুডলি হ্যারিস! মস্ত ধনী। দামী ছবি আর শিল্পকর্ম সংগ্রহের বাতিক আছে। পাগলাটে স্বভাবের জন্যে রকি বীচে অনেকেই চেনে তাঁকে। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে ভাল খাতির। এই লোক এখানে কি করছে?

রবিন আর কিশোরকে চিনতে পারলেন তিনিও। স্বস্তিতে ঢিল করে দিলেন শরীর। 'তোমরা!'

'আপনি এখানে কি করছেন, মিস্টার হ্যারিস?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হ্যারিস বললেন, 'কিশোর, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো, প্লীজ!' থরথর করে কেঁপে উঠলেন তিনি। পরিশ্রম, উত্তেজনা এবং এই বৃষ্টিতে ভেজা সইতে পারছেন না আর বুড়ো শরীরে। 'উফ, কি সাংঘাতিক···কি জঘন্য চিৎকার···'

ধরে ধরে তাঁকে নিয়ে চলল কিশোর আর রবিন।

গাড়িটা কোথায়, দেখিয়ে দিলেন হ্যারিস। ম্যানিলা রিভার রোডের ধারে একটা বড় ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছেন। পুরানো মডেলের বিরাট গাড়ি। কাঁপা হাতে দরজা খোলার চেষ্টা করলেন।

বাধা দিল কিশোর, 'মিস্টার হ্যারিস, কি হয়েছে না বলেই চলে যাবেন? বললে হয়তো কিছু করতে পারতাম।'

অসাধু কোন কিছুতে জড়িত নন হ্যারিস, এ ব্যাপারে নিশ্চিত সে।

কিন্তু প্রলাপের মত বকেই চললেন তিনি, 'কি সাংঘাতিক···বাপরে বাপ···আসা একেবারেই উচিত হয়নি আমার···বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভুল করেছি···আসলে পান্নাগুলো চুরি হয়ে গেল তো···'

কিশোরের দিকে ঝুঁকে নিচু স্বরে বলল রবিন, 'নিশ্চয় তাঁর পান্নার জিনিসগুলোর কিছু হয়েছে। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে বলার মত অবস্থাই নেই তাঁর।'

'গাড়ি চালাতে পারবেন কিনা তাতেও সন্দেহ আছে।'

'চিৎকার কে করেছে সেটাও কিন্তু জানা হয়নি,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'মিস্টার ককার এখনও বাড়ির ভেতরে।'

'আমি যাচ্ছি দেখতে। এক কাজ করো, তুমি গাড়ি চালিয়ে তাঁকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে চলে যাও। দেখছ না কি রকম কাঁপছেন। সেবা দরকার। চাচী আছে, চিন্তা নেই। আমি বাড়ির ভেতরটা দেখে তোমার গাড়িটা নিয়ে চলে আসব।'

প্রায় চ্যাংদোলা করে হ্যারিসকে গাড়িতে তুলে দিল দু'জনে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল রবিন। ততক্ষণে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ির সদর দরজার দিকে দৌড়াতে

আরম্ভ করেছে কিশোর।

ঘরগুলো সব অন্ধকার। সামনের দিকের একটা জানালায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিল। কিছু দেখা যায় না। সদর দরজার পিতলের ঘন্টাটা বাজাল। কেউ সাড়া দিল না।

দরজায় থাবা দিয়ে ককারের নাম ধরে ডাকল।

জবাব নেই।

নব ঘুরিয়ে খুলতে গিয়ে দেখল, ঘোরে না। তালা লাগানো।

দ্রুত হেঁটে ঘুরে বাড়ির পেছন দিকে চলে এল সে। পেছনের দরজা বন্ধ, সেলারের দরজা বন্ধ। কোনখান দিয়ে ঢোকার উপায় নেই। চিৎকার করে বার বার ককারের নাম ধরে ডেকেও সাড়া পেল না। বাড়িটা তেমনি অন্ধকার, নীরব হয়ে আছে।

কাজ হবে না। ঢুকতে পারবে না যে, বুঝতে পারল কিশোর। কি আর করা। নিরাশ হয়ে গাড়ির দিকে ফিরে চলল সে।

রবিন ওদিকে গাড়ির স্পীড তুলতে ভয় পাচ্ছে। হ্যারিস ধনী হলে হবে কি, ভীষণ কিপটে, গাড়িটাই তার প্রমাণ। পুরানো গাড়ি। গতি বাড়াতে গেলেই প্রতিবাদ শুরু করে ইঞ্জিন। বাধ্য হয়ে গতি কম রাখতে হলো তাকে।

অবশেষে ইয়ার্ডে পৌছল সে। নিচতলার ঘরগুলোতে আলো জ্বলছে। তারমানে জেগে আছেন মেরিচাচী, এবং নিচেই আছেন।

গাড়ির শব্দে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন চাচী। বিধ্বস্ত হ্যারিসকে নিয়ে রবিনকে নামতে দেখে আঁতকে উঠলেন, 'মাই গড!' তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন সাহায্য করার জন্যে।

রাশেদ পাশা ওপরের বেডরুমে চলে গেছেন। তাঁকে ডাকার প্রয়োজন হলো না। রবিন আর মেরিচাচীই ধরে ধরে হ্যারিসকে রান্নাঘরে নিয়ে এল। চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হলো।

বড় তোয়ালে আর রাশেদ পাশার শার্ট-পাজামা এনে দিলেন রবিনের হাতে চাচী। বললেন, 'তুমি গা মুছে দাও। আমি কফি বানাচ্ছি।'

চুলায় কেটলির পানি ফুটতে আরম্ভ করলে রবিনের দিকে ফিরে তাকালেন তিনি, 'কিশোর কোথায়? দু'জনে তো দেখলাম একসঙ্গে বেরোলে।'

যেন তাঁর কথার জবাব দিতেই ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ভেতরে এসে দাঁড়াল কিশোর। টপটপ করে পানি পড়ছে ভেজা শার্ট থেকে।

'চলে এসেছ!' কিশোরকে এত তাড়াতাড়ি আশা করেনি রবিন।

'হ্যাঁ। ঢুকতে পারলাম না। অনেক ডাকাডাকি করলাম, জবাবও দিল না কেউ। অহেতুক থেকে আর কি করব।'

'ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালিয়েছ নিশ্চয়। আমি অবশ্য জোরে চালাতে পারছিলাম না,' আড়চোখে হ্যারিসের দিকে তাকাল রবিন। শুকনো পোশাক পরে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছেন তিনি।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত একবার রবিন, একবার কিশোরের মুখের দিকে

তাকাতে লাগলেন মেরিচাচী। হঠাৎ করেই যেন মনে পড়ল, 'ওহ্হো, ভুলেই গিয়েছিলাম। মিস্টার ককার এসে বসে আছেন তোদের জন্যে।'

হাঁ হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। হ্যারিসের দায়িত্ব চাচীর ওপর দিয়ে বসার ঘরে এসে ঢুকল ওরা।

ছয়

'মিস্টার ককার,' রবিন জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ভাল আছেন!'

'আছি। কেন, না থাকার কোন কারণ ঘটেছে?' প্রশ্ন করলেন ব্যাংকার।

'আসলে জানতে চাইছিলাম, এত তাড়াতাড়ি এলেন কি করে এখানে,' কিশোর বলল।

'কি বলছ বুঝতে পারছি না! তাড়াহুড়া করতে যাব কেন? তাড়াহুড়া করা আমার স্বভাব নয়। যা করি ধীরেসুস্থেই করি। এমনকি জরুরী অবস্থায়ও তাড়াহুড়া করি না।'

'আপনাকে কিন্তু রিভেরা হাউস থেকে বেরোতে দেখিনি। পথেও আপনার গাড়ি আমাদের গাড়িকে ওভারটেক করতে দেখিনি। এলেন কি করে?'

'রিভেরা হাউস!' ভুরু কোঁচকালেন ককার। 'ওখানে যাব কেন? গত দেড়টি ঘণ্টা ধরে তোমাদের অপেক্ষায় বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে গেছি। মিসেস পাশা বলতে পারলেন না তোমরা কোথায় গেছ।' ওদের ভেজা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তাঁর, 'এত ভিজলে কি করে?'

'আপনার কেসের তদন্ত করতে গিয়ে,' ককারের রুক্ষ ব্যবহার রাগিয়ে দিল রবিনকে। সেটা প্রকাশ করল না। 'রিভেরা হাউসে ঢুকেছিলাম। অন্ধকারে অবিকল আপনার মত দেখতে একজনকে ঢুকতে দেখলাম। একটু পর একটা আলো জ্বলে উঠে কিছুক্ষণ থেকে নিভে গেল। পরক্ষণেই কে যেন চিৎকার করে উঠল। আমরা ভাবলাম আপনাকে খুন করে ফেলা হচ্ছে। একজন লোক ছুটে বেরোল। তাঁকে তাড়া করলাম। ধরে নিয়ে এসেছি এখানে।'

হাঁ হয়ে গেছেন ব্যাংকার। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার রাগ বেমালুম উবে গেল। নরম হয়ে বললেন, 'আমি যাইনি তো। তোমরা না বললে ওবাড়ি থেকে দূরে থাকতে। তাই তো রয়েছি।'

'আপনি তাহলে এলেন কোত্থেকে?'

'সোজা ব্যাংক থেকে। বেশি কাজ থাকলে অফিস আওয়ারের পরেও কাজ করি আমি।'

এইবার গোয়েন্দাদের অবাক হওয়ার পালা। পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা।

এই সময় হ্যারিসকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মেরিচাচী। অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠেছেন ভদ্রলোক।

ককারকে দেখেই চটে উঠলেন হ্যারিস। 'তুমি!' বলেই লাফ দিয়ে এগিয়ে গেলেন বিস্মিত ব্যাংকারের গলা টিপে ধরতে। 'চোর কোথাকার! আমার পান্নাগুলো কি করেছ! জলদি ফেরত দাও!'

তাঁকে আটকে ফেলল কিশোর আর রবিন।

আবার রেগে গেলেন ককার। ভারি গলায় বললেন, 'আপনি যে-ই হোন, শান্ত হোন। কথাবার্তা সাবধানে বলবেন। মানহানীর কেস করে দিলে বিপদে পড়বেন কিন্তু।'

'এত সুন্দর জিনিসগুলো চুরি হয়ে গেল আমার! পান্না কেটে তৈরি করা এত সুন্দর সুন্দর পুতুল!' রবিন আর কিশোরের দিকে তাকিয়ে ককিয়ে উঠলেন হ্যারিস। 'ফেরত দিতে বলো ওকে!'

'আপনার পুতুল আমি নিতে যাব কেন?' গর্জে উঠলেন ককার। 'আর একবার এ কথা উচ্চারণ করলে পুলিশকে ফোন করব আমি!'

'আহ্, কি পাগলামি শুরু করলেন আপনি, হ্যারিস!' কঠিন হয়ে উঠল মেরিচাচীর দৃষ্টি। 'শান্ত হয়ে বসুন। কি হয়েছে, খুলে বলুন সব।'

চেয়ারে বসলেন হ্যারিস। ককারকে দেখিয়ে বললেন, 'এর মত দেখতে একজন লোক এসে হাজির বাড়িতে। পান্নার তৈরি আমার দুর্লভ সংগ্রহগুলো দেখতে চাইল। বলল, তার কাছেও কিছু জিনিস আছে। আমারগুলো দেখলে নাকি বলতে পারবে ওগুলো আমি কিনতে আগ্রহী হব কিনা। বের করে আনলাম। আমি তখন বাড়িতে একা...'

'ম্যাগি কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন চাচী। ম্যাগি হলো হ্যারিসের বোন। মেরিচাচীর বান্ধবী।

'বেড়াতে গেছে,' জানালেন হ্যারিস। 'লোকটা আমার জিনিসগুলো দেখার পর জানতে চাইল আর আছে কিনা। গিয়ে আলমারি খুলে সবচেয়ে দামী জিনিসটা বের করলাম, পান্নার তৈরি একটা দাবার বোর্ড, অনেক টাকা দাম। ওটা নিয়ে ফিরে এসে দেখি লোকটাও নেই, আমার পুতুলগুলোও গায়েব!

'ছুটে বেরোলাম। দেখি, একটা বড় গাড়িতে উঠছে সে। আমার গাড়িটা ড্রাইভওয়েতেই ছিল। তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে তার পিছু নিলাম। কিন্তু তার গাড়ির সঙ্গে তাল রাখতে পারলাম না। ম্যানিলা রিভার রোডে গাড়িটা ঢুকতে দেখলাম। তারপর দেখলাম একটা বাড়ির বিরাট গেট দিয়ে ঢুকে যেতে। ঝোপের আড়ালে গাড়ি রেখে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে আমিও ঢুকলাম সেই বাড়িতে। গাড়িটা দেখলাম না, তবে একটু পর লোকটাকে দেখলাম ঘরে ঢুকতে। তার পেছন পেছন আমিও ঢুকে পড়লাম ভেতরে।'

'সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়েছিলেন,' কিশোর বলল, 'বুঝতে পারেননি!'

'বুঝব না কেন? আসলে এতটা রেগে গিয়েছিলাম চোরের ওপর, হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। তা ছাড়া জিনিসগুলো ফেরত নেয়ার জন্যে মরিয়া

হয়ে উঠেছিলাম। যাই হোক, একটা হলঘরে ঢুকলাম। সামনের একটা ঘরে আলো জ্বলছিল। চুপিসারে এগোলাম সেদিকে। হঠাৎ আলো নিভে গেল। ঠিক আমার পেছনে হলো চিৎকারটা!'

সে-কথা মনে পড়তেই কেঁপে উঠলেন হ্যারিস। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'আর দাঁড়ানোর সাহস হলো না, ঝেড়ে দৌড় মারলাম। কোন দিকে যাচ্ছি তা-ও খেয়াল ছিল না। পেছনে পায়ের শব্দ শুনে মনে করলাম খুনীটা আমারই পিছু নিয়েছে। আরও জোরে দৌড়াতে লাগলাম। ধরা পড়ার পর দেখলাম, খুনীটা নয়, তোমরা।'

ব্যাংকারের দিকে তাকাল কিশোর। 'মিস্টার ককার, মনে হচ্ছে, আপনার মত একই চেহারার আরও একজন আছে, যে মিস্টার হ্যারিসের পান্নাগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে। লোকটার চেহারা ভালমত দেখেছেন?'

'না, স্পষ্ট দেখতে পারিনি। মাথায় বড় হ্যাট পরেছিল। এখন বুঝতে পারছি, ইচ্ছে করে মুখের ওপর হ্যাট টেনে দিয়ে ছায়া ফেলে রেখেছিল। আমার দিকে তাকায়নি ঠিক মত। চেহারা দেখতে দিচ্ছিল না।'

'এর অর্থ, মিস্টার ককারের শরীরের সঙ্গে তার মিল দেখে চালাকি করে নিজেকে ককার বলে চালিয়ে দিতে চাইছে। রিভেরা হাউসে লোকে ঢুকতে দেখলে মনে করবে মিস্টার ককারই ঢুকছেন। সন্দেহ করে কিছু জিজ্ঞেস করতে আসবে না।'

'শুনতে একটুও ভাল লাগছে না আমার!' মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন ককার, 'বিপদে ফেলে দেবে দেখছি আমাকে! আজ হ্যারিস আমাকে দেখে চোর ভেবেছেন, আরেকদিন আরেকজনে ভুল করবে···নাহ্, একটা ব্যবস্থা করা দরকার!'

'পুলিশকে জানাচ্ছি,' টেলিফোন করতে উঠল কিশোর।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ককার। বাধা দিলেন, 'না না, আমার কেসের ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাই!'

'আপনার রহস্যের কথা কিছু বলব না। কেবল মিস্টার হ্যারিসের বাড়িতে চুরির কথাটা জানাব।'

কয়েক মিনিট পর রিসিভার রেখে ফিরে এসে জানাল কিশোর, পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারকেই পেয়েছে। তিনি বলেছেন রিভেরা হাউসে লোক পাঠাবেন তদন্ত করতে। প্রয়োজনে রাতে পাহারার ব্যবস্থাও করবেন।

কিশোরকে হ্যারিসের কাছ থেকে দূরে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ককার বললেন, 'তদন্ত করে কি উন্নতি হয়েছে জানতে এসেছিলাম। কাল বিকেল পাঁচটায় রিভেরা হাউসে দেখা কোরো। গুপ্তঘরের দরজার টাইম লক তখন তোমাদের সামনে সেট করে দেব।'

'যাব।'

কথা শেষ করে ব্যাংকার বেরিয়ে যেতেই হ্যারিস বললেন বাড়ি যাবেন। এখনও দুর্বল। একা যেতে পারবেন না বলে সন্দেহ হলো মেরিচাচীর। কিশোর আর রবিনকে বললেন বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে।

আপত্তি তো নেইই ওদের, বরং যেতে উৎসাহী, দেখে আসতে পারবে কোনখান থেকে কি ভাবে পান্নাগুলো নিয়ে গেছে চোর।

হ্যারিসের গাড়িটা চালান রবিন। পাহাড়ের কোলে পাথরের তৈরি হ্যারিসের বাড়িটা চেনে সে।

কিশোরও চেনে। রবিনের ফোক্স ওয়াগেন নিয়ে সে আসছে পেছন পেছন। হ্যারিসকে পৌঁছে দিয়ে ফেরত যেতে হবে ওদেরকে, গাড়িটা লাগবে তখন।

গেট দিয়ে ড্রাইভওয়েতে ঢুকতে চোখে পড়ল রবিনের, সদর দরজা হাঁ হয়ে খুলে আছে। আলো জ্বলছে ভেতরে।

'আরি!' চমকে উঠলেন হ্যারিস। 'খোলা রেখেই চলে গিয়েছিলাম! তাড়াহুড়োয় দরজা আটকে যেতেও মনে ছিল না!'

রবিন গাড়ি থামাতেই দরজা খুলে নেমে পড়লেন তিনি। টলোমলো পায়ে যতটা সম্ভব দ্রুত এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

গাড়ি রেখে কিশোর আর রবিনও তাঁর পিছু নিল।

লাইব্রেরিতে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন হ্যারিস। চিৎকার করে উঠলেন, 'হায় হায়, আমার দাবার বোর্ডটাও নেই!' বুক চেপে ধরলেন তিনি। 'টেবিলেই ছিল! গেছে ওটাও!'

সাত

ধরে তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে দিল রবিন। গেলাসে করে পানি এনে দিল। কিশোর গেল ডাক্তারকে ফোন করতে।

ডাক্তার আসতে আসতে তদন্তটা সেরে ফেলতে চাইল সে। হ্যারিসের কাছে রবিনকে বসিয়ে রেখে যে ঘরে আলমারিটা আছে সে-ঘরে এসে ঢুকল। দেখা শেষ করে ফিরে আসতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগল না।

চোখ বুজে আছেন হ্যারিস। খুললেন না। কিশোরের সাড়া পেয়ে বললেন, 'পান্নার বাকি জিনিসগুলো আলমারিতে আছে।'

রবিনের দিকে তাকিয়ে নীরবে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, কিছুই নেই আলমারিতে। সাফ করে নিয়ে গেছে! রবিনকে সরিয়ে এনে ফিসফিস করে বলল, 'চুপ থাকো। ডাক্তার আসার আগে হ্যারিসকে বলার দরকার নেই।'

আবার ফোন করতে গেল কিশোর। এবার থানায়। ইয়ান ফ্লেচারকেই পাওয়া গেল।

'আমার মনে হয় দ্বিতীয় চুরিটাও প্রথমটার ওপর ভিত্তি করেই হয়েছে,' কিশোর বলল। 'সাজানো ঘটনা। প্ল্যান করে চুরি করতে এসেছিল চোর। মিথ্যে কথা বলে ভজিয়ে-ভাজিয়ে মিস্টার হ্যারিসকে দিয়ে আলমারির তালা

খোলায়। প্রথমে কয়েকটা পুতুল নিয়ে আসেন তিনি। সেগুলো দেখার পর তাঁকে দাবার বোর্ডটা আনতে পাঠায় চোর। তিনি সেটা আনতে গেলে পুতুলগুলো নিয়ে সে বেরিয়ে যায়। সে জানত, মিস্টার হ্যারিস পিছু নেবেন। চালাকি করে তাঁকে টেনে নিয়ে যায় রিভেরা হাউসে। মিস্টার হ্যারিসের বাড়ি তখন পুরোপুরি খালি। সেই সুযোগে চোরের কোন সহযোগী এসে দাবার বোর্ড আর আলমারিতে রাখা অন্যান্য জিনিস নিয়ে কেটে পড়ে।'

চীফ বললেন, 'আমার বিশ্বাস, যারা বন্দরে উৎপাত করছে, এটাও সেই চোরদেরই কাজ। ক'দিন ধরে খুব জ্বালাচ্ছে ওরা। জেটিতে ভেড়ানো জাহাজ, বন্দরের গুদাম, যেখানেই সুযোগ পাচ্ছে, চুরি করছে। কোনমতেই ধরা যাচ্ছে না ব্যাটাদের। একটা কালো গাড়িতে করে চলাফেরা করত ওরা। পুলিশ জেনে ফেলেছে বুঝে সেটাও আর ব্যবহার করছে না।'

'মাল সরাচ্ছে কোথায়?'

'বুঝতে পারছি না। কড়া নজর রেখেছি আমরা। চোরাই মাল বাজারে এলেই খপ করে ধরব। কিন্তু আসছে না। তারমানে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ফেলছে ওরা। পরে পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হলে বের করবে।'

জরুরী কিছু জানতে পারলে চীফকে জানাবে, কথা দিয়ে রিসিভার রেখে দিল কিশোর।

ডাক্তার এলেন। হ্যারিসকে দেখেটেখে বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই। কয়েক দিন বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবেন। বেশি উত্তেজনায় এমন হয়েছে। তোমাদের আর থাকার দরকার নেই। বাড়ি যেতে পারো।'

ওষুধ দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন।

আলমারিও যে ফাঁকা করে দিয়ে গেছে চোর, এ কথা আর হ্যারিসকে বলল না কিশোর। শুনলে আবার কি করে বসেন ঠিক নেই। ওষুধ দেয়া হয়েছে। ঘুমাক। সকালে উঠে নিজেই যা দেখার দেখবেন।

রবিনকে নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। বাড়ি ফিরে চলল।

অনেক রাত হয়েছে। ইয়ার্ডে ওদের বাড়িতেই রবিনকে থেকে যেতে বলল কিশোর। রবিনও রাজি হয়ে গেল। বাড়িতে ফোন করে দিলেই হবে, মা আর চিন্তা করবেন না।

পরদিন সকালে নাস্তা সেরেই বেরিয়ে পড়ল দুই গোয়েন্দা। প্রথমে যাবে থানায়। আগের রাতে রিভেরা হাউসে পুলিশ কিছু পেল কিনা জানার জন্যে।

অফিসেই পাওয়া গেল ফ্লেচারকে। জানালেন, রিভেরা হাউসে নতুন কিছু পাওয়া যায়নি। তবে বন্দরে বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে। একটা স্পীড বোটের মালিক জানিয়েছে, তার বোটটা চুরি করে কেউ ব্যবহার করেছে। ঘাটে রেখে যাবার সময় ওটার পেট্রল ট্যাংক ভরা ছিল, ফিরে এসে দেখে প্রায় খালি। বোটের ইঞ্জিনও গরম। অথচ বহুক্ষণ ওটা চালায়নি সে। তারমানে কেউ চালিয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনাটা হলো, হিরন নামে আরেকটা মোটর বোট চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল দু'জন লোক। একজন বেঁটে, আরেকজন লম্বা। কোস্ট গার্ডের

নজরে পড়ে যায় সেটা। তাড়া করে। ম্যানিলা রিভারের মুখের কাছে গিয়ে ডুবো পাথরে ঘষা লেগে ডুবে যায় বোটটা। সাঁতরে তীরে উঠে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে দুই চোর। আর ওদেরকে ধরা যায়নি।

আর তৃতীয় ঘটনাটা হলো, সী কিং নামে একটা জাহাজে ক্যাপ্টেনের কেবিনে চোর ঢুকেছিল। জাহাজটার মালিক স্টার লাইট শিপ কোম্পানি।

'কি নিয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।

মৃদু হাসলেন চীফ। 'শুনলে চমকে যাবে। একটা পান্না বসানো দামী হার। স্ত্রীর জন্যে কিনে রেখেছিলেন ক্যাপ্টেন টমার।'

সত্যিই চমকাল দুই গোয়েন্দা। খবরটা হজম করতে সময় লাগল ওদের। তারপর কিশোর বলল, 'মিলে যাচ্ছে। ডুডলি হ্যারিসের বাড়ি থেকেও পান্নার তৈরি জিনিসই চুরি গেছে।'

মাথা ঝাঁকালেন চীফ, 'কয়েক ঘন্টার মধ্যে দুই দুইটা চুরি। পান্নার ওপরই লোভ ওদের। একই দলের কাজ বলেই মনে হয়।'

'ক্যাপ্টেন টমার এখন কোথায়? তাঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে?'

'লস অ্যাঞ্জেলেসে গেছেন। কোম্পানির হেড অফিসে, কথা বলতে। কাল নাগাদ ফিরে আসবেন।'

'একটার সঙ্গে আরেকটার যোগসূত্র দেখতে পাচ্ছি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল রবিন। 'বন্দরের চোরদের সঙ্গে মিস্টার হ্যারিসের বাড়িতে চুরির মিল, আবার মিস্টার হ্যারিসের সঙ্গে রিভেরা হাউসের যোগাযোগ। সব যেন একই সুতোয় বাঁধা।'

আবার মাথা ঝাঁকালেন চীফ, 'সে-রকমই মনে হচ্ছে।'

কিশোর বলল, 'বোট ব্যবহার করে শুনে মনে হচ্ছে, জলপথে পালায় চোরেরা। রিভেরা হাউসের পেছন দিয়েই বইছে ম্যানিলা নদী। বন্দর থেকে চোরাই মাল নিয়ে বোটে করে সোজা চলে যায় রিভেরা এস্টেটে। সেখানে কোনখান থেকে গাড়িতে পাচার করে দেয় মাল।'

'ঠিক!' উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। 'সে-জন্যেই হদিস করতে পারছে না পুলিশ!'

চীফের দিকে তাকাল কিশোর, 'আজ বিকেল পাঁচটায় রিভেরা হাউসে যাব আমি আর রবিন। জরুরী কিছু পেলে আপনাকে জানাব।'

আট

সাড়ে চারটায় রওনা হলো দু'জনে। বাড়িতে কাজ থাকায় সেদিনও ওদের সঙ্গে যেতে পারল না মুসা।

এস্টেটে পৌঁছে রাস্তার ধারে একটা ঝোপের পাশে গাড়ি রাখল রবিন। আগের রাতে ডুডলি হ্যারিসও এখানেই রেখেছিল।

ভারি কাঠের গেটটার কাছে এসে শিস দিয়ে উঠল কিশোর। 'কাল রাতে খোলা দেখে গিয়েছিলাম...'

'এখন খোলা, এই তো?' রবিন বলল, 'কাল রাতে তুমি চুরির কথা বলার পর পুলিশ এসেছিল হয়তো, ওরাই লাগিয়ে রেখে গেছে।'

কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারল না কিশোর।

সাবধানে ভেতরে ঢুকল দু'জনে।

'বাড়ির পেছনের পায়ের ছাপগুলো আরেকবার দেখব,' কিশোর বলল। 'এই গেটের ব্যাপারটা ভাল্লাগছে না আমার। খোলা রেখে গেলে দেখি লাগানো, লাগানো দেখলে থাকে বন্ধ। নিশ্চয় কারও যাতায়াত আছে।'

প্রথমবার যেখানে পায়ের ছাপগুলো দেখেছিল, সেখানে চলে এল সে। মাটির দিকে তাকাল।

'দেখো, নতুন ছাপ। অনেকগুলো। এই ক'টা দেখো, বেশি দেবেছে। তারমানে লোকটার ওজন বেশি।'

'এগুলো কালকেরগুলো না বলছ?' রবিনের প্রশ্ন।

'রাতে অনেক বৃষ্টি হয়েছে। আগের ছাপ থাকার কথা নয়। বৃষ্টির পরে পড়েছে এগুলো।'

ছাপ অনুসরণ করে নদীর ধারে চলে এল ওরা। এখানে নদীটা বেশ চওড়া।

মিনিটখানেক পর ড্রাইভওয়েতে একটা গাড়ি ঢোকার শব্দ শোনা গেল।

'মনে হয় ককার এসেছেন,' রবিন বলল। 'অন্য কেউও হতে পারে। লুকিয়ে পড়া দরকার।'

ঘন গাছপালার আড়ালে আড়ালে এগোল ওরা। কিছুদূর এগোনোর পর বাড়ির বারান্দাটা চোখে পড়ল।

লম্বা, হালকা রঙের স্যুট পরা এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। অধৈর্য ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। কয়েকবার তাকালেন ওরা যেদিকে রয়েছে সেদিকে, কিন্তু গাছের আড়ালে থাকায় ওদের দেখতে পেলেন না।

'ককারই তো?' রবিনের কণ্ঠে সন্দেহ, 'নাকি তাঁর নকল?'

ওদের দিকে পিঠ দিয়ে উল্টো দিকে ঘুরলেন ভদ্রলোক। নিঃশব্দে এক ছুটে তাঁর কাছে চলে এল ওরা। আস্তে কাঁধে হাত ছোঁয়াল রবিন।

'কে!' ভীষণ চমকে গিয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক।

'সরি! আপনি আসলেই মিস্টার ককার কিনা, সন্দেহ ছিল আমাদের...'

'খুব চমকে দিয়েছ,' গম্ভীর হয়ে আছেন ব্যাংকার। 'তোমাদের গাড়ি দেখলাম না, ভাবলাম আসোনি বুঝি। এসো। একটা মিনিট নষ্ট করা যাবে না। কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় সেট করা আছে টাইম লক। এখনই যেতে হবে। নইলে আর ঢুকতে পারব না।'

চাবি দিয়ে সামনের দরজার তালা খুললেন ককার। লিভিং রুমে ঢুকে চট করে একবার তাকালেন গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকটার দিকে। তারপর গোয়েন্দাদের

নিয়ে চললেন ওপরতলায়।

বড় একটা ঘরে ঢুকে ফ্রেমে বাঁধা একটা ফটোগ্রাফ সরাতে একটা ছোট ছিদ্র দেখা গেল। তাতে আঙুল ঢুকিয়ে বোধহয় চাপই দিলেন। খুব ছোট গোল একটা দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে পড়ল টাইম লকের ডায়াল।

ডায়ালগুলোকে কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ ঘোরালেন তিনি।

তাকিয়ে আছে দুই গোয়েন্দা। দেয়ালের যে জায়গাটায় এতক্ষণ কাগজের জোড়া আছে ভেবেছিল, সেখানে একটা চির দেখা দিল। বড় হতে লাগল ফাটলটা। অবশেষে খুলে গেল দরজা।

গুপ্তঘরে ঢোকার পথ!

গোয়েন্দাদের নিয়ে একটা ছোট, জানালাশূন্য ঘরে ঢুকলেন ককার।

ঘরের মাঝখানে পড়ে থাকা সাদা কাগজটা সবার আগে রবিনের চোখে পড়ল। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল ওটা।

তাতে লেখা:

ঘড়ি যখন টিক টিক করবে,
তখন আসবে মরণ!
এবং এটাই শেষ হুঁশিয়ারি!

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল তিনজনে। তারপর হাত বাড়াল কিশোর, 'দেখি?'

প্রথম যে দুটো মেসেজ পাঠানো হয়েছিল, সেগুলোর মত একই হাতের লেখা।

'কিছু মনে না করলে এটা আমরা রেখে দিচ্ছি, মিস্টার ককার,' বলল সে। 'সূত্র হিসেবে কাজে লাগতে পারে।'

থমথম করছে ব্যাংকারের মুখ। মাথা ঝাঁকালেন। 'রাখো।...ওদের হুমকিকে আমি ভয় করি না। ভাবছি এতটা ঘৃণা আমাকে কে করে যে খুনই করতে চায়!'

রবিন বলল, 'জিনিস খোয়া গেছে নাকি দেখেন তো?'

টেবিলে রাখা কাগজপত্র আর ফাইলিং কেবিনেটটা দ্রুত একবার দেখে নিলেন ককার। 'না, সব ঠিক আছে। আগের বারের মতই। ঘরের মেঝেতে রহস্যময় একটা নোট। কোন জিনিস খোয়া যায়নি। কিছুতে হাতও দেয়নি।'

বর্গাকার ঘরটাতে চোখ বোলাল কিশোর। 'দরজা ছাড়াও ঢোকার আরও পথ আছে, সেটা বের করতে হবে। মিস্টার ককার, দরজাটা লাগিয়ে দিন। খুঁজব।'

সুইচ টিপে মাথার ওপরের একটা আলো জ্বাললেন ককার। তারপর ইস্পাতের ভারি দরজাটা লাগিয়ে দিলেন।

কাজে লেগে গেল দুই গোয়েন্দা।

ফায়ারপ্লেসে মাথা ঢুকিয়ে চিমনির ভেতর দিয়ে ওপরে তাকাল কিশোর।

ককার ঠিকই বলেছেন, ওপরের খোলা মুখটায় শিক লাগানো। কেউ ওপথে ঢুকতে হলে শিকগুলো খুলে ফেলে দিতে হবে আগে। তা ছাড়া

খুললেও এত সরু চিমনি দিয়ে কোন বাচ্চা ছেলেও ঢুকতে পারবে না। না, এ পথে কারও ঢোকা একেবারেই অসম্ভব।

কাজে লাগতে পারে ভেবে ছোট একটা হাতুড়ি নিয়ে এসেছে রবিন। সেটা দিয়ে দেয়াল ঠুকে দেখতে লাগল ফাঁপা আওয়াজ বেরোয় কিনা।

কার্পেট উল্টে দেখতে শুরু করল কিশোর। নিচের মেঝেতে ট্র্যাপডোর কিংবা আলগা তক্তা কোন কিছুই নেই, যেটা সরিয়ে ঢোকা যায়। চিমনি আর দরজাটা বাদে কোথাও এমন ফাঁক-ফোকর নেই, যেখান দিয়ে মানুষ তো দূরের কথা, একটা ইঁদুর ঢুকতে পারে।

'বুঝতে পারছি না!' রীতিমত অবাক হয়েছে কিশোর। 'কেউ তো একজন নিশ্চয় ঢুকেছে। নইলে নোট রেখে গেল কি ভাবে?'

'সাধে কি আর ডাকতে গেছি তোমাদের!' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারে বসে পড়লেন ককার।

'আরেকটা সম্ভাবনা আছে অবশ্য,' হঠাৎ বলে উঠল কিশোর। পকেট থেকে ফিতে বের করে ঘরটা মাপতে শুরু করল। তারপর বলল, 'মিস্টার ককার, দরজা খুলুন।'

দরজার চৌকাঠের দুই পাশে দুই পা দিয়ে দাঁড়াল সে। দেয়াল কতটা পুরু, মাপল।

এ ঘরে আর কাজ নেই। বেরিয়ে এল সবাই। দরজা লাগিয়ে, টাইম লক সেট করে, দেয়ালের ছিদ্রের ওপর আবার ছবিটা ঝুলিয়ে দিলেন ককার।

ততক্ষণে সীটিং রুমের দেয়াল মাপতে আরম্ভ করেছে কিশোর। তারপর হলঘরে ঢুকে সেটার দেয়ালও মাপল।

'ব্যাপারটা কি? কি করছ?' জানতে চাইলেন ব্যাংকার।

'দেখলাম গুপ্তঘরের দেয়ালে কোন কারসাজি আছে কিনা। এ সব পুরানো আমলের বাড়িতে অনেক সময় ফলস ওয়াল তৈরি করা হয়,' আনমনে বলল কিশোর। 'কিন্তু এটার দেয়াল ফলস বলে মনে হয় না। মাপ ঠিক, কোন গণ্ডগোল নেই।'

'তাজ্জব ব্যাপার!' রবিন বলল। 'হুমকিটাকে সিরিয়াসলি নেবেন, মিস্টার ককার। সাবধানে থাকবেন।'

চওড়া সিঁড়িটা বেয়ে নিচে নেমে এল তিনজনে।

নীরব বাড়িটাতে একটাই মাত্র শব্দ শোনা যাচ্ছে এখন। বিরাট ঘড়িটার শব্দ:

টিক-টক! টিক-টক! টিক-টক!

বিড়বিড় করল রবিন, 'ঘড়ি যখন টিক টিক করবে, তখন আসবে মরণ!'

লিভিং রুমের দিকে এগোল সে। গ্র্যাণ্ড ফাদার ক্লকটার সামনে দাঁড়াল। একতালে দুলছে পেণ্ডুলাম। শব্দ করছে টিক-টক, টিক-টক।

কপাল ভাঁজ করে ফেললেন ককার, 'একবারও দম দিইনি আমি ঘড়িতে! চলে কি করে?'

'নিশ্চয় দেয় কেউ,' রবিন বলল। 'কাল রাতেও দেখে গেছি চলছে। যে

লোক নোট রেখে যায়, হতে পারে সে-ই চাবিও দিয়ে যায়। সে বলছে, ঘড়ি টিক টিক করলে মরণ আসবে, হয়তো এই ঘড়িটার কথাই বলেছে।'

ঘড়ির নিচে পেণ্ডুলাম রয়েছে যে খুপড়িটায়, তার কাঁচের দরজাটার দিকে তাকাল সে। ভেতরে অন্য কিছু নেই। ওপরের দরজাটা সাবধানে খুলে ভেতরটা দেখল।

'এখানেও কিছু নেই।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। গভীর চিন্তায় মগ্ন। কি যেন মনে করার চেষ্টা করছে। বলল, 'মিস্টার ককার, আমাদের ডুপ্লিকেট চাবির খবর কি?'

'হায় হায়, তাই তো! এত কাজের চাপ, চাবির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম! ঠিক আছে, কাল সকালে আগে চাবিওয়ালার কাছে যাব, তারপর অন্য কাজ।'

নয়

ইয়ার্ডে ফিরে মুসার পুরানো জেলপি গাড়িটাকে চত্বরে দাঁড়ানো দেখল ওরা। মুসা বসে আছে ওঅর্কশপে। ওদের অপেক্ষায়।

তদন্তের কতখানি অগ্রগতি হয়েছে, কিছুই জানে না সে। শুনতে চাইল।'

সব তাকে খুলে বলতে লাগল রবিন আর কিশোর। বদ্ধ ঘরে নোট পাওয়া গেছে শুনে গম্ভীর হয়ে গেল মুসা। মাথা দুলিয়ে বলল, 'বুঝলাম!'

'কি বুঝলে?' ভুরু কোঁচকাল রবিন।

'কে ওখানে নোট ফেলে এসেছে।'

'কে?' রবিন অবাক।

'ভূতে। বদ্ধ ঘরে ঢুকতেও কোন অসুবিধে হয় না ওদের।'

'তোমার মাথা! ভূত না ছাই! মানুষই ঢুকেছে। কি ভাবে, সেটাই বুঝতে পারছি না!'

'সেটা বুঝতে হলে বাড়িটার ওপর নজর রাখতে হবে আমাদের। ভাবছি, আজ রাতেই আবার যাব। কেউ ঢোকে কিনা দেখব। ঢুকলে তাকে ধরার চেষ্টা করব। মুসা, বাড়িতে তোমার কাজ শেষ হয়েছে?'

'পুরোপুরি হয়নি। তবে আজ রাতে না করলেও চলবে।'

'তাহলে যেতে পারবে আমাদের সঙ্গে?'

'পারব।'

'ভূত আছে তো পোড়োবাড়িতে,' হেসে বলল রবিন, 'ভয় লাগবে না? যদি চেপে ধরে?'

'দোয়া-দরূদ পড়তে পড়তে যাব,' হাত নেড়ে মুসা বলল, 'তাহলেই আর কাছে ভিড়তে পারবে না ভূত।'

রাত নামার অপেক্ষা করল ওরা। তারপর তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল। ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনলে পালিয়ে যেতে পারে চোরেরা, তাই গাড়ি নিল না। হেঁটে চলল। টর্চ আছে সঙ্গে, জ্বালানোর প্রয়োজন পড়ল না। চমৎকার চাঁদের আলো।

শহর ছেড়ে এসে নদীর পাড়ের পথ ধরল। এ পথে যানবাহন খুব কম। দু'একটা গাড়ি আসছে যাচ্ছে। রিভেরা এস্টেটের দিকে কোন গাড়ি যেতে দেখলেই পথের পাশের ঝোপ কিংবা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছে ওরা। বলা যায় না, গাড়িটা চোরেরও হতে পারে। চিনে ফেলতে পারে ওদের।

রিভেরা হাউসের গেটে এসে ফিরে তাকাল মুসা। কেউ পিছু নিয়েছে কিনা দেখল। চাঁদের ফ্যাকাসে আলোয় রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়। নির্জন। গেটের পাশে গাছের জটলা আর দেয়ালে লম্বা লম্বা আইভি লতা রহস্যময় ছায়া সৃষ্টি করেছে। নিজের অজান্তেই গায়ে কাঁটা দিল তার।

গেট বন্ধ। ডিঙাতে অসুবিধে হলো না। ভেতরে ঢুকে বাড়িটার কাছাকাছি এসে ঝোপে লুকিয়ে বসল। এখান থেকে সামনে-পেছনে দু'দিকের দরজার ওপরই নজর রাখা যায়। চাঁদের আলোয় চকচক করছে বাড়ির স্লেট পাথরের টালি।

বসে আছে তো আছেই ওরা। কেউ আর আসে না। উসখুস শুরু করল মুসা। উঠে চলে যাওয়ার কথা বলতে যাবে কিশোরকে এই সময় তার গায়ে কনুইয়ের গুঁতো মেরে ফিসফিস করে রবিন বলল, 'ওই দেখো!'

জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে সাদা শার্ট পরা খাটোমত এক লোক। বাড়িটার দিকে এগোল। হাঁটার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় পথ ওর চেনা।

'ধরতে হবে,' কিশোর বলল। 'এসো।'

নিঃশব্দে এগোল ওরা। আরেকটু হলেই পেছন থেকে গিয়ে লোকটাকে ধরে ফেলতে পারত। কিন্তু গোলমাল করে ফেলল মুসা। শুকনো ডালে পা দিয়ে বসল। মট করে ভাঙল ওটা।

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। তিন গোয়েন্দাকে দেখে একটা মুহূর্ত দেরি করল না। নদীর দিকে দৌড় দিল

পিছু নিল তিন গোয়েন্দা।

সাংঘাতিক দৌড়াতে পারে লোকটা। বনের মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের পলকে।

ওর কাছে পিস্তল থাকতে পারে এই ভয়ে টর্চ জ্বালতে সাহস করল না গোয়েন্দারা। চাঁদের আলো থাকা সত্ত্বেও বনের মধ্যেটা অন্ধকার। দেখা গেল না লোকটাকে।

খানিক পর একটা মোটর বোটের ইঞ্জিন গর্জে উঠল। নীরব রাতে অনেক বেশি করে কানে বাজল শব্দটা। নদীর দিকে ছুটল ওরা।

দেরি করে ফেলেছে। নদীর পাড়ে এসে দেখল, চলতে আরম্ভ করেছে ছোট একটা স্পীড বোট। হুইল ধরে বসেছে লোকটা।

হতাশ চোখে বোটটার দিকে তাকিয়ে রইল গোয়েন্দারা। নিজের ভুলের জন্যে ধরতে পারল না বলে আফসোস করতে লাগল মুসা। নদীর মোহনার দিকে যাচ্ছে বোট। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল বাঁকের আড়ালে।

কিশোর বলল, 'কাল রাতে দু'জন লোককে তাড়া করেছিল পুলিশ। বোট ডুবে যাওয়ার পর পালিয়েছিল ওরা। একজন লম্বা, আরেকজন বেঁটে। মনে হয় সেই বেঁটে লোকটাই এই লোক।'

'রিভেরা হাউসে কি করতে এসেছিল?' রবিনের প্রশ্ন।

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। আসলে বোকামি করে ফেলেছি। ধরার চেষ্টা না করে তার পিছু নেয়া উচিত ছিল। কোথায় যায়, কি করে, দেখতাম। অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব পেয়ে যেতাম তাহলে।'

আবার বাড়ির কাছে ফিরে এল ওরা। আর এখানে থাকার কোন মানে নেই। সন্দেহজনক যাকে আশা করেছিল কিশোর, সে এসে চলে গেছে। এ রাতে আর কেউ আসবে বলে মনে হয় না।

অহেতুক বসে না থেকে দুই সহকারীকে নিয়ে বাড়ি ফিরে চলল কিশোর।

দশ

পরদিন সকালে নাস্তার পর স্টার-লাইট শিপ কোম্পানির অফিসে রওনা হলো কিশোর আর রবিন। মুসাকে ফোন করেছিল কিশোর। আসতে পারবে না বলে দিয়েছে মুসা। কাজে ব্যস্ত। মা তাকে আটকে ফেলেছেন।

অফিসটা খুঁজে বের করল সহজেই। রিসিপশন ডেস্কে বসা সেক্রেটারি বলল, 'ক্যাপ্টেন টমার? হ্যাঁ, আছেন। কিন্তু ব্যস্ত। দেখা করতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

'বলুনগে পান্নার হারের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি আমরা,' কিশোর বলল। 'অবশ্যই দেখা করবেন তিনি।'

অবাক হয়ে তার মুখের দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল সেক্রেটারি। তবে আর কিছু বলল না। উঠে চলে গেল ভেতরের দিকের একটা অফিসে। গেল আর এল। অফিসের দরজা দেখিয়ে ওদেরকে যেতে বলল।

ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম পরা লাল-চুল, লম্বা একজন মানুষ বসে আছেন সেগুন কাঠের ভারি ডেস্কের ওপাশে। গমগমে গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'হারটা সম্পর্কে কি জানো?'

'এখনও কিছু জানি না, স্যার,' বিনীত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'আশা করছি, চুরির ব্যাপারে আমাদের কিছু বলবেন আপনি।'

'কেন বলব? তোমরা কে তাই তো জানি না।'

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে কার্ড বের করে দিয়ে নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর।

তাতে মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন হলো না ক্যাপ্টেনের। ওদের গুরুত্ব বাড়ল না তাঁর কাছে। সেটা বুঝে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে দিল কিশোর। ওদেরকে দেয়া রকি বীচের পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের প্রশংসা পত্র।

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে সেটা দেখলেন ক্যাপ্টেন। হাত বাড়ালেন ফোনের দিকে। চীফকে ফোন করলেন।

ওপাশের কথা শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে ভাবের পরিবর্তন হলো তাঁর। রিসিভার নামিয়ে রেখে এই প্রথম হাসলেন। 'ক্যাপ্টেন ফ্লেচার অনেক প্রশংসা করলেন তোমাদের।'

কিশোর বলল, 'তাই।'

ঘড়ি দেখলেন ক্যাপ্টেন। 'বলো, কি জানতে চাও। আমার সময় কম।'

'হারটা সম্পর্কে বলুন।'

'বলার তেমন কিছু নেই। লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা দোকান থেকে কিনেছিলাম, বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যে। ভাগ্যিস বীমা করিয়ে রাখার পরামর্শ দিয়েছিল দোকানদার। চুরি হয়েছে জানানোর সঙ্গে সঙ্গে বীমা কোম্পানি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভকে নিয়োগ করেছে হারটা খুঁজে বের করার জন্যে।' কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি, 'তোমরা কি চুরির তদন্ত করছ নাকি?'

'হ্যাঁ। আমাদের এক পরিচিত ভদ্রলোকের অনেকগুলো দামী জিনিস কাল রাতে চুরি গেছে, সব পান্নার তৈরি। ধারণা করছি সেগুলোর চোর আর আপনার হার চোর একই লোক। চোরটাকে দেখেছেন?'

'নাহ্, দেখলে কি আর পালাতে দিই। রাতের ওই সময়টায় খুব বেশি ব্যস্ত ছিলাম। জাহাজ থেকে দামী মাল খালাস করা হচ্ছিল। আমি ছিলাম সেখানে। কাজ করার জন্যে কয়েকজন নতুন শ্রমিককে নেয়া হয়েছিল। শ্রমিকের ছদ্মবেশে চোরটাও উঠে থাকতে পারে জাহাজে।'

'তা পারে। তাদের নাম-ঠিকানা লেখার ব্যবস্থা আছে আপনার জাহাজের রেজিস্টারে? খোঁজ নেয়া যাবে?'

'না। বেশি প্রয়োজন হলে বাইরের শ্রমিক ভাড়া করি আমরা। কাজ শেষ হলে পাওনা চুকিয়ে বিদেয় করে দিই। নাম-ঠিকানা লিখে রাখার প্রয়োজন পড়ে না।'

নতুন কোন তথ্য দিতে পারলেন না ক্যাপ্টেন। সাহায্য হলো না গোয়েন্দাদের। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

রকি বীচে ফিরে শিল্পকর্ম আর গহনার দোকানগুলোতে খোঁজ নিতে লাগল কিশোর, কেউ পান্নার কোন জিনিস বিক্রি করতে এনেছিল কিনা। দুই মাসের মধ্যে আনেনি কেউ, জানাল দোকানদারেরা। তবে ওদের একজন পরিচিত দোকানদার বলল, চোরাই মাল হলে ওদের কাছে আনার আগে অন্য

একজনের কাছে যাবে চোর। তার নাম হব ডিকসন। এটা গোপন তথ্য। বলার আগে অবশ্যই ওদের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিল দোকানি, এ খবর যাতে কারও কাছে ফাঁস না করে ওরা।

শহরের একধারে হব ডিকসনের অ্যানটিক শপ। ইট বের হওয়া পুরানো বিল্ডিংটার সামনে গাড়ি রাখল রবিন। বাড়িটার নিচতলা রাস্তার সমতল থেকে অনেক নিচে। সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়।

নেমে এসে দোকানের সামনে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা। উইণ্ডোতে নানা রকম অদ্ভুত জিনিস রাখা। কোনটা দামী, কোনটা সাধারণ। বোঝানো হয়েছে, সব ধরনের অ্যানটিকই পাওয়া যায় এখানে।

ওরা ঢুকতে কাঠের কাউন্টারের ওপাশ থেকে মুখ তুলল একজন ছোট্টখাটো মানুষ। ধূসর-চুল, চোখে স্টীল-রিমড চশমা। হাসিমুখে স্বাগত জানাল, 'হাল্লো, বয়েজ, কি করতে পারি তোমাদের জন্যে?'

'আপনি মিস্টার হব ডিকসন?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'হ্যাঁ। অ্যানটিক চাই? কি জিনিস?'

'কিছু কিনতে আসিনি, মিস্টার ডিকসন,' ভূমিকা না করে সরাসরি কাজের কথায় এল কিশোর। 'জানতে এলাম, কেউ কি পান্নার তৈরি কোন জিনিস বিক্রি করতে এনেছিল?'

হাসি মুছে গেল লোকটার। সেই সঙ্গে বিস্ময়ও ফুটল চেহারায়। চমকে গেছে। ঢোক গিলে সামলে নিল। জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমরা?'

কার্ড বের করে দেখাল কিশোর। পরিচয় দিল।

বলবে কি বলবে না, দ্বিধা করতে লাগল হব। শেষে কি মনে করে বলেই ফেলল, 'দামী একটা দাবার বোর্ড আর একটা হার বিক্রি করতে এসেছিল একজন।'

সামনে গলা বাড়িয়ে দিল রবিন, 'কিনেছেন?'

'না, পাগল ভেবেছ আমাকে! এত দাম চাইল, কিনে বেচব কততে? লাভ করব কি? লোকটা বলল, তার নাকি টাকার খুব ঠেকা। নইলে শখের জিনিস বেচত না।'

'লোকটা দেখতে কেমন, মিস্টার ডিকসন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ভেবে বলল হব, 'লম্বা, মধ্যবয়েসী, চোখে রিমলেস গ্লাস। হালকা রঙের স্যুট পরেছিল, মাথায় স্ট্র হ্যাট।'

রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'মিস্টার ককারের মত মনে হচ্ছে না!'

'ও, চেনো তাকে?' হব বলল। 'ভালই হলো।' পকেটে হাত ঢোকাল সে।

ছোট চেন লাগানো একটা চাবির রিঙ বের করে কাউন্টারে রাখল সে। তাতে তিনটে চাবি। 'ফেলে গিয়েছিল। ফেরত দিতে পারবে?'

প্রায় ছোঁ মেরে রিঙটা তুলে নিয়ে পকেটে ফেলল কিশোর। 'পারব।'

দোকানিকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। গাড়িতে এসে

ভঙল।

'জিনিস বেচতে ককার আসেননি,' রবিন বলল, 'নিশ্চয় তার মত দেখতে সেই লোকটা। পান্নার বোর্ড আর হার যখন নিয়ে এসেছে, আমাদের সন্দেহই ঠিক, চুরিটা একই লোকের কাজ।'

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল সে।

পকেট থেকে রিঙটা বের করল কিশোর। চাবি তিনটা দেখতে দেখতে বলল, 'দুটো চাবি ইগনিশনের। কিসের ইগনিশন, বলো তো? গাড়ি, নাকি বোটের?'

'মনে তো হচ্ছে স্পীড বোটের।'

'একটা গাড়ির। অন্যটা স্পীড বোটের হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে এটা মাস্টার কী-র মত লাগছে। যে কোন বোটের ইগনিশনে ঢোকানো যাবে। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট বোটের খবর নিয়ে লাভ নেই। তবে গাড়িটার খোঁজ করা যেতে পারে। তার জন্যে ক্যাপ্টেন ফ্লেচারের সাহায্য দরকার।'

'এখনই যাব?'

'না, পরে। আগে বাড়ি যাও।'

এগারো

ইয়ার্ডে ঢুকতেই দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের একজন, রোভারের সঙ্গে দেখা। বলল, 'এইমাত্র বেরিয়ে গেল লোকটা।'

'কোন লোক?' ভুরু কোঁচকাল কিশোর।

'তোমাকেই খুঁজতে এসেছিল। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। তোমাকে না পেয়ে নানা রকম উদ্ভট প্রশ্ন শুরু করল আমাকে। তোমাদের ব্যাপারে। যেন তোমরা একেকজন বড় বড় ক্রিমিনাল। দিয়েছি হাঁকিয়ে।'

তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওঅর্কশপে ঢুকল দু'জনে। একটা টুলের ওপর বসে পড়ে রবিন বলল, 'কে লোকটা বুঝতে পারছ কিছু?'

'মনে হয় পারছি,' জবাব দিল কিশোর। 'বীমা কোম্পানির গোয়েন্দা। ক্যাপ্টেন টমার যার কথা বললেন। দাঁড়াও, রোভারকে ডাকি। কি কি বলেছে, জিজ্ঞেস করি।'

দরজায় মুখ বের করে রোভারকে ডাকল কিশোর। সে ভেতরে এলে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কি বলল, সব খুলে বলুন তো?'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল রোভার। 'পুরানো একটা গদি ঝাড়ছিলাম। এই সময় এল সে। বয়েস বেশি না, সাতাশ-আটাশ হবে। নাম বলল মিলার প্যাটোলি।'

'হুঁ। তারপর?'

'বলল, আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আইডেনটিটি বের করে

দেখাল।'

'দেখতে কেমন?'

'লম্বাও না খাটও না। সুন্দর একটা স্যুট পরেছে। ধূসর ফেল্ট হ্যাট। দাঁতের ব্রাশের মত খাড়া খাড়া গোঁফ।'

'নকল গোঁফ না তো?' রবিনের প্রশ্ন।

'কি করে বলব?'

তাই তো, কি করে বলবে! হাত দিয়ে ছুঁয়ে না দেখলে তো আর আসল-নকল বোঝা যায় না।

আর কিছু জানার নেই। রোভারকে যেতে বলল কিশোর। পকেট থেকে চাবির রিঙটা বের করে টেবিলে রাখল। সেটার দিকে তাকিয়ে রইল চিন্তিত ভঙ্গিতে।

রবিন বলল, 'একটা চাবি মোটর বোটের ইগনিশনের। আরেকটা কোন গাড়ির। তৃতীয়টা সাধারণ দরজার তালার।'

'হুঁ,' আনমনে বলল কিশোর, 'তিনটেই যদি খুঁজে বের করা যেত, ভাল হত।'

দুপুরের খাওয়ার আগে বেরোল না ওরা।

খাওয়া শেষে বেরোল। চলে এল থানায়। চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে অফিসে পাওয়া গেল। চাবিগুলোর কথা বলল তাঁকে কিশোর।

পুলিশের ফাইলে সব রকম গাড়ি আর মোটর বোটের ইগনিশনের চাবির ফটোগ্রাফ আছে। একজন অফিসারকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন চীফ।

দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল অফিসার। উত্তেজিত। বলল, 'স্যার, গাড়িটা একটা বড় মেটিওর স্পেশাল! মনে হয় যে কালো গাড়িটাকে খুঁজছি আমরা, সেটাই।'

কিশোর বলল, 'এই গাড়ি এ শহরে অত বেশি নেই। এখন বের করতে হবে, ক'টা গাড়ি আছে, তার মধ্যে কোনটা কালো, এবং মালিক কে।'

'সেটা জানা কঠিন হবে না,' ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন চীফ। 'স্টেট মোটর ভেহিকল ব্যুরোকে জিজ্ঞেস করলেই হবে।'

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে রেখেই প্যাড আর কলম টেনে নিলেন তিনি। ওপাশের কথা শুনে শুনে এক, দুই করে সিরিয়াল নম্বর দিয়ে লিখতে শুরু করলেন।

কয়েক মিনিট পর রিসিভার নামিয়ে রেখে প্যাড থেকে পাতাটা ছিঁড়ে কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নাও। মোটর ভেহিকল অফিস থেকে আটটা মেটিওর স্পেশালের রেজিস্ট্রেশন নেয়া হয়েছে। নাম-ঠিকানা লিখে দিলাম।'

আগ্রহের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে কাগজটা টেনে নিল কিশোর। প্রথম নামটা পড়ল: জেরিল কাস্টার। হাসি ফুটল মুখে। উঠে দাঁড়িয়ে রবিনকে বলল, 'এসো, যাই।'

সাহায্যের জন্যে চীফকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে।

'প্রথমে কোথায় যাবে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'এক নম্বরটা থেকেই শুরু করব,' কোন ঠিকানায় যেতে হবে বলল কিশোর। 'এক এক করে সন্দেহ কাটাব, আর সন্দেহভাজনদের নাম ছাঁটাই করব।'

রকি বীচের রেসিডেনশিয়াল এরিয়ায় অনেক বড় একটা বাড়িতে থাকেন জেরিল কাস্টার। গেটের ভেতরে ঢুকে ড্রাইভওয়ে ধরে কিছুদূর এগোনোর পর গাড়ি রাখল রবিন। দু'জনে নেমে হেঁটে চলল।

হঠাৎ কিশোরের হাত খামচে ধরল রবিন। 'কিশোর, দেখো!'

গ্যারেজের দিকে তাকাল কিশোরও। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে চকচকে নতুন মেটিওর স্পেশাল গাড়িটা।

বাগানে রকিং চেয়ারে বসে আছেন হাসিখুশি এক বৃদ্ধ।

এগিয়ে গেল গোয়েন্দারা।

'গুড আফটারনুন, বয়েজ,' হেসে বললেন বৃদ্ধ, 'খুব গরম পড়েছে, না!'

'হ্যাঁ,' বিনয়ের অবতার সেজে গেল কিশোর। 'আপনি কি মিস্টার কাস্টার, স্যার?'

'নিশ্চয়,' কাস্টারের শরীর খুবই হালকা-পাতলা, কিন্তু তাঁর হালকা নীল চোখের তারা উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত। 'গত উনআশি বছর ধ[illegible] জেরিল কাস্টার হয়ে বেঁচে আছি আমি। এর জন্যে দুঃখ নেই। তরুণ ব[illegible] অবশ্য অন্য কিছু হতে ইচ্ছে করত, বিখ্যাত কোন চরিত্র...'

'জেরিল!' সদর দরজার ওপাশ থেকে ডাক শোনা গে[illegible]ল। 'কার সঙ্গে কথা বলছ?' বেরিয়ে এলেন ছোটখাট একজন মহিলা। মাথা[illegible] সব চুল সাদা। দুই গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি কথা বলছ?'

বিনীত গলায় জবাব দিল কিশোর, 'আপনাদের গাড়িটার কথা জানতে এসেছি।'

'ভাল করেছ,' কাস্টার বললেন। 'তবে ওটাতে চড়তে চেয়ো না, আমাকে চালাতে বোলো না। বাপরে বাপ! তারচেয়ে একপাল পাগলা ঘোড়াকে গাড়িতে জুতে চালানো অনেক সহজ!'

গর্বিত ভঙ্গিতে মিসেস কাস্টার বললেন, 'আমি কিন্তু চালাতে পারি।'

'গাড়িটা কেমন লাগে আপনার?' জানতে চাইল রবিন।

'দারুণ! দুর্দান্ত! যেমন আরাম তেমনি গতি। স্পীডওলা গাড়ি ভাল লাগে আমার।'

বৃদ্ধ এই দম্পতির সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে কিশোরের। 'অনেক চালান মনে হয়?'

'না, তেমন আর সুযোগ পাই কোথায়। বাজার করতে যাই, আর গির্জায় যাই। বাড়ি ছেড়ে বেশি দূর যেতে আর ইচ্ছে করে না আজকাল।'

'যেটুকু যাই, তাই যথেষ্ট,' কাস্টার বললেন। 'ওর সঙ্গে গাড়িতে উঠলে

সারাক্ষণ একটা দোয়াই করি, ঈশ্বর, অ্যাক্সিডেন্ট তো হবেই জানি—দয়া করে পঙ্গু বানিয়ে ভুগিয়ো না আমাকে, মেরে ফেলো!'

রবিন আর কিশোর, দু'জনেই হাসতে লাগল। বুঝল, এই গাড়িটার খোঁজে আসেনি ওরা।

কিশোর বলল, 'আপনাদের সময় নষ্ট করলাম। ইদানীং মেটিওর স্পেশালের প্রতি আগ্রহ জেগেছে আমাদের। তাই জানতে এসেছিলাম, কেমন গাড়ি।'

ফিরে এসে গাড়িতে উঠল দুই গোয়েন্দা।

রবিন বসল ড্রাইভিং সীটে।

তালিকাটার দিকে তাকাল কিশোর, 'একজন বাদ। বাকি রইল সাত। একসঙ্গে না গিয়ে ভাগাভাগি হয়ে খোঁজা উচিত আমাদের, তাহলে তাড়াতাড়ি হবে।'

'কি করবে?'

'বাড়ি চলো। চাচার ভাঙা গাড়িটা নেব। তুমি একদিকে যাবে, আমি একদিকে।'

বারো

সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে ইয়ার্ডে ফিরল দু'জনে। সবগুলো গাড়িই দেখে এসেছে। তবে কোনটার মালিকই দেখতে ককারের মত নয়।

'একটাই জবাব হতে পারে এর,' কিশোর বলল। 'গাড়িটা এই এলাকার নয়। অন্য কোনখান থেকে আনা হয়েছে। চোরাই নম্বর প্লেট ব্যবহার করে থাকলেও অবাক হব না।'

'কিন্তু গাড়িটা আছে কোথায় এখন?'

জবাব মিলল না। সে রাতে জবাব না জেনেই ঘুমাতে যেতে হলো ওদের।

পরদিন সকালে কিশোর নাশ্তা সেরে ওঅর্কশপে এসে ঢুকেছে কেবল, এই সময় এল মুসা। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে টুলে বসতে বসতে বলল, 'পালিয়েছি, বুঝলে, আর পারব না। কাজ অনেক করেছি।'

'গোয়েন্দাগিরি করবে তো? নাকি সেটাও বন্ধ?'

'উপযুক্ত খাবার পেলে করতে আপত্তি নেই,' হেসে জবাব দিল মুসা।

এই সময় রবিন এল।

কেসটার অনেক কিছুই এখনও মুসার অজানা। তাকে জানানো হলো।

'খাইছে!' মুসা বলল। 'এ তো সাংঘাতিক জটিল! কোন সূত্রই নেই! কি করে কি করবে?'

'মেটিওর স্পেশালটা খুঁজতে হবে। আর কোন পথ নেই,' কিশোর

বলল।

'তো, এখন কি খুঁজতে বেরোবে?'

'এখন মিস্টার ককারের সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

ককারের ব্যাংকে তাঁর অফিসে দেখা করল তিন গোয়েন্দা।

ওদের সন্দেহের কথা শুনে খেপে গেলেন ব্যাংকার, 'কি, আমার বাড়িটাকে চোরাই মাল পাচারের স্টেশন বানিয়েছে! ধরতে পারলে ঘাড় মটকাব! হুমকি দিয়েছে কেন বুঝলাম। ভয় দেখিয়ে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে, যাতে নিরাপদে শয়তানি চালিয়ে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তবে কি করে নোটগুলো গুপ্তঘরে ফেলে এসেছে, সেই রহস্যটা জানা হয়নি এখনও।'

'তা বটে। আর কি কি জেনেছ তোমরা?'

জাহাজের কেবিন থেকে ক্যাপ্টেন টমারের পান্নার হার চুরির ঘটনা বলে কিশোর বলল, 'মনে হচ্ছে ডুডলি হ্যারিসের হারও চুরি করেছে একই চোর।'

ছেলেদের অবাক করে দিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন ককার, 'আমার তা মনে হয় না! হ্যালুসিনেশনে ভুগছে হ্যারিস। কোন জিনিস চুরি যায়নি তার। একটা বানানো গল্প বলে দিয়েছে।'

কথা বললে সময় নষ্ট। ব্যাংকারের সময় আর নষ্ট করল না গোয়েন্দারা। নতুন কিছু ঘটলে, কিংবা তথ্য পেলে তাঁকে জানাবে বলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল। শেষ মুহূর্তে ডুপ্লিকেট চাবিটার কথা জিজ্ঞেস করল কিশোর। লজ্জিত হয়ে ব্যাংকার বললেন, আবার ভুলে গেছেন। খুব তাড়াতাড়িই বানিয়ে দেবেন, বলে দিলেন।

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল ছেলেরা। রবিন বীচে ফিরে চলল।

হ্যারিসের ব্যাপারে ককারের মন্তব্যটা নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল।

'কিশোর, কি মনে হয় তোমার?' প্রশ্ন করল মুসা, 'সত্যি কি জিনিস চুরি গেছে হ্যারিসের?'

'গেছে। ককার এখনও রেগে আছেন তাঁর ওপর, তাই মানতে চাইছেন না। এগুলো তাঁর রাগের কথা। তবে হ্যারিসের সঙ্গে আরেকবার দেখা করতে অসুবিধে নেই আমাদের।'

হঠাৎ করে লক্ষ করল কিশোর, মুসার আগ্রহ অন্য দিকে সরে গেছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল কিশোর।

জবাব না দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'রবিন, অত জোরে চালিয়ো না! ঠিক জায়গায় থামাতে পারবে না তো!'

'কোথায় থামাব?'

'ওই যে মিল্ক বারটার কাছে। সানডি খুব ভাল বানায় ওরা—প্রচুর মাখন, চেরি আর বাদাম মেশায়। নামটাও দিয়েছে দারুণ, বিগলু ইগলু। রাখো রাখো, গাড়ি রাখো। লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। আগেই বলে রাখি, পয়সাটা তোমাদের কারও দিতে হবে। তাড়াহুড়া করে বাড়ি থেকে পালিয়েছি, টাকা

নিতে ভুলে গেছি।'

হেসে ফেলল কিশোর। বলল, 'গাড়ি রাখো, রবিন, এই পেটুককে নিয়ে আর পারা গেল না।'

সাদা ছোট বাড়িটার সামনে গাড়ি রাখল রবিন।

শীঘ্রি ভেতরের একটা টেবিল ঘিরে বসল ওরা।

ওয়েইট্রেস এসে দাঁড়ালে অর্ডার দিল মুসা, 'চারটে বড় সাইজের বিগলু ইগলু।'

'কিন্তু লোক তো তোমরা তিনজন?'

'তাতে তোমার কি? চারটে বলেছি, চারটে, ব্যস! দিতে অসুবিধে আছে?'

'না না, অসুবিধে কি?' চলে গেল ওয়েইট্রেস।

লাঞ্চ আওয়ার এখন। ভিড়। প্রায় সব টেবিলেই লোক আছে। গুঞ্জন চলছে। মাথার ওপরের একাধিক অদৃশ্য স্পীকারে মৃদু শব্দে বাজছে রক মিউজিক। সব কিছু ছাপিয়ে হঠাৎ পেছন থেকে একটা কথা কানে এল কিশোরের, '*...ঘড়ির সাহায্যে সারা হবে কাজটা!*'

তেরো

ঘড়ির কথা শুনেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। কে বলছে দেখার জন্যে ঘুরতে গেল। খাবারের ট্রে নিয়ে তার একেবারে কাছে চলে এসেছিল ওয়েইট্রেস, হাতের ধাক্কায় উল্টে পড়ল ট্রে-টা। ঝনঝন করে ভাঙল কাচের বড় বড় পেয়ালাগুলো। মেঝেতে ছড়িয়ে গেল মুসার অত সাধের বিগলু ইগলু।

একটা মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল গুঞ্জন। পরক্ষণেই স্বাভাবিক হয়ে গেল। হাত থেকে খাবারের প্লেট পড়ে ভাঙাটা নতুন কিছু না।

দু'জন লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। হাঁটার সময় কথা বলছিল ওরা, কিশোরের কানে এসেছে। ওদের দেখিয়ে চিৎকার করে উঠল সে, 'মুসা, ওদের ধরতে হবে! জলদি এসো!'

আবার শুরু হলো গুঞ্জন। এইবার বিস্মিত হলো শ্রোতারা। তবে তাদের তোয়াক্কা করল না কিশোর। দৌড় দিল লোক দু'জনের পেছনে।

চিৎকার শুনে লোকগুলোও ফিরে তাকিয়েছে। একটা মুহূর্ত দেখল তিন গোয়েন্দাকে। তারপর ওরাও ছুটতে শুরু করল।

গোয়েন্দারা বাইরে বেরিয়ে দেখল, একটা কালো গাড়িতে উঠে পড়ছে ওরা।

ছেড়ে দিল গাড়িটা। বকি বীচের দিকে চলে গেল।

'লম্বা লোকটাকে দেখলে!' ছুটতে ছুটতে বলল কিশোর। 'শরীর-স্বাস্থ্য একেবারেই কংকালের মত!'

রবিনের ফোক্স ওয়াগেন নিয়ে এসেছে ওরা। ড্রাইভিং সীটে বসল মুসা। অন্য দু'জন উঠে দরজা বন্ধ করতে না করতেই গাড়ি ছেড়ে দিল সে। পিছু নিল কালো গাড়িটার।

পাকা রাস্তায় টায়ারের কর্কশ আর্তনাদ তুলে রবারের অনেকখানি ছাল-চামড়া রেখে যখন মোড় ঘোরাল সে, অনেক দূরে চলে গেছে তখন সামনের গাড়িটা। এক্সিলারেটর যতটা যায়, চেপে ধরল মুসা।

প্রচণ্ড শব্দ করতে লাগল পুরানো ইঞ্জিন। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ার হুমকি দিচ্ছে যেন। কেয়ারই করল না মুসা।

'মেটিওর স্পেশাল হলে ধরতে পারবে না,' কিশোর বলল। 'পাত্তাই পাবে না।'

'দেখা যাক,' মুসা বলল।

উঁচু হতে লাগল হাইওয়ে। সামনে হঠাৎ করে নেমে গেছে। তারপরে মোড়। কালো গাড়িটা একবার চোখে পড়ছে, একবার অদৃশ্য। হাল ছাড়ল না মুসা। আঠার মত লেগে রইল পেছনে।

রকি বীচের কাছাকাছি পৌঁছল ওরা।

সামনের দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'ম্যানিলা রোডের দিকে যাচ্ছে মনে হয়?'

তার ধারণাই ঠিক। সেই পথই ধরল সামনের কালো গাড়িটা।

মোড় আর বনজঙ্গল এদিকটায় বেশি। চোখের আড়ালে চলে গেল গাড়িটা।

রিভেরা এস্টেট চোখে পড়ল। গেট দেখা গেল। কিন্তু গাড়িটাকে আর দেখা গেল না। উধাও হয়ে গেছে।

গেট বন্ধ। ভেতরেও নেই গাড়িটা।

'থেমো না,' কিশোর বলল। 'এগিয়ে যাও।'

কিন্তু পুরো রাস্তাটা পার হয়ে এসেও আর দেখল না গাড়িটাকে।

'গেল!' হতাশ ভঙ্গিতে সীটে হেলান দিল কিশোর।

'তোমার এত কষ্ট কাজে লাগল না,' মুসাকে বলল রবিন।

গাড়ি থামিয়ে দিল মুসা। ফিরে তাকিয়ে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'কি করব?'

'ডুডলি হ্যারিসের সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

ওই রোডেই তাঁর বাড়ি, জানা আছে মুসার। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আবার চালাল।

সাগরের দিকে মুখ করা পাহাড়ের ঢালে তৈরি পাথরের বাড়িটা চোখে পড়ল। বিশাল দুটো টাওয়ার, পাথরের দেয়াল আর আদিম চেহারা পুরানো আমলের দুর্গের রূপ দিয়েছে বাড়িটাকে। নিজের সীমানা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়েছেন হ্যারিস। গেটে তালা নেই।

ড্রাইভওয়েতে গাড়ি ঢোকাল মুসা।

ঘণ্টা শুনে বেরিয়ে এলেন হ্যারিস। গম্ভীর হয়ে ছিলেন। তিন গোয়েন্দাকে

দেখে উজ্জ্বল হলো চেহারা। ডেকে নিয়ে গেলেন লিভিং রুমে।

বেশি ভূমিকা না করে বললেন, 'দেখো, আমি তোমাদের সাহায্য চাই। আমার জিনিসগুলো খুঁজে বের করে দাও, আমি তোমাদের পুরস্কৃত করব।'

'তারমানে চুরির কেসটা আমাদের নিতে বলছেন আপনি?' রবিন বলল।

'অনেক জটিল কেসের সমাধান করেছ তোমরা, পুলিশও হিমশিম খেয়ে গিয়েছিল যেগুলো নিয়ে। আমার পান্নাগুলো যদি কেউ বের করে আনতে পারে, তোমরাই পারবে...'

কিশোরের দিকে চোখ পড়তে থেমে গেলেন তিনি।

তাঁর দিকে নজর নেই কিশোরের। উঠে দাঁড়াচ্ছে। নজর বাগানের দিকের একটা জানালায়।

জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কি? কিছু দেখেছ নাকি?'

ফিসফিস করে জবাব দিল কিশোর, 'আড়ি পেতে আছে কেউ, আমাদের কথা শুনছে!'

পেছনের দরজার দিকে ছুটল সে। ওদিক দিয়ে বেরিয়ে ঘুরে বাগানে চলে যাবে। পেছন থেকে ধরার চেষ্টা করবে লোকটাকে।

চোদ্দ

তাকে দেখে ফেলল লোকটা। কিংবা কিছু টের পেয়ে গেল। পাতা-বাহারের বেড়া পার হয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটল পেছনের সীমানার দিকে। গায়ে বাদামী রঙের স্পোর্টস জ্যাকেট। ছুটতে গিয়ে ঝাঁকি লেগে কোণগুলো লাফাচ্ছে। বানরের দক্ষতায় কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে চলে গেল ওপাশের রাস্তায়। ফিরে তাকাল একবার। দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ

মুসা আর রবিনও ততক্ষণে বেরিয়ে চলে এসেছে।

তিনজনেই ছুটল বেড়ার দিকে।

বেড়ার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল ওরা। ফাঁক দিয়ে রাস্তার এ পাশ ওপাশ দেখল কিশোর। অবাক হয়ে গেল। নেই লোকটা। গেল কোথায় এত তাড়াতাড়ি?

নীল জ্যাকেট পরা আরেকজন লোক রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে নতুন তৈরি হওয়া দুটো বড় বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।

ডাকল তাকে কিশোর, 'এই যে, শুনছেন?...একজন লোককে দেখেছেন এদিকে, বড় বড় দাড়ি!'

'ওই তো, ওই বাড়িগুলোর মাঝখানে ঢুকে গেল,' জবাব দিল লোকটা 'তাড়া করেছিলে নাকি? চোর?'

জবাব দিল না কিশোর। গেট কাছেই। সেদিকে ছুটল। গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে দৌড় দিল বাড়িগুলোর দিকে। কিন্তু বাদামী জ্যাকেট-ওয়ালা

লোকটাকে দেখতে পেল না আর।

বাড়িগুলোর ওপাশের রাস্তায় খুঁজতে গেল কিশোর। আশপাশে লুকানোর সম্ভাব্য যত জায়গা দেখল, সব খুঁজে দেখতে লাগল মুসা আর রবিন।

পেল না লোকটাকে। গায়েব হয়ে গেছে।

একসঙ্গে ডুডলির বাড়িতে ফিরে চলল তিনজনে।

রাস্তায় এসে নীল জ্যাকেট পরা লোকটাকেও দেখতে পেল না।

'এই লোকটা সত্যি বলেছে তো আমাদের?' মুসার প্রশ্ন।

পেছনের বাগানে ওদের জন্য অপেক্ষা করছেন হ্যারিস।

কাছে এসে মাথা নেড়ে কিশোর জানাল, 'পেলাম না ওকে। তবে আপনার কেস আমরা নিলাম। পান্নাগুলো খুঁজে বের করে দেব।'

পরদিন সকাল দশটায় থানায় চলল কিশোর আর রবিন। মুসা আসেনি। পালাতে পারেনি আজ। মা আটকে দিয়েছেন। চীফের সঙ্গে কথা বলে জানতে চায় কিশোর, বন্দরের চুরি রহস্যের সুরাহা হলো কিনা, কিংবা নতুন তথ্য পাওয়া গেল কিনা।

কড়া রোদ উঠেছে। গরম পড়ছে খুব। দোকানের ডিসপ্লে উইণ্ডোগুলোতে যেগুলোতে রোদ এসে পড়ে হয় সেগুলোতে শাটার টেনে দেয়া, নয়তো মোটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে।

'কিশোর, দেখো!' স্ট্র হ্যাট পরা লম্বা একজন লোকের দিকে আঙুল তুলল রবিন। ওদের দিকে পেছন করে রাস্তার ধারের একটা দোকানের উইণ্ডোর দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। 'অ্যালেক্স ককার, না সেই লোকটা? ককার হলে এ সময়ে ব্যাংক ফেলে এখানে কি করছেন?'

'চলো, জিজ্ঞেস করি।'

রাস্তা পার হয়ে এল ওরা।

পেছন থেকে মৃদু গলায় ডাকল কিশোর, 'মিস্টার ককার!'

ঘুরে তাকাল লোকটা।

এক পা পিছিয়ে এল কিশোর। লোকটা ককার নয়।

'কি চাই?' কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'হ্যারিসের পান্নাগুলো আপনিই সরিয়েছেন, তাই না?' ফস করে বলে বসল রবিন। বলেই বুঝল, এ ভাবে জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হয়নি।

'কিসের পান্না? কি বলছ! তোমাদের আমি চিনি না। কথাবার্তা সাবধানে বলবে বলে দিলাম। নইলে পুলিশ ডাকব।'

ধাক্কা দিয়ে ছেলেদের সরিয়ে, কয়েকজন ফেরিওয়ালাকে ঠেলে প্রায় ছুটে গিয়ে মোড়ের কাছে দাঁড়ানো একটা কালো গাড়িতে উঠে পড়ল লোকটা। চোখের পলকে মিশে গেল যানবাহনের ভিড়ে।

'ওকে যেতে দিলাম কেন?' নিজের ওপরই খেপে গেল রবিন।

'আর কোন উপায় ছিল না বলে,' কিশোর বলল। 'চোর চোর বলে চিৎকার করেও লাভ হত না, ও-ই যে চুরি করেছে কোন প্রমাণ নেই আমাদের হাতে। যাই হোক, গাড়িটার নম্বর দেখেছি। ফ্লেচারকে বলব।'

'মেটিওর নয়। যদ্দূর মনে হয়, গতকাল এই গাড়িটাকেই ফলো করেছিলাম। মুসা থাকলে বলতে পারত।'
যেদিকে যাচ্ছিল, আবার রওনা হলো ওরা।

'হুঁ, তাহলে চোরটাকে দেখে এসেছ,' সব শুনে মাথা দুলিয়ে বললেন চীফ। 'নাম্বারটা বলো।'
কিশোর বলল, লিখে নিলেন চীফ। অফিসারকে ডাকলেন।
খোঁজ পাওয়া গেল গাড়িটার। রকি বীচেরই রেজিস্ট্রেশন, জনৈক ডেভিড কুপারের নামে। ফোন করে পাওয়া গেল সেই লোককে। থানা থেকে করা হয়েছে শুনে বলল, তার গাড়িটা চুরি গেছে। পুলিশকে খবর দেয়ার কথা ভাবছিল সে।
'দয়া করে একবার আসতে পারেন থানায়, মিস্টার কুপার?' অনুরোধ করলেন চীফ। 'সামনাসামনি সব শুনতে পারলে ভাল হয়। আপনার গাড়িটা খুঁজে বের করার ব্যবস্থা করতে পারি। নাকি আমরাই আসব?'
'না না, দরকার নেই, আমিই আসছি,' কুপার বলল।

পনেরো

আধঘণ্টা পর একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে অফিসে ঢুকল সম্ভ্রান্ত পোশাক পরা, মাঝবয়েসী, হালকা-পাতলা এক লোক। তাকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল অফিসার। নিজের পরিচয় দিল লোকটা, ডেভিড কুপার।
কিশোর আর রবিনের চেনা শত্রু হয়ে যেতে পারে ভেবে ফাইল র‍্যাকের আড়ালে ওদের লুকিয়ে পড়তে বললেন চীফ। ওখান থেকে উঁকি মেরে দেখতেও পারবে ওরা, কথাও শুনতে পাবে।
পরিচয় আর হাত মেলানোর পর বললেন চীফ, 'হ্যাঁ, গাড়িটার কথা বলুন, মিস্টার কুপার। কোথায় রাখতেন?'
'অবশ্যই গ্যারেজে।'
কিশোর দেখল, চীফের দিকে মুখ করে থাকলেও চোখজোড়া অস্থির হয়ে এদিক ওদিক ঘুরছে লোকটার।
'গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়ে গেল? চোরটার সাহস আছে বলতে হবে।'
'গ্যারেজ থেকে চুরি যায়নি। বাড়ির সামনে রাস্তার মোড়ে রেখেছিলাম, ওখান থেকে নিয়ে গেছে।'
'কবে? কাল রাতে?'
'অ্যাঁ!...হ্যাঁ, কাল রাতে।'
'হুঁ,' লোকটার চোখের দিকে তাকালেন চীফ, 'কাল রাতে? নিশ্চয় খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন?'

চোখ সরিয়ে নিল কুপার। 'অ্যাঁ!...হ্যাঁ, তা তো বটেই...দুশ্চিন্তাই তো হবার কথা, তাই না? সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর যখন জানতে পারলাম গাড়িটা নেই, তখন থেকেই দুশ্চিন্তা শুরু হয়েছে।'

'সকালে কটায় ওঠেন ঘুম থেকে?'

'সাতটা।'

'ওই সময় দেখলেন গাড়িটা চুরি গেছে? আপনাকে ফোন করেছি সাড়ে দশটায়। তারমানে চুরি গেছে জানার পরেও সাড়ে তিন ঘণ্টা পার করে দিয়েছেন, পুলিশকে খবর দেননি, আবার বলছেন খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।'

'আ-আমি... তখন বুঝতেই পারিনি গাড়িটা চুরি গেছে!' চোখ মিটমিট করতে লাগল কুপার। কথা খুঁজে পাচ্ছে না যেন। হঠাৎ করেই রেগে উঠল, 'এমন জেরা শুরু করেছেন যেন আমি একটা ক্রিমিনাল!'

'কিছু মনে করবেন না, মিস্টার কুপার, আপনার আচরণই এ ভাবে কথা বলতে বাধ্য করছে আমাকে।'

'কি দেখলেন আমার আচরণের মধ্যে?' খেঁকিয়ে উঠল কুপার।

'আস্তে কথা বলুন। কি আচরণ করছেন, সেটা আপনিও বুঝতে পারছেন। যাকগে, গাড়ি চুরির রিপোর্ট করতে এসেছিলেন, করা হয়েছে। আপনি এখন যেতে পারেন। গাড়ির খোঁজ পেলে আপনাকে জানানো হবে।'

কুপার চলে যাওয়ার পর বেরিয়ে এল কিশোর আর রবিন।

'এত নার্ভাস কেন লোকটা?' চীফের দিকে তাকাল রবিন। 'কথা বলতেই কেমন করছিল!'

'মিথ্যে কথা বলতে গেলে আর কি করবে,' চীফ বললেন। 'ওর ওপর নজর রাখতে হবে। যেই পা ফসকাবে, অমনি ক্যাঁক করে ধরব।'

ইয়ার্ডে ফিরে দেখল ওরা টেলিফোনে কথা বলছেন মেরিচাচী। ওদের দেখেই বললেন, 'মুসা, ওরা এসে গেছে। কথা বলতে পারো। তবে আগেই বলে দিচ্ছি, আজ বিকেলে কোথাও আর বেরোতে পারবে না কিশোর। আমাদের বাড়ির ঘাস এত বড় হয়ে গেছে, গরু চরানো যাবে। তোমার আংকেল গেছে বোরিস আর রোভারকে নিয়ে মাল কিনতে। সুতরাং কিশোরকে বেরোতে দেয়া যাবে না।'

কিশোরের হাসি হাসি মুখটা কালো হয়ে গেছে হঠাৎ। কেন, বুঝতে পারলেন চাচী। ফোনটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'নে, কথা বল। তবে বেরোনোর চিন্তা করবি না বলে দিলাম আগেই।'

সারাটা বিকেল আর বেরোনো হলো না। সন্ধ্যার আলোও যখন নিভে এল, তখন কাজ শেষ করে, হাতমুখ ধুয়ে, চা খেয়ে নিল কিশোর। রাস্তার আলোগুলো জ্বলেছে। গেটের দিকে এগোতে যাবে সে, ঘ্যাঁচ করে এসে থামল একটা পুরানো গাড়ি। জানালা দিয়ে মুখ বের করল মুসা আর রবিন। এই সময়ই আসতে বলেছে ওদেরকে কিশোর।

'কোথায় যাব?' কিশোর গাড়িতে উঠলে জানতে চাইল মুসা।

'রিঙের তিন নম্বর চাবিটার ওপর গবেষণা চালাব আজ,' কিশোর বলল। 'আমার বিশ্বাস, এটা রিভেরা হাউসের কোন দরজার তালার।'

রিভেরা হাউস থেকে বেশ খানিকটা দূরে ম্যানিলা রোডের ধারে গাড়ি রাখল মুসা। পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেছে তখন। বাকি পথটা হেঁটে এল ওরা। এগোল দেয়ালের ধার ঘেঁষে। গেট খোলা। নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

তারাখচিত আকাশের পটভূমিতে আবছা অন্ধকার একটা ভূতুড়ে ছায়ার মত মাথা তুলে আছে বাড়িটা। চাঁদ ওঠেনি এখনও। পা টিপে টিপে গিয়ে বারান্দায় উঠল কিশোর।

তালায় চাবি ঢুকিয়ে কয়েকবার মোচড় দিয়েও খুলতে পারল না। ফিরে তাকিয়ে বন্ধুদের জানাল, 'লাগছে না। পেছনে চলো।'

কিন্তু পেছনের দরজায়ও লাগল না চাবিটা।

'সেলারের ঢাকনার না তো?' রবিন বলল।

সেদিকেই চলল ওরা।

তালায় চাবি ঢোকাল কিশোর। মোচড় দিতেই ঘুরে গেল। খুলে গেল তালা। 'লেগেছে!' উত্তেজিত হয়ে বলল সে।

ভারি ঢাকনাটা খুলল ওরা। সিঁড়ি নেমে গেছে মাটির নিচের ঘরে। সেই সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে নেমে চলল ওরা নিচের অন্ধকারে।

টর্চ আছে সঙ্গে, কিন্তু জ্বালতে সাহস করল না। এই অন্ধকারে জ্বাললে ওপরের ফোকর দিয়ে আলো বেরোবে, অনেক দূর থেকেও দেখা যাবে সেটা। আশেপাশে কেউ থাকলে দেখে ফেলবে।

সেঁতসেঁতে ঘর, ভাপসা গন্ধ বেরোচ্ছে। ভ্যাম্পায়ারের কথা মনে পড়ে গেল মুসার। গায়ে কাঁটা দিল তার। অদ্ভুত এক অনুভূতি। মনে হচ্ছে, আড়াল থেকে কেউ নজর রাখছে তার ওপর। অন্য দু'জনের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এল সে। হঠাৎ এক চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে একপাশে সরে গেল। পরক্ষণেই ধুড়ুম-ধাড়ুম করে পতনের শব্দ।

কোমরে ঝোলানো টর্চের সুইচ টিপে দিল কিশোর।

আলোক রশ্মি ঘুরে গিয়ে পড়ল মুসার মুখে। কতগুলো কাঠের বাক্সের মধ্যে প্রায় ডুবে রয়েছে সে। চোখে আতঙ্ক। ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল, 'কি-কি যেন একটা…নরম…চলে গেল আমার পায়ের ওপর দিয়ে! বাদুড়ের নখের মত স্পর্শ…'

'ওই যে তোমার বাদুড়,' টর্চের আলো নেড়ে এককোণে দেখাল রবিন।

অনেক বড় একটা ইঁদুরকে কুঁজো হয়ে থাকতে দেখা গেল। মুসার চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে।

গায়ে আলো পড়তে গুটিগুটি একপাশে সরে গেল ওটা।

মুসাকে উঠতে সাহায্য করল রবিন আর কিশোর।

এখনও গা কাঁপছে মুসার। কিশোরের পিছু পিছু চুপচাপ এগোল আরেকটা সিঁড়ির দিকে।

শব্দটা তার কানেই আগে ঢুকল। দাঁড়িয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ওপরতলায় কেউ আছে!'

কথা শোনা গেল। মেঝেতে বসানো কাঠের ঢাকনা তোলার শব্দ হলো।

'চোর হলে কেয়ার করি না,' ঢোক গিলল মুসা, 'কিন্তু অন্য কিছু হলে...'

তাকে কথা শেষ করতে দিল না রবিন। 'চলো, দেখি।'

সিঁড়ির মাথার দরজাটায় তালা দেয়া।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। বলল, 'আমরা ঢুকতে না পারলেও ওদেরকে বের করে আনতে পারি। চেঁচাও। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করো। বেরোতে বাধ্য হবে ব্যাটারা।'

চেঁচাতে শুরু করল তিনজনে। সেই সঙ্গে থাবা আর কিল মারতে লাগল দরজায়। মিনিটখানেক পরেই দরজার ওপাশ থেকে জোরে জোরে কথা শোনা গেল, 'অ্যাই, কে, বলো তো! নিশ্চয় পুলিশ! পালাও! জলদি পালাও!'

ভারি পায়ের শব্দ ছুটে গেল ঘরের অন্য প্রান্তে।

চিৎকার করতে করতে গোয়েন্দারাও নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। বাইরে বেরোনোর সিঁড়িটা বেয়ে আবার উঠতে লাগল। বেরিয়ে এল সেলারের মুখে।

ওরাও বেরোল, এমন সময় জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল দুটো ছায়ামূর্তি। নদীর দিকে দৌড় দিল।

'ধরো ব্যাটাদের!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

ভূতের ভয়ের নামমাত্রও নেই আর মুসার মধ্যে। ছুটল লোকগুলোর পেছনে। তবে বনের ভেতরের পথ তার অচেনা, লোকগুলোর চেনা। ফলে গাছপালার আড়ালে ছোটার সময় ওরা সুবিধে বেশি পেল। পিছিয়ে পড়তে লাগল সে।

রবিনকে নিয়ে কিশোর ছুটল সোজা নদীর দিকে। বোটটোট থাকলে সেটা আটকানোর ইচ্ছে। বন থেকে বেরিয়ে এসে দেখল পানির ধারে বাঁধা রয়েছে একটা মোটর বোট।

'এখনও বেরোয়নি ওরা,' কিশোর বলল। 'নেমে গিয়ে...'

তার কথা শেষ হলো না। পেছন থেকে থাবা পড়ল হাতে। টর্চটা উড়ে গিয়ে পড়ল মাটিতে, নিভে গেল। বাল্ব ভেঙে গেছে বোধহয়। বাধা দেয়ার সুযোগ পেল না ওরা। কানের কাছে চেপে ধরা হলো পিস্তল। হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে দেয়া হলো। তারপর বয়ে নিয়ে গিয়ে তোলা হলো বোটে।

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল কে যেন। গর্জে উঠল ইঞ্জিন।

চলতে শুরু করল বোট।

মুখ ঘুরিয়ে কিশোর আর রবিন দেখল, ডানে কালো তীরের সঙ্গে ওদের দূরত্ব বাড়ছে। বুঝতে পারল উজানের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদের। দু'জন লোক রয়েছে কাছাকাছি। এরাই ওদের ধরেছে। একজন লম্বা। অন্যজন বেঁটে, গাট্টাগোট্টা। হাল ধরেছে সে।

'এদের নিয়ে গিয়ে কি করব?' সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল লম্বা লোকটা।

'দেব পানিতে ফেলে।'

ষোলো

হাত-পা বেঁধে বোটের তলায় ফেলে রাখা হয়েছে দু'জনকে। অন্ধকার নদী ধরে যেন যুগ যুগ ধরে ছুটছে ওরা। রক্ত চলাচল ব্যাহত হওয়ায় অবশ হয়ে গেছে হাতের আঙুল। বোটের মাঝামাঝি অংশে একটা সীটে বসে ওদের পাহারা দিচ্ছে লম্বা লোকটা। তর্ক করছে বেঁটে সঙ্গীর সঙ্গে।

'পানিতে ফেললে কি ঘটবে আন্দাজ করতে পারো?' লম্বু বলল। 'কিডন্যাপ করাটাই বিরাট অপরাধ, ভিক, তারপর খুন...'

'থামো, ভীতু কোথাকার!' খেঁকিয়ে উঠল বাঁটুল। 'ব্রুনো, তোমার যে কবুতরের কলজে, জানতাম না। এখানেই কোথাও ডোবাব ওদের। দেখি, নোঙরটা বের করো। ওটাতে বেঁধে ছেড়ে দেব।

শীতল শিহরণ বয়ে গেল রবিনের শিরদাঁড়া বেয়ে। লোকগুলো যে এতখানি সিরিয়াস, ভাবতে পারেনি এতক্ষণ। ভেবেছে কথার কথা বলছে। এখন দেখছে সত্যি সত্যি। তার মাথাটা রয়েছে বোটের একপাশ আর সীটের মাঝখানে। মুখ থেকে কাপড়টা ফেলার জন্যে বোটের গায়ে ঘষতে শুরু করল সে।

'দেখো, আমি এ সবের মধ্যে নেই!' ব্রুনো বলল।

'তাহলে বসে থাকো,' ভিক বলল। 'আমিই যা করার করব।'

ইঞ্জিন নিউট্রাল করে বোট থামিয়ে দিয়ে উঠে এল বাঁটুল।

ইতিমধ্যে কাপড় খুলে ফেলেছে রবিন। আরেকটা ভারি ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসছে তার। এমনিতেও মরবে ওমনিতেও, পিস্তলের ভয় আর করল না। মরিয়া হয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করল, 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

লাফ দিয়ে তাকে থামাতে এগোল ব্রুনো।

জ্বলে উঠল সার্চলাইট। ছুটে আসতে লাগল একটা লঞ্চ। সাইরেন বেজে উঠল। বোটের ওপর এসে পড়ল তীব্র আলো।

রবিনকে ধরা বাদ দিয়ে লাফিয়ে গিয়ে আবার হালের কাছে বসে পড়ল ভিক। ছুটতে শুরু করল বোট।

'এ সব করে বাঁচতে পারবে না,' চিৎকার করে বলল রবিন। ভয় পাচ্ছে, ওদেরকে পানিতে ফেলে দিয়ে না পেছনের লঞ্চটাকে ঠেকানোর চেষ্টা করে ডাকাতগুলো। ওদের ফেলতে দেখলে নিশ্চয় থেমে যাবে লঞ্চ, খোঁজাখুঁজি করবে। এই সুযোগে পালাবে দুই ডাকাত। তবু হাল ছাড়ল না সে। বলল, 'নদীটা নিশ্চয় চেনেন না। একটু পর পরই পুলিশের ঘাটি আছে। ধরা আপনাদের পড়তেই হবে।'

জবাবে গতি আরও বাড়িয়ে দিল ভিক। স্পটলাইটের আলো থেকে বাঁচার জন্যে শাঁই করে একবার এদিকে হাল ঘোরাচ্ছে, একবার ওদিক। বার

বার মোড় নিতে গিয়ে ভীষণ দুলতে আরম্ভ করেছে বোট।

'আরে করছ কি!' আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল লম্বু বুনো। 'ডুবিয়ে মারবে তো!'

'ওর তো এই অভ্যাস আছেই,' মোহনার কাছে আরেকটা বোটকে ডুবানোর কথা মনে পড়তে বলল রবিন। ভয় দেখানোর চেষ্টা করল, 'এই নদীর কোন কিছুই চেনেন না। নিচে যে কি মারাত্মক সব ডুবো পাথর আছে, জানেন না। তার ওপর অন্ধকার। সেবার তো তীরের কাছে ডুবেছিল বলে সাঁতরে উঠে জান বাঁচিয়েছেন। এবার রয়েছেন গভীর নদীতে। ডুবলে আর বাঁচতে পারবেন না।'

তার সুরে সুর মিলিয়ে বুনো বলল, 'ও ঠিকই বলেছে, ভিক, থামো তুমি! মরার চেয়ে পুলিশের হাতে পড়া ভাল!'

ঠা-ঠা-ঠা-ঠা করে গুলির শব্দ হলো। গর্জে উঠেছে মেশিনগান।

আর চালানোর সাহস করল না ভিক। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। তীব্র উজ্জ্বল সাদা আলোর বন্যা যেন ভাসিয়ে দিল বোটটাকে। পুলিশের লঞ্চের ভারি খোল এসে ঘষা খেল বোটের গায়ে।

লঞ্চ থেকে লাফিয়ে নামল একটা ভারি শরীর।

'মুসা!' আনন্দে চিৎকার করে উঠল রবিন। 'তুমি এখানে!'

'ভালই আছ তোমরা!' আনন্দে গলা কেঁপে উঠল মুসার। দ্রুতহাতে বাঁধন খুলতে শুরু করল।

দুই চোরের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল পুলিশ। লঞ্চে টেনে তুলল। মোটর বোটটাকে বেঁধে নেয়া হলো লঞ্চের সঙ্গে।

রকি বীচে ফিরে চলল লঞ্চ।

হেলান দিয়ে বসে কিশোর বলল, 'একটা কাজের কাজ করেছ, মুসা। এমন সময় মত পুলিশ নিয়ে হাজির হলে কি করে?'

'তোমাদের তুলে নিয়ে বোটটাকে চলে যেতে দেখলাম। পাগলের মত ছুটলাম গাড়ির দিকে। চলে গেলাম কাছের পুলিশ ফাঁড়িতে। ওদেরকে জানাতেই ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করল একটা টহল লঞ্চের সঙ্গে। ছুটে চলে গেলাম আবার নদীর ধারে। লঞ্চটা আমাকে তুলে নিল। উজানের দিকে যেতে বললাম ওদের। রবিনের চিৎকারটা কাজে লেগেছে। তাড়াতাড়ি পাওয়া গেছে তোমাদের।'

'ও চিৎকার না করলে আর পেতে কিনা সন্দেহ আছে,' কব্জি ডলতে ডলতে বলল কিশোর। 'আমাদের ডুবিয়ে দিতে চাইছিল বাটুল শয়তানটা।'

রিভেরা হাউসের কাছে এসে তিন গোয়েন্দাকে নামিয়ে দেয়ার সময় লঞ্চের ক্যাপ্টেন বললেন, 'হেডকোয়ার্টারে দেখা কোরো। কিডন্যাপার দুটোকে ওখানেই নিয়ে যাচ্ছি।'

মুসার গাড়িতে করে রকি বীচ থানায় চলল ওরা। শহরে ঢুকে সে বলল, খিদে পেয়েছে। প্রস্তাবটা মন্দ না, কিশোর আর রবিনেরও মনে ধরল। একটা ফাস্ট ফুডের দোকান থেকে হট ডগ আর গরম দুধ খেয়ে নিল।

থানায় এসে দেখল, বুনো আর ভিককেও নিয়ে আসা হয়েছে। আরও দু'জন অফিসারকে নিয়ে ওদের জেরা করছেন চীফ ইয়ান ফ্লেচার। কোন কথাই স্বীকার করতে চাইছে না দুই চোর।

'বন্দরে চুরি-ডাকাতির কথা কিচ্ছু জানি মা আমরা!' ফুঁসে উঠল ভিক। 'কোন প্রমাণ আছে আপনাদের হাতে? প্রমাণ ছাড়া চোর বলতে পারেন না আমাদের।'

'কিডন্যাপার তো বলতে পারি,' চীফ বললেন। 'তাতেই চলবে।'

অনিশ্চিত দৃষ্টি ফুটেছে বুনোর চোখে। চুপ করে রইল।

কিশোর বলল, 'স্যার, আমার মনে হয় রিভেরা হাউসে গেলেই জোরাল প্রমাণ পাওয়া যাবে। আমরা যাব নাকি দেখতে?'

এক মুহূর্ত ভাবলেন চীফ। উজ্জ্বল হলো চোখ। 'ভাল বুদ্ধি।' একজন অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মরিস, একটা পেট্রল কার নিয়ে তুমিও যাও সঙ্গে।'

সতেরো

সে-রাতে দ্বিতীয়বারের মত রিভেরা হাউসে চলল তিন গোয়েন্দা। এবারও রাস্তার ধারেই গাড়ি রাখল। মরিসকে নিয়ে এল সেই জানালাটার কাছে, যেটা দিয়ে লাফিয়ে পড়েছিল দুই চোর।

ওই জানালা পথেই ভেতরে ঢুকে গেল ওরা।

শীঘ্রি আলো জ্বলে উঠল পুরানো বাড়িটার ঘরে ঘরে। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে খুঁজতে শুরু করল পুলিশ।

ডাইনিং রুমের কোণের একটা আলমারির দরজা টান দিয়ে খুলল মুসা। ভেতরে অনেকগুলো মলাটের বাক্স। হাত নেড়ে ডাকল মরিসকে, 'দেখে যান, এদিকে আসুন!'

ছুটে এল মরিস, রবিন আর কিশোর। একটা বাক্স বের করে এনে মেঝেতে রেখে খুলল। পানি নিরোধক কাগজে মোড়া দামী একটা রূপার ফুলদানি রয়েছে ভেতরে। কোন দেশে তৈরি, সেটাও খোদাই করে লেখা রয়েছে নিচে। জিনিসটা বিদেশী।

'চোরাই মাল কোন সন্দেহ নেই,' মরিস বলল। 'আগের বারও দেখে গেছি এই আলমারি। তখন এগুলো ছিল না।'

অন্য বাক্সগুলোও খুলে দেখা হলো। নানা রকমের জিনিসে বোঝাই। চীনা-মাটির তৈরি ঘর সাজানোর জিনিস, দামী গহনা, হীরা বসানো সোনার আঙটি আর হার, আরও নানা জিনিস।

ভ্রূকুটি করল রবিন। 'ডুডলি হ্যারিসের জিনিসগুলো কই? আর ক্যাপ্টেন টমারের পান্নার হার?'

আবার শুরু হলো খোঁজা। একতলা-দোতলা-তিনতলার ঘর, চিলেকোঠা, সেলার; কোন জায়গাই বাদ দিল না। কিন্তু পাওয়া গেল না ওগুলো।

অবশেষে মরিস বলল, 'যা পাওয়া গেছে চোর দুটোকে ফাঁসানোর জন্যে যথেষ্ট। ওরাই রেখে গেছে এ সব।'

'তা ঠিক,' কিশোর বলল। তবে মনটা খুঁতখুঁত করছে তার। পান্নার জিনিসগুলো পাওয়া গেল না কেন? কোথায় আছে ওগুলো?

বাইরে বেরিয়ে এল ওরা।

মরিসকে বলল কিশোর, 'আপনি যান। আমার টর্চটা পড়ে গেছে নদীর ধারে। ওটা নিয়ে আসি।'

'ঠিক আছে, যাও,' বলে আরেকটা টর্চ কিশোরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে পেট্রল কারের দিকে চলে গেল মরিস।

দুই সহকারীকে নিয়ে কিশোর রওনা হলো নদীর পাড়ে। টর্চটা খুঁজে পেল সহজেই। বাল্ব ভাঙেনি। ঝাঁকুনিতে নিভে গিয়েছিল। সুইচ টিপে হাতের তালুতে দু'চারটা বাড়ি দিতেই জ্বলে উঠল।

ড্রাইভওয়েতে ফিরে এল আবার ওরা।

মুসা বলল, 'আবার সেই অনুভূতিটা ফিরে এসেছে আমার। ভয় ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন নজর রাখছে আমাদের ওপর।'

হেসে বলল রবিন, 'উত্তেজনা কেটে গেছে তো, অনুভূতি ফিরে আসবেই। তোমার ভয়ের অনুভূতি মানে তো ভূতের ভয়।'

জবাব না দিয়ে গাড়ির দিকে এগোল মুসা।

তিনজনেই চড়ে বসল। পকেটে হাত দিয়ে চাবি খুঁজছে মুসা, এই সময় কানে এল ইঞ্জিনের শব্দ। আরেকটা গাড়ি আসছে। আলো নিভিয়ে আসছে। ঝোপের আড়ালে থাকায় মুসার গাড়িটাকে দেখতে পেল না। সোজা এগিয়ে গেল রিভেরা হাউসের গেটের দিকে। গাড়ি থামিয়ে নেমে গেল ড্রাইভার, গেটের পাল্লা খুলে দিয়ে ফিরে এসে গাড়িতে উঠল। গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

'যাবে নাকি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

মুসাকে বলল কিশোর, 'যাও।'

হেডলাইট জ্বেলে দিল মুসা। খোলা গেটের দিকে এগোল সে-ও। ঢুকে পড়ল ভেতরে। গাড়িটা দেখতে পেল না।

ড্রাইভওয়েটা ঘুরে গিয়ে বাড়ির পেছনে যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে এনে গাড়ি রাখল মুসা।

নেমে পড়ল ওরাও। সামনে ঘন ঝোপঝাড়। চারাগাছকে নির্ভর করে ঘন হয়ে উঠে গেছে আঙুর লতা। বাড়ির অনেকখানিই দেখা যায় না এর জন্যে।

টর্চের আলোয় মাটি পরীক্ষা করতে লাগল কিশোর। অবাক হয়ে দেখল, চাকার দাগ সোজা চলে গেছে বিল্ডিঙের দিকে।

লতানো ঝোপের দিকে এগোল রবিন। লতাপাতা ধরে টেনে ফাঁক করে

বাড়িটা দেখার চেষ্টা করল। অবাক হয়ে দেখল একটা রাস্তা চলে গেছে গাছের জটলার ভেতর দিয়ে।

'খাইছে! গুপ্তপথ!' কাঁধের কাছে বলে উঠল মুসা।

রহস্যময় গুপ্তপথটা ধরে এগিয়ে চলল ওরা। মাথার ওপরে পাতার চাঁদোয়া। ফাঁক-ফোকর দিয়ে আকাশ চোখে পড়ে এক-আধটু। তবে অন্ধকারই বেশি। অনেকটা গাছের সুড়ঙ্গের মতই মনে হচ্ছে। কোন রকম সাড়াশব্দ না পেয়ে টর্চ জ্বালার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর।

মরিসের দেয়া টর্চটা হাতে নিয়েছে রবিন।

ধসে পড়া একটা গোলাঘর ফুটে উঠল টর্চের আলোয়। মাটিতে চাকার দাগ। এগিয়ে গেছে ঘরটার দিকে।

ঘরে ঢুকে পড়ল ওরা। সামনের অর্ধেকটা একেবারে খালি। সামনের দিকে চালার আড়া বেঁকে গেছে, বেশি চাপ পড়লে ভেঙে যাবে। পেছনের অর্ধেক খড়ে বোঝাই। সামনের দিকটায় ওপর থেকে ঝুলে আছে খড়গুলো, যেন উপচে পড়তে চাইছে।

'কবেকার খড়!' মুসা বলল। 'মনে তো হয় রিভেরাই রেখে গিয়েছিল এগুলো।'

'তাহলে এই খড় সরানোর কাঁটাটা নতুন কেন?' কাঠের হাতল লাগানো লোহার তিনটে বড় কাঁটাওয়ালা যন্ত্রটা দেখাল রবিন। খড়ের গাদার কাছে মাটিতে পড়ে আছে।

'এবং গাড়িটাই বা কোথায়?' কিশোরের প্রশ্ন।

সামনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা নড়ে উঠল সে। এগিয়ে গেল খড়গুলোর দিকে। কাঁটাটা তুলে নিয়ে খোঁচা দিল খড়ে। কাঠে লাগার শব্দ হলো। কাঁটা ফেলে খড় ফাঁক করে দেখল। ভেতরে প্লাইউডের বোর্ড। একটা হাতল লাগানো আছে।

হাতল ধরে টানতেই দরজার পাল্লার মত করে সরে এল প্লাইউড।

'খাইছে!' হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা।

রবিনও হাঁ হয়ে গেছে।

খড়ের গাদার নিচে গোপন গ্যারেজ তৈরি করা হয়েছে। তার মধ্যে যেন আরাম করে ঘুমিয়ে আছে লেটেস্ট মডেলের একটা কালো রঙের মেটিওর স্পেশাল গাড়ি।

গাড়িটার দুই পাশেই জায়গা আছে। একদিক দিয়ে ঢুকে গেল কিশোর। বনেটে হাত রেখে বলল, 'ইঞ্জিন এখনও গরম। একটু আগে ঢোকানো হয়েছে।'

রবিন আর মুসাও এগিয়ে এল। একমত হলো কিশোরের সঙ্গে।

শব্দ শুনতে পেল মুসা। ফিসফিস করে বলল, 'শুনছ? গোঙানি!'

আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে শুরু করল কিশোর। গ্যারেজের মেঝেতে কেউ নেই। গাড়ির পেছনের সীটের নিচে আলো পড়তেই চমকে উঠল।

মেঝেতে পড়ে আছে একজন মানুষ। হাত-পা বাঁধা। মুখে কাপড়

গোঁজা।

ঢোক গিলল মুসা।

'কে-কেউ ওকে বেঁধে ফেলে গেছে!'

আলো ধরে রাখল কিশোর আর রবিন। দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে লোকটার বাঁধন কেটে দিল মুসা।

ধীরে ধীরে উঠে বসল লোকটা। কব্জি আর গোড়ালি ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে গিয়ে গুঙিয়ে উঠল আবার।

আঠারো

তার সঙ্গে কথা শুরু করল রবিন, 'আপনাকে কোথাও দেখেছি মনে হয়?'

কোথায় দেখেছে মনে পড়ল। হ্যারিসের বাড়িতে আড়ি পেতে থাকা লোকটাকে যখন তাড়া করেছিল কিশোর, তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল যে নীল জ্যাকেট পরা লোকটা, এ সেই। উদ্ধার পেয়েছে এর জন্যে কৃতজ্ঞ হবে, তা না, জ্বলন্ত চোখে ওদের দিকে তাকাল সে। কপালের ঘাম মোছার জন্যে পকেট থেকে রুমাল টেনে বের করতে গেল। টান লেগে কি যেন একটা পড়ল পকেট থেকে।

দেখে ফেলল রবিন। নিচু হয়ে তুলে নিল। একটা নকল দাড়ি।

বুঝে ফেলল কিশোর। বলল, 'তার মানে আপনিই আড়ি পেতে শুনছিলেন হ্যারিসের বাড়িতে। এখন বলে ফেলুন তো, ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন কেন? খেলাটা কি আপনার?'

জবাব দিল না লোকটা। আরেক দিকে মুখ ফেরাল।

মুসা বলল, 'না বললে আবার বেঁধে এই গাড়িতে ফেলে যাব আপনাকে। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমাদের তিনজনের সঙ্গে পারবেন না।'

অগত্যা হার স্বীকার করে নিল লোকটা। বলল, 'হ্যাঁ, আড়ি পেতে আমি শুনেছি। তবে তাতে লাভের লাভ কিছুই হয়নি। এই জ্যাকেটটাও মাত্র একবার কাজ দিয়েছে।' গায়ের জ্যাকেটটা খুলে উল্টে দেখাল সে। ভেতরের দিকটা বাদামী। তারমানে দুই দিকেই পরা যায়। এক পিঠের রঙ নীল, আরেক পিঠ বাদামী। 'তোমরা যখন আমাকে তাড়া করলে, এক ফাঁকে দাড়ি খুলে নিলাম। জ্যাকেটটা খুলে উল্টে নিয়ে পরে ফেললাম।'

'এবং আমাদের ধোঁকা দিলেন,' রবিন বলল। 'ঠিক আছে, বলে যান।'

'আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। এতদিন এ কাজে গর্ব বোধ করতাম। তবে এবার ঘেন্না ধরে গেছে। আর না। এই পেশা ছেড়ে দেব ঠিক করেছি।'

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। 'প্রাইভেট ডিটেকটিভ? নিশ্চয় বীমা কোম্পানির। আপনার নাম মিলার প্যাটোলি?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'আমার আসল নাম প্যাট ব্রিংহ্যাম। ক্যাপ্টেন টমারের চুরি যাওয়া হার খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে। আমি শুনলাম, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে তোমরা। তাই আড়ি পেতে শুনতে গিয়েছিলাম, তোমরা কতটা জানো। সেখানে শুনলাম, বুড়ো হ্যারিসও পান্নার জিনিস হারিয়েছে। আমি জানি কে নিয়েছে। বিশালদেহী ওই লোকটা, চশমা পরে যে—উইক শিপরিজ—সে নিয়েছে। এটা আমি বের করে ফেলেছি।'

'উইক শিপরিজ?' রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। নামটা এই প্রথম শুনল ওরা। ভাবছে, ওই লোকই অ্যালেক্স ককারের নকল নয় তো?

'হ্যাঁ,' জবাব দিল প্যাট, 'উইক শিপরিজ। সারা শহরে তার পেছনে ঘুরে বেড়িয়েছি আমি। শেষে তার গাড়িতে উঠে পেছনে লুকিয়ে থেকেছি। ভেবেছি, টমারের হারটার কাছে আমাকে নিয়ে যাবে সে। কিন্তু সর্বনাশ করে দিল হতচ্ছাড়া হাঁচি! নাক এত সুড়সুড় করতে লাগল কিছুতেই হাঁচি না দিয়ে পারলাম না। তারপর আর কি। মাথায় বাড়ি মেরে আমাকে বেহুঁশ করে ফেলল উইক। হুঁশ ফিরলে দেখি অন্ধকারে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় গাড়ির মেঝেতে পড়ে আছি। উফ্, কি যে কষ্ট! গোয়েন্দাগিরি মানুষে করে নাকি!'

'মানুষেই করে,' মুচকি হেসে বলল কিশোর, 'সবাই সহ্য করতে পারে না, এই আর কি। যাকগে। ভাল তথ্য দিলেন। সবাই মিলে এখন উইককে খুঁজতে যাব। আপনি যাবেন?'

একটু আগের প্রতিজ্ঞার কথা বেমালুম ভুলে গেল প্যাট। উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ। 'নিশ্চয় যাব!'

ওকে নিয়ে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

রিভেরা হাউসের জানালাটা এখনও খোলা। সেটা দিয়ে ঢুকে পড়ল চারজনেই। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও উইককে পাওয়া গেল না কোথাও।

'ঘরে নেই,' হাল ছেড়ে দিয়ে বলল কিশোর। 'বাইরে জঙ্গলের মধ্যে থেকে থাকলে ওকে আজ রাতে পাওয়ার আশা ছাড়তে হবে। পুলিশকে জানানো দরকার।'

মুসার গাড়িতে করে শহরে ফিরে এল ওরা।

'আমাকে আমার মোটেলে নামিয়ে দাও,' অনুরোধ করল প্যাট। 'আজ রাতে আর কুটোটিও সরাতে পারব না। গোয়েন্দাগিরি অনেক হয়েছে।'

ওকে নামিয়ে দিয়ে থানায় চলে এল তিন গোয়েন্দা। অফিসেই আছেন ফ্লেচার। কয়েকজন পুলিশ অফিসার আছে ঘরে। ব্রুনো আর ভিককে জেরা করা বোধহয় শেষ হয়েছে। ওরাও বসে আছে। আগের তেজ আর নেই ভিকের। বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে মাথা। পুলিশের একজন ক্লার্ক কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে ওদের জবানবন্দি নিতে তৈরি।

তিন গোয়েন্দাকে ঢুকতে দেখে হেসে বলল অফিসার মরিস, 'আমি চোরাই মাল নিয়ে আসার পরও বহুত ডাঁট দেখিয়েছে। স্বীকার করতে চায়নি।

একটু আগে সব বলতে রাজি হয়েছে। বাঁটুলটার নাম ভিক বারগার। আর লম্বুটা ব্রুনো বেকিং।'

চেয়ার টেনে বসল ছেলেরা।

ব্রুনো বলল, 'হ্যাঁ, মোটর বোটটা আমরা চুরি করে এনেছি। বন্দরে অনেকের বোট বাঁধা আছে। রাতে কোন একটা চুরি করে নিয়ে কাজে বেরোতাম। মাস্টার কী ছিল আমাদের কাছে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে অসুবিধে হত না। কাজ শেষ হলে নিয়ে গিয়ে আবার বোট রেখে দিতাম আগের জায়গায়। জাহাজের গায়ে বোট ঠেকিয়ে উঠে জাহাজ থেকেও জিনিস চুরি করেছি আমরা।'

'কি জিনিস?' প্রশ্ন করলেন চীফ।

'অনেক কিছু।'

'পান্নার তৈরি জিনিসও নিশ্চয়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

চোখ গরম করে ওর দিকে তাকাল ভিক। 'তুমি জিজ্ঞেস করার কে!'

ধমক দিয়ে বললেন ফ্লেচার, 'জবাব দাও ওর কথার!'

চোখের আগুন নিভল না ভিকের। আরেক দিকে মুখ ফেরাল।।

ব্রুনো জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

'তোমাদের দলপতি কে?' রবিন জানতে চাইল।

'দলপতি নেই,' ব্রুনো জবাব দেয়ার আগেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল ভিক, 'আমরা দু'জনই—আমি আর ব্রুনো।'

'ব্রুনোর মত একজন মাথামোটা ভীতু লোককে নিয়ে তুমি লক্ষ লক্ষ ডলারের জিনিস চুরি করে গাপ করে দিয়েছ, এ কথা বিশ্বাস করতে বলো আমাদের?' ব্যাঙের হাসি হাসল রবিন, 'হাসালে। তোমাদের বস উইক শিপরিজের কথা আমরা জেনে গেছি।'

এমন চমকে গেল দুই চোর, যেন বোলতায় হুল ফুটিয়েছে।

'তু-তুমি কি করে জানলে···' বলতে গিয়ে বাধা পেল ব্রুনো।

ধমকে উঠল ভিক, 'চুপ, গাধা কোথাকার! থামো!'

চেয়ারে এলিয়ে পড়ল ব্রুনো।

কিশোর বলল, 'আর অস্বীকার করে লাভ নেই। উইক আর পান্নার জিনিসগুলো কোথায়, বলে ফেলো এখন।'

'নিজেরাই গিয়ে বের করে নাও না!' দাঁতে দাঁত ঘষল ভিক।

'তেজ দেখাবে না বলে দিলাম!' কঠিন গলায় ধমক দিলেন চীফ। 'ভাল চাও তো, যা জিজ্ঞেস করে, জবাব দাও।'

ভিকের দিকে তাকাল ব্রুনো, 'সবই তো বলে দিলাম। আর গোপন রেখে লাভ কি?' ছেলেদের দিকে ফিরল সে। 'কি জানতে চাও?'

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার হ্যারিসের জিনিসগুলো কে চুরি করেছে?'

'টমারের হারটা আমরা নিয়েছি। হ্যারিসেরগুলো করেছে উইক আর কুপার। প্রথমে হ্যারিসের বাড়িতে গিয়ে কৌশলে তাকে দিয়ে পান্নার কিছু জিনিস বের করায় উইক। তারপর হ্যারিসকে দাবার বোর্ড আনতে পাঠিয়ে

জিনিসগুলো নিয়ে বেরিয়ে যায়। বাড়ি খালি ফেলে তার পিছু নেয় হ্যারিস। ওই সময় বাড়িতে ঢুকে বাকি জিনিসগুলো নিয়ে আসার কথা ছিল কুপারের। কিন্তু সময়ের হেরফের করে গোলমাল করে দিয়েছিল সে। বাধ্য হয়ে তখন উইককে আবার যেতে হয়। তোমরা তখন হ্যারিসকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে গেছ। আমাদের সঙ্গে বন্দরে দেখা করার কথা ছিল কুপারের। সেটাও সে করেনি। একটা বোট নিয়ে রিভেরা হাউসে তাকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে বসেছিলাম আমি আর ডিক।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ওই বাড়িতে উইকের সঙ্গে দেখা হলো তোমাদের। সে নিয়ে গেছে পান্নার জিনিসগুলো, আর তোমরা অন্যান্য চোরাই মাল।'

'হ্যাঁ।'

'লোকের বোট চুরি করে কাজ সারার ফন্দিটা কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল?' জিজ্ঞেস করলেন চীফ।

'উইক। গাড়ির ওপর চোখ পড়ে গিয়েছিল পুলিশের, গাড়ি আর নিরাপদ ছিল না। তাই বোট চুরি করতে শুরু করলাম, যাতে মালিকরাও কিছু বুঝতে না পারে। তবু সামাল দেয়া কঠিন হয়ে পড়ল। পুলিশ তো আছেই, এই ছেলেগুলোর উৎপাতেও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম,' তিন গোয়েন্দাকে দেখাল সে। 'আজ রাতে সেলারে গিয়ে দরজা বন্ধ দেখে, ঘরে ঢুকতে না পেরে চেঁচাতে শুরু করল। আমরা তো ভাবলাম পুলিশ এসে ঘিরে ফেলেছে। জানালা টপকেই পালালাম।'

প্রথম হাসল মুসা। হাসিটা সংক্রামিত হলো রবিন আর কিশোরের মাঝে। মুচকি হাসলেন ফ্লেচার। মরিসও হেসে ফেলল।

মুখটাকে বিষণ্ন করে রাখল বুনো।

ডিকের চেহারা থমথমে।

হাসতে হাসতে ছেলেদের দিকে ফিরলেন চীফ। জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ, এইবার বলো, উইকের কথা জানলে কি করে?'

বলল রবিন। গোপন গ্যারেজ আর বন্দি ডিটেকটিভের কথা শুনে ভুরু কুঁচকে গেল চীফের।

চাবির রিঙটা বের করে দিল কিশোর, 'এটা পাওয়াতে অনেক সুবিধে হয়েছে আমাদের।'

'হুঁ,' মাথা দোলালেন চীফ। 'মনে হচ্ছে, শেষ হয়ে এসেছে কেসটা।' অফিসারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন তিনি, 'সকাল হলেই দলবল নিয়ে চলে যাবে রিভেরা হাউসে। তন্ন তন্ন করে খুঁজবে বাড়িটা। উইক আর কুপারকে সহ পান্নার জিনিসগুলো বের করার চেষ্টা করবে। গোলাঘর থেকে মেটিওর গাড়িটা বের করে নিয়ে আসবে।'

'বুনো আর ডিকের ধরা পড়ার খবর নিশ্চয় পেয়ে যাবে ওরা,' মরিস বলল। 'যদি তল্পি গুটিয়ে পালানোর চেষ্টা করে?'

'শহর থেকে বেরোনো সমস্ত পথ ওদের জন্যে বন্ধ করে দিতে হবে। সব

জায়গায় নজর রাখতে হবে। বিশেষ করে রাস্তাগুলো আর বন্দর। কড়া পাহারা বসিয়ে দাওগে ওসব জায়গায়। কিছুতেই যাতে বেরোতে না পারে। রিভেরা হাউসের চারপাশেও পাহারার ব্যবস্থা করবে।'

কিশোর বলল, 'কিন্তু পুলিশ দেখলে তো সতর্ক হয়ে যাবে উইক। বাড়িতে ঢুকবে না।'

'জানি। সে-জন্যেই এমন করে লুকিয়ে থেকে পাহারা দিতে হবে, যাতে উইক দেখতে না পায়। সে মনে করে, কেউ নেই, আগের মতই নির্জন। যেই ঢুকবে, অমনি ধরে ফেলা হবে।'

নির্দেশ মত কাজ করার জন্যে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল অফিসারেরা।

তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন চীফ, 'আবার পুলিশকে বিরাট সাহায্য করলে তোমরা। অনেক ধন্যবাদ। যাও, বাড়ি যাও। বিকেলে ফোন করো আমাকে। খবর জেনে নিয়ো।'

উনিশ

রাত অনেক হয়েছে। ঘুমন্ত শহরের পথ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে মুসা। পেছনের সীটে বসা কিশোর বলল রবিনকে, 'বুঝতে পারছি না কি ঘটবে! উইক আর কুপার এখনও মুক্ত। পান্নাগুলোও খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

একমত হয়ে রবিন বলল, 'মিস্টার ককারকে হুমকি দিয়ে লেখা নোট রহস্যেরও কিনারা হলো না। সেদিন রাতে অমন ভয়াবহ চিৎকারই বা দিয়েছিল কে?'

'হুঁ!' আনমনে নিচের ঠোঁটে একবার চিমটি কাটল কিশোর। 'কেসটা শেষ হয়নি এখনও। অনেক কিছু বাকি!'

'আগে গিয়ে ভালমত ঘুমিয়ে নাও, সকালে ভাবনা-চিন্তা কোরো,' হাই তুলল মুসা। ব্রেক কষল। 'বাড়ি এসেছে। নামো।'

পরদিন সকালে ডিরেক্টরি ঘেঁটে ককারের বাড়ির ফোন নম্বর বের করে ফোন করল কিশোর। রিভেরা হাউসে নয়, তাঁর আসল বাড়িতে, যেখানে বাস করেন। আগের রাতে রিভেরা হাউসে যে চোর ধরা পড়েছে, জানানোর জন্যে। ফোন ধরল না কেউ।

তখন ব্যাংকে ফোন করল কিশোর।

'সরি, স্যার,' ব্যাংক থেকে জবাব দিল একজন, 'মিস্টার ককার এখনও আসেননি। তিনি কোথায়, তা-ও বলতে পারব না। বলে যাননি।'

কিছুক্ষণ পর রবিন এল। তাকে খবরটা জানাল কিশোর। সারাটা সকাল ওঅর্কশপে বসে রইল দু'জনে। খানিক পর পরই ককারের বাড়িতে ফোন করল কিশোর। একবারও ফোন তুলল না কেউ।

দুপুরে খাওয়ার পর আর বসে থাকতে পারল না কিশোর। রবিনকে নিয়ে থানায় রওনা হলো।

অফিসে আছেন চীফ। চোখের কোণে কালি। চোখ লাল। সারারাত ঘুমাননি। সকাল থেকেও নিশ্চয় বিছানায় পিঠ লাগানোর সুযোগ মেলেনি। জানালেন, পাশের শহরের এক মোটেল থেকে কুপারকে ধরে আনা হয়েছে।

'রিভেরা হাউসের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজে দেখা হয়েছে,' বললেন তিনি। 'মেটিওরটা নিয়ে এসেছে মরিস। কিন্তু উইক কিংবা পান্নাগুলোর কোন খোঁজ মেলেনি। রিভেরা হাউসে নেই। নিশ্চয় অন্য কোনখানে লুকিয়েছে।'

থানা থেকে বেরিয়ে একটা পাবলিক টেলিফোন বুদ থেকে আবার ককারের বাড়িতে ফোন করল কিশোর। সেই একই অবস্থা। জবাব নেই। আবার ব্যাংকে ফোন করল সে। ব্যাংকেরও একই জবাব, 'আসেননি। কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।'

বুদ থেকে বেরিয়ে এসে রবিনকে বলল সে, 'ব্যাপারটা ভাল মনে হচ্ছে না আমার। তাঁর বাড়িতে যাওয়া দরকার।'

শহরের একধারে ককারের বাড়িতে এসে ঢুকল দুই গোয়েন্দা। সদরদরজার ঘন্টা বাজিয়ে, অনেক ধাক্কাধাক্কি করেও সাড়া না পেয়ে সন্দেহ চরমে উঠল। শেষে আবিষ্কার করল, দরজায় তালা দেয়া।

'পুলিশকে জানানো দরকার,' গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। 'শিওর, খারাপ কিছু হয়েছে ককারের।'

আধঘন্টা পর থানা থেকে কয়েকজন পুলিশ নিয়ে এসে আবার ককারের বাড়িতে ঢুকল ওরা।

তালা ভেঙে ঘরে ঢুকল পুলিশ। সুন্দর করে সাজানো রয়েছে ঘরগুলো। সবই ঠিক আছে, কেবল ককার নেই।

আপাতত আর কিছু করার নেই। নতুন কিছু জানতে পারলে জানাবে, কিশোরকে কথা দিয়ে দলবল নিয়ে চলে গেল অফিসার মরিস।

নিজেদের গাড়িতে চড়ল দুই গোয়েন্দা।

চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'আমার ধারণা, রিভেরা হাউসে গিয়েছিলেন ককার। বিপদে পড়েছেন। ওখানেই চলো।'

বিকেলের মাঝামাঝি। কিন্তু সেই তুলনায় আলো কম। পশ্চিম আকাশে মেঘ জমছে। চলতে চলতে হঠাৎই কোন রকম জানান না দিয়ে কেশে উঠে বন্ধ হয়ে গেল ফোক্স ওয়াগেনের ইঞ্জিন।

অনেক চেষ্টা করেও গোলমালটা ধরতে পারল না রবিন। কোন মতেই স্টার্ট করতে না পেরে বিরক্ত হয়ে গাড়িটাকে ঠেলে রাস্তার পাশে নামাল দু'জনে। তেতো গলায় কিশোর বলল, 'আর কোন উপায় নেই, হেঁটেই যেতে হবে।'

অনেক সময় খেয়ে নিয়েছে গাড়িটা। বিকেল শেষ। গোধূলিও শেষ হয়ে গেল দ্রুত। ঘণ্টাখানেক একনাগাড়ে হাঁটার পর ম্যানিলা রোডের মোড়ে এসে পৌঁছল ওরা। রিভেরা হাউসে যখন ঢুকল, অন্ধকার হয়ে গেছে। ঢুকতে বাধা

দিল না ওদের কেউ, কোন পুলিশম্যানকে দেখা গেল না আশেপাশে।

সোজা সেলারে ঢোকার মুখের দিকে এগোল কিশোর। ভাগ্যিস, চাবিটা ছিল সঙ্গে।

আকাশে গুড়ুগুড়ু করে মেঘ ডাকল। ঢাকনার তালায় চাবি ঢোকাল সে। সেলারে নেমে অন্য সিঁড়িটা বেয়ে রবিনকে নিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। ভেবেছিল দরজায় তালা লাগানো দেখতে পাবে। ভেঙে কিংবা অন্য কোন ভাবে খুলতে হবে। কিন্তু অবাক হলো। দরজাটা খোলা।

ভালই হলো। পরিশ্রম বাঁচল। ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা।

অন্ধকারে পা টিপে টিপে লিভিং রুমের দিকে এগোল। কিছুদূর যেতে না যেতেই কিশোরকে চেপে ধরল অসাধারণ শক্তিমান দুটো হাত। ফেলে দিল মেঝেতে। আরেকটা দেহ পড়ার শব্দ কানে এল তার। নিশ্চয় রবিনকেও ফেলেছে।

দীর্ঘ পথ হেঁটে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওরা। তবু বাধা দেয়ার চেষ্টা করল। টিকতে পারল না। মাথায় কঠিন কিছুর বাড়ি খেয়ে আধাবেহুঁশ হয়ে গেল কিশোর। টেনে এনে তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে হাতল আর পায়ার সঙ্গে হাত-পা বেঁধে ফেলা হলো। রুক্ষ হাতে মুখে ঠেসে দেয়া হলো কাপড়। একপাশে ধস্তাধস্তির আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল, রবিনকেও কাবু করে ফেলা হচ্ছে।

তারপর নীরবতা। কানে আসতে লাগল গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকটার একটানা একঘেয়ে শব্দ:

টিক-টক! টিক-টক! টিক-টক!

মাথার মধ্যে এখনও কেমন করছে তার, ঘোর পুরোপুরি কাটেনি। এরই মধ্যে ভাবল, রবিন কি এ ঘরেই আছে? না অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে?

বিশ

কানে এল পা টেনে টেনে হাঁটার আওয়াজ। ভারি নিঃশ্বাস ফেলছে কেউ। জ্বলে উঠল একটা ম্লান আলো। পুরো দৃশ্যটা দেখতে পেল কিশোর।

লিভিং রুমে রয়েছে সে। জানালার ভারি পর্দাগুলো টেনে দেয়া হয়েছে। এককোণে টিক টিক করে চলছে গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক। রবিনকেও তারই মত বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে পুরানো আমলের একটা পিঠ উঁচু চেয়ারে।

ওদের সামনে দাঁড়ানো লম্বা, বিশালদেহী একজন লোক। চোখে চশমা। ককারের মতই দেখতে অনেকটা, তবে ককার নয় সে। নিজের পরিচয় দিল উইক শিপরিজ বলে।

'তাহলে এই লোকই সেই লোক, বন্দর-চোরদের দলপতি!' ভাবল

রবিন। 'মাথায় বাড়ি মেরে আমাদের কাবু করে চেয়ারে এনে বেঁধেছে! শয়তান কোথাকার!'

একবার এর দিকে, একবার ওর দিকে তাকাতে লাগল উইক। বাঁকা হাসি হেসে বলল, 'অবাক হয়েছ, না? অন্যের কাজে নাক গলানোর শাস্তি এবার পাবে তোমরা।'

রাগ চেপে চুপ করে রইল রবিন।

'আজকের সন্ধ্যায় তোমাদের জন্যে অনেকগুলো চমকের ব্যবস্থা করেছি আমি। তোমাদের বন্ধু অ্যালেক্স ককারও সে-সব উপভোগ করবে।' গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা করে চোখ টিপল সে। 'তোমরা ভেবেছিলে, দুনিয়ায় একমাত্র তোমরাই চালাক। বোকা আর কাকে বলে। তোমরা কি জানো, যতবার এখানে এসেছ তোমরা, পুলিশ এসেছে, তোমাদের ওপর চোখ রাখা হয়েছে?'

যদিও ভয় যে পেয়েছে এটা বুঝতে দিল না কিশোর কিংবা রবিন, বুঝতে পারল সাংঘাতিক চালাক এক খেপা অপরাধীর পাল্লায় পড়েছে এবার। ভেবে অবাক হলো, তাদের ওপর নজর রাখার কাজটা কে করেছে?

ঘড়ির দিক থেকে একটা চি-চি স্বর শোনা গেল। ঘুরে তাকাল উইক, 'গোরো, বেরিয়ে আসুন। মেহমান এসেছে।'

তাজ্জব হয়ে দেখল দুই গোয়েন্দা ঘড়িটা তার পেছনের দেয়ালের খানিকটা অংশ নিয়ে পাশে সরতে আরম্ভ করেছে।

'দরজা!' চাপা গলায় নিজেকেই যেন বলল কিশোর, 'ঘড়ি দিয়ে আড়াল করা ছিল! নিশ্চয় দরজা খোলার গোপন সুইচ আছে!'

বেরিয়ে এল সাদা-চুল এক বৃদ্ধ। নিখুঁত করে দাড়ি কামানো, নীল চোখ। এগিয়ে এসে ছেলেদের সামনে দাঁড়াল। অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল, 'মিস্টার শিপরিজ, মেহমান হলে ওদের বেঁধে রাখা হয়েছে কেন? আপনি তো বলতেন বিরক্ত করার জন্যে এখানে ঢোকে ওরা। ক্ষতির ভয়েই তো কড়া নজর রাখতাম...'

অবাক লাগল কিশোরের। রবিনের দিকে তাকিয়ে দেখল সে-ও অবাক হয়েছে। উইকের দলে কাজ করে এই লোক? ঠিক মানায় না।

'সময় হলেই সব বুঝবে, গোরো,' উইক বলল। গোয়েন্দাদের অবাক হয়ে বুড়োর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মুচকি হাসল। 'ওহ্, পরিচয় করানো হয়নি। ওর নাম গোরো কিনডার। একজন আবিষ্কারক। খুব বুদ্ধিমান।'

আস্তে মাথা ঝাঁকাল গোরো। 'উইক, আপনি বলেছেন এরা আপনার পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দিতে চায়। কিন্তু আমার কাছে তো নিরীহ ছেলে বলেই মনে হচ্ছে। আমার মনে হয় না...'

'আপনার মনে হওয়া নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই!' কর্কশ গলায় বলল উইক। 'কাজটা শেষ হয়েছে?'

'হয়েছে হয়েছে,' তাড়াতাড়ি বলল গোরো, 'শেষ হয়ে গেছে। অত উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই।'

'কে উত্তেজিত হচ্ছে!' খেঁকিয়ে উঠল উইক। 'যান, নিয়ে আসুন।'

তাড়াহুড়ো করে গুপ্তপথ দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল গোরো।

ছেলেদের দিকে ফিরল উইক। 'খুব চমকে গেছ, না? এ বাড়িতে একটা নয়, দুটো গোপন ঘর আছে, সেটা নিশ্চয় জানা ছিল না তোমাদের। তোমরা যখন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে খোঁজাখুঁজি করে গেলে, তখন আমি চুপ করে বসেছিলাম ওই ঘড়ির পেছনের ঘরে। আজ সকালে যখন পুলিশ এল, তখনও ছিলাম।'

নিজের মাথা ভাঙতে ইচ্ছে করল কিশোরের। ঘড়িটা দেখে তার সন্দেহ হয়েছিল, যতবার ওটার দিকে চোখ পড়েছে, ততবারই মনে হয়েছে কোন একটা রহস্য আছে ওটার। তারপরেও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল না কেন!

রবিন ভাবছে অন্য কথা, উইকই কি ককারকে হুমকি দিয়ে নোট রেখে এসেছিল? এ কাজে তাকে সাহায্য করেছে গোরো? কিন্তু বুড়ো মানুষটাকে দেখে মনে হয় না সে কারও ক্ষতি করতে পারে।

ফিরে এল গোরো। হাতে একটা ভারি জিনিস। কালো বাক্সের মত দেখতে, এদিক ওদিক থেকে কয়েকটা অ্যান্টেনার মত বেরিয়ে আছে।

'গুড!' দুই হাত ডলতে ডলতে বলল উইক। কালো বাক্সটা দেখিয়ে গোয়েন্দাদের জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি চিনতে পারছ?'

'টাইম বম্ব!' বিড়বিড় করল কিশোর।

'বাহ্, বুদ্ধিমান ছেলে। বুঝে ফেলেছ,' খিকখিক করে হাসল উইক। 'বোমা তৈরিতে একজন বিশেষজ্ঞ গোরো।' বুড়োর দিকে তাকাল সে। 'যে ভাবে করতে বলেছি, করেছেন তো?'

'নিশ্চয়। আমার ভুল হয় না। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে...'

'আপনার পদ্ধতির কথা কে জানতে চায়!' কর্কশ গলায় নিতান্ত অভদ্রের মত বাধা দিল উইক। 'মাল ঠিকঠাক মত ভরেছেন কিনা, সেটা বলুন। এ বাড়িটাকে নেই করে দিতে পারবে তো?'

ধড়াস করে এক লাফ মারল কিশোরের হৃৎপিণ্ড। ওদের সহ উড়িয়ে দেয়ার কথা ভাবছে না তো খেপা লোকটা! গোরোর দিকে তাকিয়ে দেখল, তার চেহারাও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো। বোমাটার গায়ে চেপে বসা আঙুলগুলো সাদা হয়ে গেছে।

'কি বলছেন আপনি, মিস্টার শিপরিজ?' কাঁপা গলায় বলল সে। 'আপনি আমাকে বলেছেন কনস্ট্রাকশনের কাজে বোমাটা ব্যবহার করবেন। এখন বলছেন...আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না...'

'পারবেন। খুব শীঘ্রি। বোমাটা ওই টেবিলে রাখুন। আর কিছু করতে হবে না আপনার। যা করার আমিই করব।'

কিন্তু নির্দেশ মানল না আর গোরো। পিছিয়ে গেল এক পা। 'না না, মিস্টার শিপরিজ! আমি বুঝতে পারছি অন্য কোন মতলব আছে আপনার, খারাপ মতলব। মিথ্যে কথা বলেছেন আপনি আমাকে। ছেলেগুলোর কথা

মিথ্যে বলেছেন। ওরা আপনার মেহমান নয়, বন্দি। আসলে প্রতিটি কথাই মিথ্যে বলেছেন আমার সঙ্গে। আমার নতুন আবিষ্কার বাজারজাত করে আমাকে সাহায্য করার কোন ইচ্ছেই আপনার কোনদিন ছিল না। মিথ্যে আশা দিয়েছিলেন আমাকে।'

লাফ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে টান মেরে গোরোর হাত থেকে বোমাটা কেড়ে নিল উইক। প্রচণ্ড এক থাবা মেরে মেঝেতে ফেলে দিল বেচারা বুড়ো মানুষটাকে। পড়ে রইল গোরো। ওঠার সামর্থ্যও হলো না।

একুশ

বোমাটা টেবিলে রেখে দড়ি বের করল উইক। গোরোর হাত-পা বাঁধল শক্ত করে। বলল, 'হ্যাঁ, গোরো, ঠিকই বলেছ, ছেলেগুলো আমার বন্দি। এখন তুমিও হলে। আসলে বন্দি তুমি সব সময়ই ছিলে, কিন্তু গবেষণায় এতটাই ডুবে ছিলে, বুঝতে পারোনি সেটা।'

সোজা হলো উইক। চোখ জ্বলছে। নিমেষে কেমন বদলে গেছে ভাবভঙ্গি। কঠিন গলায় বলল, 'বোমা বানাতে কতখানি সফল হলে, নিজের আবিষ্কারের ফল এখন নিজেই পরখ করতে পারবে। তুমি ভাগ্যবান, তাই না? এতবড় সুযোগ ক'টা মানুষে পায়?'

ভাঙা গলায় গোরো বলল, 'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার, উইক, বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছ! এ সব করে বাঁচতে পারবে না তুমি!'

'তাই নাকি? দেখা যাবে। তবে তার আগে তোমার মুখটা বন্ধ করা দরকার।'

এক টুকরো কাপড় এনে গোরোর মুখে ঠেসে ভরে দিল উইক। 'এইবার আমার আসল কাজ চলবে।' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার সহকারীগুলো ধরা পড়ে সর্বনাশ করে দিল। থাকলে এখন সাহায্য হত।'

আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল বন্দিরা, পকেট থেকে কয়েক টুকরো তার বের করল উইক। কালো বাক্সটার ওপর ঝুঁকে বসে কাজ শুরু করল। দ্রুত নড়াচড়া করছে তার আঙুল, তারগুলোকে যুক্ত করে দিচ্ছে বাক্সের অ্যান্টেনার সঙ্গে। তারপর বাক্সটা নিয়ে গিয়ে রাখল ঘড়িটার কাছে। তারের অন্য মাথা যুক্ত করল ঘড়ির সঙ্গে। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'দেখলে গোরো, কেবল তুমিই নও, এ সব কাজ আমিও করতে পারি।'

কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়াল উইক। নাটকীয় ভঙ্গিতে বিশাল ঘড়িটা দেখাল বন্দিদের। 'সময়টা দেখে রাখো। তিনটায় সেট করে দিয়েছি। ঘণ্টার কাঁটা যখন তিনের ঘরে পৌঁছবে, ফেটে যাবে বোমা।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে দুই গোয়েন্দা। একটা বেজে গেছে। মনে পড়ল সেই কথা: ঘড়ির সাহায্যে সারা হবে কাজটা···

যেন ওদের মনের কথা পড়তে পেরেই উইক বলল, 'সেদিন রেস্টুরেন্টে কি কথা শুনেছিলে মনে আছে? ঘড়ির সাহায্যে সারা হবে কাজটা। এখন বুঝলে তো কি সারা হবে?' সন্তুষ্টির হাসি হাসল সে। 'তবে সেদিন তোমাদের ওড়ানোর কথা বলিনি, কেবল বাড়িটা ধসিয়ে দেয়ার আলোচনা করছিলাম। কল্পনাই করিনি, সময় মত তোমরাও এসে হাজির হবে, কাজ সহজ করে দেবে আমার। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে যাবে। আজকের পর আর কোনদিন আমার কাজে নাক গলাতে আসতে পারবে না তোমরা। ওই বিরক্তিকর ককারটাও না।'

মাথা ঠাণ্ডা রাখো, ভয় পেলে সর্বনাশ হবে!—নিজেকে বোঝাল কিশোর। হাত-পায়ের বাঁধন খোলার জন্যে টানাটানি শুরু করেছিল। ককারের কথা বলতেই কান খাড়া করল।

ককার! কোথায় আছেন ব্যাংকার! তাঁকেও এ বাড়িরই কোনখানে আটকে রাখেনি তো উন্মাদটা!

রবিনও বাঁধন খোলার চেষ্টা করল। এঁটে বসল আরও দড়ি।

দেখে হাসল উইক, 'করো, চেষ্টা করা ভাল। তবে লাভ হবে না। অত কাঁচা কাজ করি না আমি। নিজে নিজে যদি খুলতে পারো, বেরিয়ে যাও, বাধা দেব না।'

কিশোরও বুঝল, খুলতে পারবে না। অহেতুক আর সেই চেষ্টা করল না।

ওদের ব্যর্থ হতে দেখে মজা পাচ্ছে যেন উইক। বলল, 'কি করে এই গুপ্তঘরটা আবিষ্কার করলাম, জানার কৌতূহল হচ্ছে নিশ্চয়? সে-জন্যে গোরোকে ধন্যবাদ দিতেই হয়।'

কি করে চোরাই মাল লুকানোর জন্যে একটা জায়গা খুঁজতে খুঁজতে রিভেরা হাউসটার ওপর চোখ পড়ে উইকের, খুলে বলল। মাল রাখতে এসেই একদিন দেখা হয়ে গেল গোরোর সঙ্গে।

'গোরো বলল, সে নাকি ফ্র্যান্সিস রিভেরার খালাত ভাই। ছোটবেলা থেকেই এ বাড়ির সবখানে খেলা করেছে, গুপ্তঘরগুলো সব চেনে। ঘড়ি-ঘরে ঢোকার একটা চাবিও আছে তার কাছে। আবিষ্কারের নেশা আছে তার। রিভেরা মারা যাওয়ার পর তার মনে হলো, তাই তো, গুপ্তঘরটায় গিয়ে গবেষণা করলে তো মন্দ হয় না। বিরক্ত করতে আসবে না লোকে। মন দিয়ে কাজ করা যাবে। সে-জন্যেই এসেছিল। দেখা হয়ে গেল আমার সঙ্গে।

'আমি ভাবলাম, তাকে কাজে লাগানো দরকার। ঘরটা খুলে দিতে সে আমাকে সাহায্য করবে। সেই ঘরে মাল রাখলে নিজের অজান্তে সেগুলো পাহারাও দেবে। তাকে লোভ দেখালাম, আমি একটা ল্যাবরেটরি বানিয়ে দিতে পারি। নতুন ধরনের যে কোন আবিষ্কার করতে পারলে সেটা বাজারজাত করতে সাহায্য করতে পারি। আমার টোপ গিলে নিল সে।

'তারপর থেকে নিশ্চিন্তে ওখানে চোরাই মাল রাখতে লাগলাম। গবেষণা নিয়েই ব্যস্ত থাকত গোরো। আমি কি এনে রাখলাম না রাখলাম তা নিয়ে মাথা

ঘামাত না। চোখ তুলেও দেখত না। ভালই চলছিল। বাদ সাধল একদিন ককার। বাড়িটা কিনে নিল। বিপদে পড়ে গেলাম। তাকে না তাড়ালেই নয়। হুমকি দিয়ে নোট লিখে রেখে এলাম তার গুপ্তঘরে। সেগুলো পেয়েই সে তোমাদের ডেকে আনল।'

দম নেয়ার জন্যে থামল উইক। শয়তানি হাসি ফুটল চোখের তারায়। 'নিশ্চয় ভাবছ, কি করে ওই বন্ধ ঘরে নোট রেখে এলাম? সে কথা বলছি না তোমাদের। এই একটা কৌতূহল নিয়ে মরতে হবে তোমাদের, কোনদিনই জানতে পারবে না।

'হ্যারিস এসেছিল যে রাতে, সে-রাতে একটা ভয়ানক চিৎকার শুনেছ তোমরা। আমিই করেছি চিৎকারটা। ভয় দেখিয়ে বুড়োটাকে তাড়ানোর জন্যে। যে ভাবে ছোঁক ছোঁক করছিল, ওকে তাড়ানোর আর কোন উপায় ছিল না।'

ঘড়ির দিকে তাকাল উইক। দুটো বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। আপন মনেই বলল, 'নাহ্, আর দেরি করা যায় না। এবার যেতে হয়। সময় থাকতেই দূরে সরে যাওয়া উচিত।'

ঘড়ির পেছনের গুপ্তঘরটায় গিয়ে ঢুকল সে। বাক্স ফেলার শব্দ কানে আসতে লাগল গোয়েন্দাদের। কয়েক মিনিট পর ক্যানভাসের একটা বড় ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল উইক।

বাইরে ঝিলিক দিয়ে উঠল তীব্র আলো। মুহূর্ত পরে বজ্রপাতের বিকট শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠল বাড়িটা। তারপর নামল বৃষ্টি। মুষলধারে।

'ঝড় আসছে,' উইক বলল। 'এবার বিদায় নিতে হয় তোমাদের কাছে।' এগোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেল সে। 'ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা। পান্নাগুলো কোথায় আছে ভাবছ তো?' কাঁধের ব্যাগটাতে চাপড় দিল সে। 'এটার মধ্যে। আলোটা জ্বেলে রেখে যাচ্ছি যাতে ঘড়ির কাঁটা দেখতে পাও। চলি। গুডবাই।'

বেরিয়ে গেল সে। সামনের দরজা খুলে বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল।

বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব।

তারমধ্যেও কানে আসছে বিশাল ঘড়িটা চলার জোরাল শব্দ:

টিক-টক! টিক-টক! টিক-টক!

বাইশ

সময় কাটছে। কাটছে না বলে বলা যায় উড়ে চলেছে। এমনই হয়। সময় দ্রুত কাটার জন্যে যখন অপেক্ষা করে মানুষ, তখন মনে হয় কাটছেই না। বড় ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। আর এখন যখন ওরা চাইছে না কাটুক, তখন যেন ছুটছে ঘড়ির কাঁটা।

কি করে যে পৌনে তিনটে বেজে গেল, টেরই পেল না।

'জানোয়ার!' দাঁতে দাঁত চাপল কিশোর। 'এ ভাবে আমাদেরকে ছিন্নভিন্ন হওয়ার জন্যে ফেলে গেল!'

হাতে-পায়ে কেটে বসছে দড়ি। মরিয়া হয়ে টানাটানি শুরু করল ঢিল করার জন্যে। সেই একই অবস্থা। লাভ হলো না। সামনের দিকে ছুঁড়ে দেয়ার চেষ্টা করল নিজেকে, যাতে চেয়ার নিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে। যাতে বোমাটার কাছাকাছি যেতে পারে।

এতেও কাজ হলো না।

রবিন শরীর মোড়ামুড়ি করে হাতটাকে নিয়ে যেতে চাইছে তার পকেটের পেন্সিল কাটার ছোট ছুরিটার কাছে। সেটা আরও অসম্ভব মনে হলো। পকেটের ধারেকাছেও যাচ্ছে না আঙুল।

চুপ করে একই ভাবে পড়ে আছে গোরো। মেনে নিয়েছে যেন এই ভয়াবহ পরিণতি। এই অবস্থার জন্যে মনে মনে নিজেকে দোষারোপ করছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

এগিয়ে যাচ্ছে ঘড়ির কাঁটা।

আতঙ্কিত চোখে দেখল ছেলেরা, তিনটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি!

চেয়ারে হেলান দিল ওরা। ধসে পড়ল যেন শরীরটা। হাতলের ওপর ঢিল হয়ে গেল আঙুলগুলো। আর কোন আশা নেই!

প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। কাঁপিয়ে দিল বাড়িটাকে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল শব্দ। সামনের বড় জানালাটায় দৃষ্টি যেন আটকে গেছে রবিনের। একটা নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে যেন।

দূর, আতঙ্কে মাথা গরম হয়ে গেছে!—ভাবল সে।

কিন্তু চোখ সরাতে পারল না। তারপর যা দেখল, বিশ্বাস করতে পারল না নিজের চোখকে। কাঁচের ওপাশে একটা মুখ। অতি পরিচিত। মুসার!

হাঁ করে তাকিয়ে আছে রবিন।

ঝনঝন করে জানালার কাঁচ ভাঙল। পাল্লা খুলে ঘরে ঢুকল মুসা।

ঘড়ি দেখল কিশোর। আর মাত্র দুই মিনিট। বলল, 'জলদি করো মুসা!' চেঁচিয়ে বলার চেষ্টা করল, কিন্তু জোর নেই গলায়। 'বোমা লাগানো আছে! দুই মিনিট পরেই ফাটবে! রবিনের পকেটে ছুরি আছে! আগে আমার দড়ি কাটো!'

দৌড়ে এল মুসা। কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে সময় যেন স্থির হয়ে গেল। ঘোরের মধ্যে যেন মুসাকে দড়ি কাটতে দেখল কিশোর। মুক্ত হওয়ার পর আর একটা সেকেণ্ড দেরি করল না। লাফ দিয়ে উঠে প্রায় ডাইভ দিয়ে গিয়ে পড়ল ঘড়িটার কাছে। হ্যাঁচকা টানে ঘড়ির সঙ্গে যুক্ত বোমার তারগুলো ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন করে দিল। এতক্ষণ পর রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে পায়ে। বিচিত্র একটা যন্ত্রণা। শরীরের ভার রাখতে পারল না আর পা দুটো। ধপাস করে পড়ে গেল মেঝেতে।

ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

ঢঙঙ! ঢঙঙ! ঢঙঙ!

তিনবার বাজল ঘণ্টা। কিছুই ঘটল না। স্বস্তিতে চোখ মুদল কিশোর।

দড়ি কেটে অন্য দু'জনকেও মুক্ত করে ফেলল মুসা।

গোটা দুই গোঙানি দিয়ে উঠে বসল গোরো। কাঁপা খসখসে গলায় বলল, 'আহ্, বাঁচালে! ঈশ্বরের দূত হয়ে এসেছ নাকি তুমি!'

চেয়ারে বসে থেকেই রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হওয়ার সময় দিল রবিন। তবে মুখে গোঁজা কাপড়টা টেনে খুলে ফেলল। 'কোটি কোটি ধন্যবাদ দিলেও ওর ঋণ শোধ করতে পারব না আমরা! যমের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনেছে!'

দুই হাত তুলে নাড়তে লাগল মুসা, 'আরি বাবারে থামো না! প্রশংসার ঠেলায় তো পাগল হয়ে যাব! হয়েছিলটা কি?'

'আমাদের কথা বলার অবস্থা নেই এখন। তুমি কি করে এলে, আগে সেই কথা বলো।'

'সন্ধ্যায় স্যালভিজ ইয়ার্ডে গিয়ে শুনলাম, দুপুরে খেয়েই বেরিয়ে গেছ। অপেক্ষা করতে লাগলাম। যতই রাত হতে লাগল, তোমরা ফিরলে না, মেরি আন্টির সঙ্গে সঙ্গে আমারও দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকল। মাঝরাতেও যখন দেখা নেই তোমাদের, আর থাকতে পারলেন না আন্টি। পুলিশকে ফোন করলেন। ওরাও কিছু বলতে পারল না। ইয়ান ফ্লেচার অফিসে নেই। যে অফিসার ধরল, সে কথা দিল খুঁজতে বেরোবে। তবে কখন বেরোতে পারবে, বলতে পারল না। অস্থির হয়ে পড়লাম। হঠাৎ করেই মনে হলো রিভেরা হাউসের কথা। তাই তো, ওখানে গিয়ে কোন বিপদে পড়োনি তো!'

'এটা ভাবার জন্যে আরেকবার তোমাকে ধন্যবাদ, মুসা,' কিশোর বলল। 'এই কালো জিনিসটা দেখছ? একটা সাংঘাতিক বোমা। তুমি আসতে যদি আর কয়েক মিনিট দেরি করতে, এতক্ষণে এই বাড়িটার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতাম।'

'খাইছে!' ভয়ে ভয়ে বাক্সটার দিকে তাকাতে লাগল মুসা, 'বলো কি! এই শয়তানিটা কে করল? ফাটার ভয় নেই তো আর?'

'না, নেই,' মাথা নেড়ে বলল গোরো। দুর্বল ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। বোমাটা নেয়ার জন্যে এগোল।

'আপনি ঠিক আছেন তো, মিস্টার কিনডার? সাংঘাতিক জোরে মেরেছে আপনাকে উইক শয়তানটা!'

'আমি ঠিকই আছি। তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তোমরা না থাকলে আজ আমাকে মরতে হত। আমাকে ভেতরে রেখে বোমা ফিট করে চলে যেত। সব আমার দোষ। ওর কথা বিশ্বাস করে এত ভয়ঙ্কর একটা জিনিস বানাতে গেলাম কেন?'

'আপনি তো আর খারাপের জন্যে বানাননি, ভালর জন্যে বানিয়েছেন। উইক যে আপনার সঙ্গে বেঈমানি করবে, ওদের শয়তানির সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করে দেয়ার জন্যে বাড়ি উড়িয়ে দিতে চাইবে, সেটা জানতেন না। অতএব

দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। তা ছাড়া আমাদের কোন ক্ষতিও হয়নি। বহাল তবিয়তে আছি সবাই।'

'এইবার বলে ফেলো তো সব,' তাগাদা দিল মুসা। 'আর টেনশনে থাকতে রাজি নই।'

'সে-সব পরে শুনলেও হবে। বিপদ এখনও শেষ হয়নি। লুকিয়ে পড়তে হবে আমাদের। নিশ্চয় দূরে কোথাও অপেক্ষা করবে উইক, দেখবে বাড়িটা ধ্বংস হলো কিনা। বোমা ফাটার শব্দ না পেলে কি হলো দেখার জন্যে আবার ফিরে আসতে পারে।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'তাই তো! এ কথা তো ভাবিনি! ওর কাছে পিস্তল থাকতে পারে। এবার এলে আর বাঁচতে দেবে না আমাদের।'

উদ্বিগ্ন হলো মুসা, 'কোথায় লুকাব?'

গুপ্তঘরটার দিকে হাত তুলল কিশোর।

ঘড়ির পেছনের ফোকরটা এতক্ষণ নজরে পড়েনি মুসার। দেখে হাঁ হয়ে গেল। 'খাইছে! ওটা আবার কি?'

'এসো। গেলেই দেখবে।'

ছেলেদেরকে টর্চ জ্বালতে বলে সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল গোরো। সবাইকে নিয়ে গুপ্তঘরটার দিকে এগোল। সবার শেষে ঢুকল রবিন। কি করে ফোকরের দরজা বন্ধ করতে হবে, বলে দিল গোরো। বন্ধ করল রবিন। সামান্য ফাঁক রেখে দিল, বাইরের ঘরে কি ঘটছে দেখার জন্যে।

তেইশ

ঘরটা দেখল ছেলেরা। বেশ বড়। মোটা পাইপ দিয়ে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মনে হলো, অন্য গুপ্তঘরটাও রয়েছে এটার ঠিক ওপরে। টর্চের আলোয় দেখা গেল কিছু আসবাব, কাজের বেঞ্চ, কিছু যন্ত্রপাতি, একটা হট প্লেট আর একটা খুদে রেফ্রিজারেটর।

'বাহ্, সুবিধা তো ভালই আছে,' রবিন বলল।

'এটা আমার ল্যাবরেটরি,' গোরো বলল। 'খারাপ বলা যাবে না।'

দরজার কাছে ঘাপটি মেরে রইল ওরা। ইয়ার্ড থেকে বেরোনোর পর যা যা ঘটেছে, মুসাকে বলার সুযোগ পেল রবিন আর কিশোর।

তিনজনে মিলে ভাবতে লাগল, ককার কোথায় আছে। কিন্তু এ মুহূর্তে বাড়িটা খুঁজে দেখার জন্যে বেরোতে সাহস পেল না। বসে আছে উইকের অপেক্ষায়।

থেমে এসেছে বিদ্যুৎ চমকানো। বজ্রপাত আরও আগেই বন্ধ হয়েছে। অন্ধকার নিঃশব্দতার মধ্যে এখন বেশি করে কানে বাজছে:

টিক-টক! টিক-টক! টিক-টক!

কিন্তু শব্দটা এখন কিশোরদের কাছে ভীতিকর নয়।
হঠাৎ স্নায়ু টানটান হয়ে গেল ওদের। সামনের দরজা খোলার শব্দ শুনেছে। লিভিং-রুমে ঢুকল পদশব্দ। আলো জ্বলল।
দরজার ফাঁকে চোখ রাখল রবিন। মোলায়েম গলায় বলল, 'উইক!'
অন্যেরাও গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এল ফাঁকে চোখ রাখার জন্যে। থমকে দাঁড়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে। ছেঁড়া তারগুলো দেখল। যে চেয়ারে বন্দিরা বাঁধা ছিল, ওগুলো দেখল শূন্য। কাটা দড়ি পড়ে আছে মেঝেতে।
'ধরতে বেরোব নাকি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।
মাথা নাড়ল কিশোর, 'এখন না।'
উন্মাদ হয়ে গেল যেন উইক। রাগে লাল হয়ে গেল মুখ। হ্যাঁচকা টানে একটা চেয়ার তুলে মেঝেতে বাড়ি মেরে ভাঙল। চিৎকার করে বলতে লাগল, 'পালিয়েছে! কি ভাবে…'
টান দিয়ে পকেট থেকে পিস্তল বের করল। ছাতের দিকে তুলে ট্রিগার টিপতে শুরু করল। ম্যাগাজিনের গুলি শেষ না করে থামল না।
'খালি করে ফেলেছে!' ফিসফিস করে বলল রবিন। 'ভাল!'
পিস্তলটা মেঝেতে আছড়ে ফেলে চারপাশে তাকাতে লাগল উইক। দু'চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। আচমকা হেসে উঠল অট্টহাসি। 'হুমকি দিয়ে নোট রেখে আসার কথা প্রমাণ করতে পারবে না ওরা, যদি আমি আবিষ্কারটা ধ্বংস করে দিই…গোরোর মহামূল্যবান আবিষ্কার…'
ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল সে। দুড়দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।
'না না!' দম আটকে যাবে যেন গোরোর। 'ওকে এ কাজ করতে দেয়া যাবে না! আটকাতে হবে!'
'চলুন!' সোজা হয়ে দাঁড়াল কিশোর।
গুপ্তঘর থেকে বেরিয়ে এল চারজনে। দৌড়ে ঢুকল সামনের হলঘরে।
অন্ধকার সিঁড়িতে শোনা গেল উইকের গর্জন, 'বিচ্ছুর দল! সর্বনাশ করে দিয়েছে সব! আমি ওদের ছাড়ব না!'
সিঁড়িতে পা রাখল গোরো। নিঃশব্দে উঠতে শুরু করল। তাকে অনুসরণ করল তিন গোয়েন্দা। আবিষ্কার বাঁচানোর জন্যে এতটাই মরিয়া হয়ে উঠেছে বুড়ো মানুষটা, ছেলেদেরও পেছনে ফেলে দ্রুত উঠে যাচ্ছে।
'মিস্টার কিনডার, সাবধান!' ডেকে বলল রবিন।
'ছাতে ওঠার আগেই শয়তানটাকে থামাতে হবে!'
সিঁড়ির মাথায় এসে দম নেয়ার জন্যে থামল সে।
পাশে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।
ওপরে তাকাল কিশোর। আরও সিঁড়ি আছে। চিলেকোঠায় উঠে গেছে। ওপরের দিকে করে টর্চ জ্বালল। আলোক রশ্মিতে ধরা পড়ল উইক শিপরিজের মুখ, মুখ বিকৃত করে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে।
'উইক, আর শয়তানির চেষ্টা করে লাভ নেই,' কিশোর বলল, 'আপনার

চেয়ে সংখ্যায় আমরা অনেক বেশি। গায়ে যত জোরই থাক, চারজনের সঙ্গে পারবেন না। নেমে আসুন। জলদি!'

নড়ল না উইক। চোখের খেপা দৃষ্টি আরও খেপা হচ্ছে।

'নামুন বলছি!' ধমক দিয়ে বলল রবিন। 'আপনার জারিজুরি খতম!'

নড়ে উঠল উইক। ওপর থেকে ঝাঁপ দিল ওদের লক্ষ্য করে। ভারি শরীর নিয়ে ভয়াবহ গতিতে এসে পড়ল ওদের ওপর। সবাইকে ফেলে দিল। ওরা যখন সিঁড়িতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, রেলিং ধরে উঠে দাঁড়াল সে। লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে যেতে শুরু করল।

'ধরো ওকে, মুসা,' চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'ওকে পালাতে দেয়া যাবে না! আমিও আসছি! রবিন, তুমি যাও মিস্টার কিনডারের সঙ্গে। ওপরে চলে যাচ্ছে। ছাতে উঠতে দিয়ো না তাকে। এই শরীর নিয়ে উঠতে গেলে মারা পড়বে!'

কিশোরের কথা শেষ হওয়ার অনেক আগেই উঠে পড়েছে মুসা। উইকের পিছু নিয়েছে।

রবিন উঠে গেল চিলেকোঠায়। গোরোকে দেখতে পেল না। ঝোড়ো বাতাসে ঝাপটা দিয়ে খুলে ফেলল সামনের একটা জানালার পাল্লা। ওটার কাছে ছুটে এসে বাইরে উঁকি দিল সে।

এখনও মুষলধারে পড়ছে বৃষ্টি। ঠাণ্ডা, প্রবল ঝোড়ো বাতাস বইছে। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এখনও, তবে অনেক দূরে সরে গেছে।

গেল কোথায় গোরো!—ভাবল রবিন। এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পিচ্ছিল ছাতে ওঠার চেষ্টা করলে পিছলে পড়ে মরবে।

জানালাটা দিয়ে ঢালু ছাতের একাংশ চোখে পড়ে। অন্ধকারের মধ্যেও আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে চিমনিটা।

'গোরো!' অস্ফুট স্বরে বলে উঠল রবিন।

এক হাতে চিমনি পেঁচিয়ে ধরেছে ভিজে চুপচুপে বুড়ো মানুষটা। ইটের তৈরি চিমনির গোড়ায় পা রেখে, কনকনে ঝোড়ো বাতাস আর তুমুল বৃষ্টির পরোয়া না করে, আরেক হাত বাড়িয়ে খুঁজছে কি যেন।

পড়ে মরবে! বাঁচাতে হলে এখুনি যেতে হবে আমাকে!—ভাবল রবিন।

দেরি করল না সে। জানালা গলে নেমে পড়ল স্লেটপাথরে তৈরি পিচ্ছিল টালির ছাতে। তার পাহাড়ে চড়ার সমস্ত অভিজ্ঞতা আর প্র্যাকটিস এক করে ভারসাম্য বজায় রেখে খুব সাবধানে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চলল চিমনিটার দিকে।

চিৎকার করে ডাকল, 'মিস্টার কিনডার, নড়বেন না, আমি আসছি!'

ফিরে তাকাল বৃদ্ধ। বলল, 'ঠিক আছে। ওটা পেয়ে গেছি আমি। নড়ার আর দরকার নেই আমার।'

গোরোর পাশে চলে এল রবিন। 'শান্ত হয়ে আমাকে ধরে থাকুন। আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাব আমরা। সমস্ত ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন। নিজে কিছু করার চেষ্টা করবেন না।'

চিমনি ছেড়ে দিয়ে ওরা ঘুরে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক ঝলক ঝোড়ো বাতাস এসে ঝাপটা মারল। টলিয়ে দিল গোরোকে। সামলাতে পারল না সে। কাত হয়ে পড়ে যেতে শুরু করল। সেই সঙ্গে রবিনকেও কাত করে দিল।

ঠেকাতে পারল না রবিন। পড়ে গেলে দু'জনে। গড়াতে শুরু করল ছাতের ঢালে। দ্রুত সরে যেতে লাগল কিনারের দিকে।

চব্বিশ

বাইরে চলে গেল উইক।

মুসা আর কিশোরও বেরিয়ে এল।

টর্চ জ্বেলে এদিক ওদিক দেখতে লাগল কিশোর। অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে লোকটা।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা, 'দিল মনে হয় গোল খাইয়ে আমাদের!'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'সে-রকমই তো মনে হচ্ছে! ও যে ওরকম করে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে, কল্পনাই করিনি!'

তুমুল বৃষ্টির মধ্যেই টর্চের আলোয় ঝোপঝাড় আর গাছপালার মধ্যে উইককে খুঁজতে লাগল ওরা। কিন্তু তার ছায়াও দেখা গেল না আর।

হঠাৎ একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ হলো। ছুটে ড্রাইভওয়েতে ঢুকল ওটা। আচমকা ব্রেক কষে থামানোর চেষ্টা করায় কর্কশ আর্তনাদ তুলল টায়ার। হেডলাইটের আলো পড়েছে বাড়িটির সামনের অংশে।

'পুলিশ!' চিৎকার করে বলল মুসা।

টপাটপ লাফিয়ে নামল ছয়জন পুলিশ অফিসার। ছুটে এল ওদের দিকে।

সবার আগে রয়েছেন পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচার। 'যাক, পাওয়া গেল। কিশোর, তোমার চাচী তো অস্থির হয়ে পড়েছেন...'

'মুসার কাছে শুনেছি। পরে সব বলব। আগে উইককে খুঁজে বের করা দরকার।'

উইকের কি হয়েছে, অল্প কথায় চীফকে জানাল কিশোর। বলল, 'আমার ধারণা বেরোতে পারেনি, এ বাড়িতেই কোথাও লুকিয়ে আছে। সারাক্ষণ টর্চ জ্বেলে রেখেছি আমরা। আড়াল থেকে বেরোলে আমাদের চোখে পড়তই। এখন আপনারা এসে গেছেন। আর বেরোনোর সাহস পাবে না। ওকে বের করে আনতে হবে।'

চিৎকার করে সহকারীদের নির্দেশ দিলেন চীফ, 'বাড়ির চারপাশে খোঁজো। খেয়াল রেখো, কোনমতেই যেন পেছন দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে। বাড়িতে যত আলো আছে, সব জ্বেলে দাও।'

'ককারও সম্ভবত এ বাড়িতেই আছেন,' কিশোর বলল। 'তাঁকেও খুঁজতে হবে।'

চীফ বললেন, 'তাঁর জন্যে আর চিন্তা করতে হবে না। আমি অফিস থেকে বেরোনোর ঠিক আগে ফোন করেছেন। সারাদিন শহরের বাইরে ছিলেন। তোমাদের বাড়িতেই করেছিলেন। তোমার চাচীর কাছে তোমাদের নিখোঁজ হবার খবর পেয়েছেন। যে কোন মুহূর্তে এখানে চলে আসতে পারেন।'

আলোয় আলোকিত হয়ে গেল বাড়িটা।

'খাইছে!' হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে উঠল মুসা। ওপর দিকে হাত তুলে দেখাল।

দেখে বরফের মত জমে গেল যেন কিশোর।

টালির ছাতের কিনার ধরে ঝুলছে দুটো ছায়া।

রবিন আর গোরো!

একহাতে গোরোকে পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে রবিন। আরেক হাতে টালির কিনার খামচে ধরে ঝুলে আছে।

পাশে তাকাল কিশোর। মুসা নেই। চিৎকার করেই সরে গেছে। ঢুকে যাচ্ছে আবার বাড়ির ভেতর।

তার পেছনে ছুটল কিশোর। প্রার্থনা করল, খোদা, আমরা না যাওয়া পর্যন্ত আটকে রাখো ওদের! পড়তে দিয়ো না!

চিলেকোঠার জানালার কাছে পৌঁছে গেল ওরা।

মুসা বলল, 'আমি নেমে যাচ্ছি। তুমিও এসো। আমার গোড়ালি চেপে ধরে রাখবে!'

কিশোর বলল, 'না, আমি জোরে পারব না। ভার রাখতে পারব না এতজনের। আমি ওদের তোলার চেষ্টা করব, তুমি ধরে রেখো।'

আপত্তি করল না মুসা।

ভেজা, পিচ্ছিল ছাতে নেমে গেল ওরা। কমে এসেছে বৃষ্টি। কিন্তু নতুন আপদ দেখা দিয়েছে। কুয়াশা জমতে আরম্ভ করেছে। বুড়ো আঙুল বাঁকা করে পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা।

এখনও ঝুলে আছে রবিন। দেয়ালের গায়ে ছাতের একপাশে টালি যেখানে গাঁথা হয়েছে, তার কাছাকাছি রয়েছে। নিশ্চয় টালির খাঁজে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে সে, নইলে একটা সেকেণ্ডও ঝুলে থাকা সম্ভব হত না।

টর্চ জ্বেলে দেখল কিশোর, টালিতে নয়, কিনার দিয়ে চলে যাওয়া ছাতের পানি নিষ্কাশনের পাইপ আঁকড়ে ধরে ঝুলছে রবিন। গোরোও এখন পুরোপুরি রবিনের ওপর ভর দিয়ে নেই, তার একটা হাতও পাইপ চেপে ধরেছে। তাতে অনেকটা ভার কমেছে রবিনের ওপর থেকে।

একপাশের দেয়ালের যে শিরাটা বেরিয়ে আছে, সাইকেলের সীটে বসার মত করে তাতে বসল মুসা। দুই পা আর গোড়ালি দিয়ে দু'দিক থেকে চেপে ধরল দেয়ালটা। কিশোরকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে বলল।

মাথা নিচে পা ওপর দিকে করে ঢালু ছাতে শুয়ে পড়ল কিশোর। শক্ত করে তার গোড়ালি চেপে ধরল মুসা।

সামনে হাত লম্বা করে দিল কিশোর। কিন্তু অল্পের জন্যে রবিনের হাতের নাগাল পেল না। বলল, 'মুসা, পারছি না!'

খুব সাবধানে শিরাটার ওপর ঘষটে ঘষটে আরও কয়েক ইঞ্চি নামল মুসা। হাত এগিয়ে গেল কিশোরের। তার আঙুলগুলো রবিনের হাত ছুঁতে পারল। রবিনের কব্জি চেপে ধরল। বলল, 'রবিন, ছেড়ে দাও! তোমার আঙুলগুলো দিয়ে আমার কব্জি পেঁচিয়ে ধরো!'

ধরল রবিন। আরেক হাতে গোরোকে ঠেলতে লাগল ওপর দিকে, ছাতে তুলে দেয়ার জন্যে।

অন্য হাত দিয়ে গোরোর হাত চেপে ধরল কিশোর। টানতে লাগল ওপর দিকে।

সাংঘাতিক কঠিন আর যন্ত্রণাদায়ক একটা কাজ। তবে সফল হলো সে। আস্তে আস্তে ওপর দিকে উঠে আসছে গোরো।

দুর্বল হয়ে পড়েছে রবিন। কিশোরের হাতে তার ভার পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে গোরোকে আরও জোরে ঠেলতে লাগল।

অবশেষে ছাতে উঠে এল গোরো। উপুড় হয়ে তাকে চুপ করে শুয়ে পড়তে বলল কিশোর। পড়ে থাকুক। রবিনকে তুলে আনার পর তার ব্যবস্থা করবে।

সবচেয়ে বেশি ভার বহন করতে হচ্ছে মুসাকে। কিন্তু একচুল ঢিল করল না আঙুলের চাপ। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে রইল সে।

রবিনও উঠে এল ওপরে। কিশোরের হাতে চাপ অনেকখানি কমল।

'তুমি গোরোর পা ধরো,' কিশোর বলল। 'আমি তাকে ধরে রাখছি।'

খুব ধীরে তাড়াহুড়ো না করে একটা মানব-শেকল তৈরি করল ওরা। মুসা ধরে রেখেছে কিশোরের পা। কিশোর ধরল গোরোর দুই হাত। রবিন ধরল গোরোর দুই পা। পিচ্ছিল ছাতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে পরের তিনজন। টেনে টেনে তাদেরকে সরিয়ে আনতে শুরু করল মুসা।

অবশেষে ছাতের কিনার থেকে সরে এল সবাই।

কিশোর আর রবিনও শিরা আঁকড়ে ধরে হাঁপাতে লাগল।

এই ভয়াবহ টানাটানিতে একেবারেই কাহিল হয়ে পড়েছে গোরো। তাকে ধরে রাখল মুসা।

হাঁপাতে হাঁপাতে রবিন বলল, 'ভালই সার্কাস দেখালাম আমরা, কি বলো! আর কোন কাজ না পেলে দড়াবাজিকর হয়েও ভাত জোগাড় করতে পারব!'

পঁচিশ

বাতাস অনেক কমে গেছে, তাই রক্ষা। গোরোকে নিয়ে ছাতের ওপর দিয়ে চিলেকোঠার জানালার দিকে এগোতে অতটা অসুবিধে হলো না ছেলেদের। নিচে হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। উইককে খুঁজতে ব্যস্ত পুলিশ। গোয়েন্দাদের খোঁজ এখনও পড়েনি নিশ্চয়।

জানালা টপকে ভেতরে ঢুকল প্রথমে রবিন আর কিশোর। নিচে থেকে গোরোকে ওপর দিকে ঠেলে দিল মুসা। তাকে টেনে তুলে আনল দু'জনে। মুসা ঢুকল সবার শেষে।

ভয়ানক পরিশ্রম গেছে। চিলেকোঠার মেঝেতেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

দুর্বল ভঙ্গিতে ছেলেদের দিকে তাকাল গোরো, 'তোমাদের কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই! নিজের প্রাণের বিন্দুমাত্র মায়া করলে না! সত্যি বলছি, এত বয়েস হলো, এ রকম ছেলে আমি দেখিনি! তোমরা একেকটা হীরের টুকরো!'

কিশোর ও মুসাকে বলল রবিন, 'আর আমার নেই তোমাদের দু'জনকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা! ছাতের কিনার ধরে ঝুলে পড়ার পর একবারও ভাবিনি আজ বেঁচে-ফিরে আসতে পারব!'

মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর, 'খাওয়া নিয়ে আর তোমাকে ঠাট্টা করব না, মুসা। যত মন চায় খেয়ো। তোমার ওই গণ্ডারের শক্তিই কেবল আজ দুটো প্রাণকে রক্ষা করল। ধন্যবাদ।'

দরাজ হাসি হাসল মুসা, 'শুকনো ধন্যবাদে কাজ হবে না। আজ রাতেই শিক কাবাব খাওয়াতে হবে। বিশ-পঁচিশ, যতটা খেতে চাই। পয়সার মায়া করতে পারবে না।'

'করব না। চলো, উইককে পাওয়া গেল কিনা দেখি।'

নামতে শুরু করল ওরা। সবার পেছনে আসতে আসতে চিৎকার করে উঠল গোরো, 'আমার আবিষ্কার! ভুলেই গিয়েছিলাম ওটার কথা!'

গোরোকে যেতে দিলে আবার কোন বিপদ বাধাবে। তাই কেউ বাধা দেয়ার আগেই আবার ছুটে চিলেকোঠায় উঠে গেল রবিন। জানালা গলে ছাতে নেমে পড়ল। চিমনির দিকে রওনা হলো। চিমনির কাছে এসে একহাতে চিমনি ধরে আরেক হাত ফোকরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে হাতড়াতে শুরু করল।

কি যেন হাতে লাগল। বের করে আনল সেটা। তারের একটা বাণ্ডিলের মত জিনিস। একমাথায় একটা অদ্ভুত যন্ত্র লাগানো। সেটা পকেটে ভরে চলে এল আবার জানালার কাছে।

তাকে ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করল মুসা। 'ছাতে ঘোরার নেশায় পেল

নাকি আজ তোমাকে? ঘটনাটা কি?'

পকেট থেকে জিনিসটা বের করল রবিন। 'মিস্টার কিনডার...'

সে কথা শেষ করার আগেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল গোরো। ধকল সহ্য করতে পারেনি আর তার বুড়ো শরীর।

ধরাধরি করে তাকে নিচের লিভিং-রুমে নিয়ে এসে একটা লম্বা সোফায় শুইয়ে দেয়া হলো।

এই সময় ঘরে ঢুকলেন ফ্লেচার। সঙ্গে আরেকজন লোক। মাথায় স্ট্র হ্যাট।

'মিস্টার ককার!' বলে উঠল রবিন।

দ্রুত এগিয়ে এলেন ব্যাংকার। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'যাক, তোমরা ভালই আছ। তোমাদের কিছু হলে নিজেকে...'

বাধা দিল কিশোর, 'আমরা ঠিকই আছি। তবে মিস্টার কিনডারের সাহায্য লাগবে। বেহুঁশ হয়ে গেছে।'

একজন অফিসারকে গাড়ি থেকে ফার্স্ট এইড বক্স আনতে পাঠালেন চীফ।

ছাতের ওপর ওদের ভয়াবহ অ্যাডভেঞ্চারের কথা বলল ছেলেরা।

পকেট চাপড়ে রবিন বলল, 'মিস্টার কিনডারের আবিষ্কার এখন আমার পকেটে।'

চীফ জানালেন, 'উইককে পেলাম না। রোডব্লকের আদেশ দিয়ে দিয়েছি আমি। শহর থেকে বেরোতে যাতে না পারে। সাংঘাতিক পিচ্ছিল চোরটা! একেবারে পাঁকাল মাছ!'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে থমকে গেল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'গোলাঘরটায় খুঁজেছেন?'

'কোন গোলাঘর?'

'যেটাতে গাড়ি লুকিয়েছিল?'

মাথা নাড়লেন চীফ। 'না। মরিস আসেনি, আমরা ওটা চিনিও না, মনেও পড়েনি।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর. 'রবিন, মুসা, এসো আমার সঙ্গে!' বলেই চীফ বাধা দেয়ার আগে রওনা হয়ে গেল দরজার দিকে।

বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। বাইরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ঘন হতে আরম্ভ করেছে কুয়াশার চাদর। ভোঁতা করে দিয়েছে জানালার হলদে আলোগুলোকে। ঘন ঝোপে ঢুকে পড়ল ওরা।

'গোলাঘরে গিয়ে ঢুকেছে ভাবছ নাকি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'হ্যাঁ।'

পেছনে ফিরে তাকাল মুসা। কুয়াশার জন্যে আলোগুলোকে কেমন বিচিত্র লাগছে। টর্চ জ্বালতে গেল।

বাধা দিল কিশোর, 'জ্বেলো না। উইক দেখলে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। কিছুই যাতে টের না পায়। চমকে দিতে হবে ওকে।'

গাছে তৈরি সুড়ঙ্গমুখের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। লতাপাতার ঢাকনা ফাঁক করল রবিন। ভেতরে পা রাখল তিনজনে। টানটান হয়ে আছে স্নায়ু। আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত।

রাত শেষ হয়ে এসেছে। পুবের আকাশে হালকা আলো। সুড়ঙ্গের মধ্যে সেটা প্রবেশ করছে না। এখানে ঘন কালো অন্ধকার। শঙ্কিত হলো কিশোর। এই অন্ধকারে বসে থাকলে নিশ্চয় চোখে সয়ে গেছে উইকের। ওরা দেখার আগেই না ওদেরকে দেখে ফেলে।

ঝুঁকি নিয়েও তাই টর্চ জ্বালার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর।

অন্ধকারের কালো চাদর ফুঁড়ে দিল তীব্র আলোক রশ্মি। সেই আলোয় পথ দেখে দ্রুত এগোল ওরা।

গোলাঘরে ঢুকল। খড়ের গাদা আগের মতই আছে। তবে সামনের দিকের কিছু খড় মাটিতে পড়ে আছে। বেরিয়ে আছে গোপন গ্যারেজের প্লাই উডের দরজা। ভেতরে উঁকি দিল সে।

দেয়ালের কাছে খুট করে একটা শব্দ হতেই পাক খেয়ে ঘুরে তাকাল তিনজনে। মুসার হাতের টর্চের আলো গিয়ে সোজা পড়ল উইকের মুখে। ভিজে, কুঁকড়ে আছে তার কাপড়-চোপড়। চোখে বুনো দৃষ্টি। খড় সরানোর যন্ত্রটা তুলে নিয়েছে। মারাত্মক কাঁটাগুলো যেন ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে।

'এইবার তোমাদের শেষ করব আমি!' বিষাক্ত গোক্ষোরের মত হিসহিস করে উঠল উইক। লাফ দিয়ে এগিয়ে এল ওদের গেঁথে ফেলার জন্যে।'

ছাব্বিশ

'খবরদার!' গর্জন শোনা গেল পেছনে। 'নড়লে খুলি ফুটো করে দেব! হাত থেকে ওটা ফেলো, উইক!'

থমকে গেল উইক। ফিরে তাকাল। দেখল, উদ্যত পিস্তল হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন চীফ ইয়ান ফ্লেচার। পেছনে আরও দু'জন পুলিশ অফিসার। তাদের হাতেও পিস্তল।

একটা মুহূর্ত দ্বিধা করল উইক। তারপর হাত থেকে ছেড়ে দিল যন্ত্রটা। খটাং করে মেঝেতে পড়ল ওটা।

আবার লিভিং-রুমে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা।

উইককে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। কারও দিকে তাকাচ্ছে না সে। খানিক আগের ঝোড়ো আকাশের অবস্থা হয়েছে তার চেহারার।

প্রচণ্ড পরিশ্রম গেছে। তার ওপর ভেজা কাপড়-চোপড়। থরথর করে কাঁপছে তিন গোয়েন্দা। শুকনো চাদরের ব্যবস্থা করা হলো ওদের জন্যে।

শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে গোরো। তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে

গোয়েন্দাদের দিকে ফিরলেন ককার, বললেন, 'আমি একে চিনতে পেরেছি। কয়েক বছর আগে একটা চমৎকার আবিষ্কার করেছিল। তার সেই ইলেকট্রনিক যন্ত্রটা বাজারজাত করার জন্যে টাকা ধার চাইতে এসেছিল আমার কাছে। না দিয়ে তখন ভুল করেছি। যন্ত্রটা লোকের উপকারে লাগত। টাকা না পাওয়াতেই উইক শিপরিজের মত বাজে লোকের খপ্পরে পড়ল। আরেকটু হলেই আজ সর্বনাশ করে ফেলেছিল তার বোমা!'

'শুনেছেন তাহলে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল রবিন।

মাথা ঝাঁকালেন ককার। ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকালেন উইকের দিকে। আবার ছেলেদের দিকে ফিরলেন। 'তবে এবার আর ভুল করব না আমি। ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব কিনডারকে। যত ইচ্ছে গবেষণা করুক, আমার বাড়িটা ব্যবহার করুক, কিচ্ছু বলব না।'

এ কথা শুনে খুশি হলো তিন গোয়েন্দা।

রবিন বলল, 'আজ আপনাকে না পেয়ে আমরা ভেবেছিলাম খারাপ কিছু ঘটেছে। সে-জন্যেই এখানে এসেছিলাম দেখার জন্যে। কি হয়েছিল বলুন তো?'

ব্যাংকার জানালেন, খুব সকালে একটা জরুরী কাজে শহরের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। অফিসকে জানিয়ে যেতে পারেননি। বললেন, 'মাঝরাতে ফিরেছি। বাড়িতে ফিরে জানলাম, আমাকে না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পুলিশ এসেছিল খুঁজতে। ইয়ার্ডে কিশোরের চাচী আর থানায় চীফ ইয়ান ফ্লেচারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম তখন।'

হাতকড়া পরা উইকের দিকে তাকালেন তিনি। 'তোমরা আমার বাড়িতে ঢুকলে কি করে? চাবি পেলে কোথায়?'

খকখক করে হাসল উইক। 'ওটা আর এমন কি ব্যাপার। তালাওয়ালা এনে চাবি বানিয়ে নিয়েছি।'

এই জন্যেই তালার গায়ে আঁচড়ের দাগ দেখা গেছে, ভাবল কিশোর।

'আমার গুপ্তঘরে ঢুকে নোট রেখে এলে কি ভাবে?' জিজ্ঞেস করলেন ককার।

'সেটি বলছি না,' কিশোরদের দেখিয়ে বলল উইক। 'এরা জিজ্ঞেস করেছিল, এদেরকেও বলিনি। মাথায় বুদ্ধি কম না ওদের, পারলে বের করে নিক।'

চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করল কিশোর। হাত বাড়াল, 'রবিন, কিনডারের যন্ত্রটা দেখি দাও তো?'

পকেট থেকে অদ্ভুত যন্ত্রটা বের করে দিল রবিন।

কৌতূহলী হয়ে ওটার দিকে তাকাল সবাই।

হাতে নিয়ে ভাল করে দেখতে লাগল কিশোর। তিন ইঞ্চি লম্বা ছোট একটা প্লাটফর্ম তৈরি করে তাতে দুটো ওয়াটারপ্রুফ ব্যাটারি বসানো হয়েছে। তার নিচে রয়েছে চাকা। এক প্রান্তে ছোট ছোট একজোড়া খাঁজকাটা চোয়ালের মত জিনিস।

'আমার অনুমান ভুল না হলে,' কিশোর বলল, 'চাকাগুলো কয়েকবার ঘোরার পর হাঁ করে খুলে যায় চোয়াল দুটো। ঠিক কতবার ঘুরবে, সেটা সেট করে দেয়া আছে। চোয়াল খুললে চাকাগুলো থেমে যায়। আপনাআপনি আবার যখন চোয়াল দুটো বন্ধ হয়, চাকা চালু হয়ে যায়। তবে তখন উল্টো দিকে ঘোরে।'

'দারুণ খেলনা তো!' ককার বললেন।

'হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস, আপনার গুপ্তঘরে নোট রেখে আসার কাজে এই যন্ত্রটাই ব্যবহার করা হত।'

'কি!'

উইক বাদে সবাই কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে।

'চোয়ালগুলো দেখুন,' কিশোর বলল, 'খাঁজ কাটা আছে। এতে কাগজের টুকরো ধরিয়ে দিলে চেপে ধরে রাখবে। তারের সাহায্যে যন্ত্রটা চিমনি দিয়ে নিচে নামিয়ে দিলে চাকায় ভর করে চলে যাবে ঘরের মাঝখানে। সেখানে চোয়াল খুলে কাগজ ফেলে দিয়ে ফিরে আসবে চিমনির কাছে। তার টেনে তখন আবার এটা তুলে নিলেই হলো। ছাতে উঠে উইক করেছে এই কাজ।'

বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল ককারের চোখ। 'এ জন্যেই,' মাথা দুলিয়ে বললেন তিনি, 'এই জন্যেই আমরা বুঝতে পারিনি টাইম লক লাগানো ঘরে চোর ঢোকে কি করে! এ রকম একটা খেলনা যে তৈরি করে ফেলবে কেউ, কে ভাবতে পেরেছিল!'

উইকের দিকে ফিরল কিশোর। 'আপনি গোরোকে বুঝিয়েছেন, এই খেলনাটা বাজারজাত করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন। তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছেন ওটা। তারপর গিয়ে ওই কুকাজ করেছেন। আশা করি, আর দোষ এড়াতে পারবেন না। গুপ্তঘরে নোট যে আপনিই রেখেছেন, পুলিশ প্রমাণ করতে পারবে এখন, কি বলেন?'

চুপ করে রইল উইক। চোখের দৃষ্টিতে কিশোরকে ভস্ম করার চেষ্টা করতে লাগল।

এখানকার কাজ আপাতত শেষ। উইককে থানায় নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন ফ্লেচার।

হাত তুলল কিশোর, 'এক মিনিট, পান্নার জিনিসগুলো কোথায়, আগে জিজ্ঞেস করে নিই। কোথায় লুকিয়েছেন ওগুলো, উইক?'

এবারেও জবাব দিল না উইক। ঘৃণায় একবার থু-থু ফেলে আরেক দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

বার বার জিজ্ঞেস করেও জবাব পাওয়া গেল না ওর কাছ থেকে। শেষে রাগ করে অফিসারদের আদেশ দিলেন চীফ, 'নিয়ে যাও থানায়, তারপর দেখা যাবে।'

'তারমানে জিনিসগুলো বের করার জন্যে আবার খুঁজতে আসতে হবে,' বলল একজন অফিসার। 'এখনই কাজটা সেরে ফেলব নাকি, চীফ?'

'সেরে ফেললে মন্দ হয় না, আবার আসার ঝামেলা থেকে বাঁচা যাবে। এই, একজন গিয়ে বোমাটা চেক করো তো, ফাটার সম্ভাবনা আছে কিনা দেখো।'

ঘরের মধ্যে চেক করতে গেলে ফেটে গিয়ে যদি দুর্ঘটনা ঘটে যায় এ জন্যে ঝুঁকি নিল না পুলিশ। কালো বাক্সের মত জিনিসটা বের করে নিয়ে বাড়ির কাছ থেকে দূরে খানিকটা খোলা জায়গায় চলে গেল দু'জন অফিসার।

ভীষণ ক্লান্ত তিন গোয়েন্দা। তবু ঠিক করল, পান্নাগুলো না খুঁজে যাবে না। বোমা বের করল যে দু'জন অফিসার তাদের সঙ্গে বেরিয়ে এল।

'কোনখান থেকে শুরু করব?' জানতে চাইল মুসা।

চারপাশে চোখ বোলাতে লাগল কিশোর। সূর্য উঠছে। কুয়াশা কাটতে আরম্ভ করেছে সোনালি রোদ। প্রাসাদ থেকে পাঁচশো গজ দূরে ঝোপে ঢাকা একটা জায়গায় চোখ আটকে গেল তার। আঙুল তুলে দেখাল।

'বাড়িটাতে বোমা ফিট করে দূরে বসে যদি দেখতে চাই ফাটল কিনা, এর চেয়ে ভাল জায়গা আর নেই এ বাড়িতে। সুতরাং ওখান থেকেই শুরু করব।'

বৃষ্টি আর কুয়াশায় ভেজা ঘাস মাড়িয়ে এগিয়ে গেল ওরা। ঝোপগুলোর ভেতর উঁকি দিয়ে দেখল ক্যানভাসের ব্যাগটা আছে কিনা। কিন্তু হতাশ হতে হলো। নেই।

আশপাশে ওরকম জায়গা আর আছে কিনা দেখল। তা-ও নেই।

পুরানো একটা ম্যাপল গাছের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। গোড়ার সামান্য ওপর থেকেই বেশ কয়েকটা ডাল ছড়িয়ে গেছে। কিশোরকে বলল, 'সহজেই ওঠা যাবে। ওতে চড়ে দেখব নাকি ভাল জায়গা আছে কিনা?'

'দেখো।'

গাছটায় চড়া কঠিন কিছু না। নিচের একটা মোটা ডালে চড়ে তাকাল। স্পষ্ট দেখা যায় প্রাসাদটা। আরও ভাল করে দেখার জন্যে মাথার ওপরের একটা ডালে হাত দিতে গিয়েই ধড়াস করে এক লাফ মারল হৃৎপিণ্ড। পাতার আড়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ব্যাগটা।

'পেয়েছি! পেয়েছি!' চিৎকার করে উঠল সে।

দৌড়ে এল মুসা আর কিশোর।

ভারি ব্যাগটা নামাতে রবিনকে সাহায্য করল মুসা।

ব্যাগটা নিয়ে লিভিং-রুমে ফিরে এল ওরা। হেসে বলল কিশোর, 'এগুলো না পেলে হ্যারিসকে খুশি করতে পারতাম না। আর মক্কেলকে খুশি করতে না পারলে মন খুঁতখুঁত করতে থাকে আমাদের।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' হেসে বললেন চীফ।

উইককে নিয়ে চলে গেল অফিসারেরা। সঙ্গে নিয়ে গেল বোমাটা আর ব্যাগে ভরা পান্নার জিনিসগুলো। পরে যার যার জিনিস ফিরিয়ে দিতে পারবে।

তিন গোয়েন্দাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার জন্যে রয়ে গেলেন চীফ। ককার আর গোরোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, পরে দেখা করবে কথা দিয়ে ওরাও

বাড়ি যেতে তৈরি হলো।

মুসা বলল, 'একটা জরুরী কথা কিন্তু ভুলে গেছ।'

'কি?' ভুরু কোঁচকাল কিশোর।

'শিক কাবাব। পঁচিশটা খাওয়ানোর কথা ছিল।'

পঁচিশটা শিক কাবাব। কৌতূহল হলো ব্যাংকারের। ঘটনা কি জানতে চাইলেন।

জানানো হলো তাকে।

শুনে হাসতে শুরু করলেন তিনি। ফ্লেচার আর গোরোও হাসল।

ককার বললেন, 'কুছ পরৌয় নেই, আমি খাওয়াব তোমাকে শিক কাবাব। যত খেতে পারো। পঞ্চাশটা খেলেও আপত্তি নেই। এখন বাড়ি যাও। বিশ্রাম নাও। বিকেলে চলে এসো এখানে। তোমাদের সঙ্গে আমার আরও কথা আছে। বুদ্ধিমান মানুষের সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগে। তোমাদের নিয়ে একসঙ্গে বেরোব। যে রেস্টুরেন্ট দেখাবে মুসা, তাতেই ঢুকব। ঠিক আছে?'

ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল মুসা, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, স্যার।'

'ধন্যবাদগুলো তো আসলে তোমাদের পাওনা।' চীফের দিকে তাকালেন ককার। 'আপনি আসবেন, চীফ? চলুন না, একসঙ্গে ডিনার খাই আজ?'

হাসলেন চীফ। 'কথা দিতে পারছি না, ভাই। গত দুই রাত আপনাদের এই কেসের জন্যে দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। ভাবছি, আজ প্রাণ ভরে ঘুমাব। কিশোর, এসো, ওঠো। তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তারপর আমার ছুটি।'

তিন বিঘা

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

ম্যানিলা রোডের শেষ বাড়িটার সামনে এসে গাড়ি থামালেন মিস কেলেট। বাড়ির দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল কিশোর, 'দারুণ কটেজ!'

বন আর পাহাড়ের কোলে ছবির মত একটা বাড়ি। পুরানো পাথরের দেয়াল, টালির ছাত, পর্দা ঢাকা জানালা। বিরাট বাগানটাতে উজ্জ্বল রঙের ফুলের মেলা। ঝোপঝাড় আর বেডগুলো সব পুরানো ধাঁচে তৈরি।

ওল্ড-মেন'স ভলান্টিয়ার সার্ভিসের একজন সদস্য মিস কেলেট। টীম-প্রধানদের একজন। কিশোরও জুনিয়র মেম্বার। আজ ওর আসার কথা ছিল না; যার আসার কথা সে অসুস্থ থাকায় মিস কেলেটের অনুরোধে তাকে আসতে হয়েছে।

'হ্যাঁ,' কিশোরের হাসিটা ফিরিয়ে দিলেন মিস কেলেট। 'সেভারনরা এসেছেন এখানে বছরখানেক হলো।' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বললেন, 'বাড়িটাতে নাকি ভূতের উপদ্রব আছে।'

আবার হাসল কিশোর। বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর চোখ দুটো ঝিক করে উঠল। 'যাহ্, ঠাট্টা করছেন!'

'না, ঠাট্টা করছি না। আমার সামনেই স্ত্রীকে বকাবকি করেছেন মিস্টার সেভারন, ভয় পান বলে। অদ্ভুত সব শব্দ নাকি শুনতে পান মহিলা, ঘরের মধ্যে নাকি ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায়। কারা নাকি হাসাহাসি করে। বেচারি!'

'হুঁ। ভূতের গল্প আমার ভাল লাগে। মিসেস সেভারনকে জিজ্ঞেস করে সব জেনে নিতে হবে।'

'দেখো, সারাদিন ধাক্কিয়েও দরজা খোলাতে পারো নাকি,' অস্বস্তিভরা কণ্ঠে বললেন মিস কেলেট। 'আজকাল অপরিচিত কাউকে দেখলে দরজাও খুলতে চান না ওঁরা।'

'কেন?'

'জানি না। কিছু হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু স্বীকার করলেন না। পুরো ব্যাপারটাই কেমন রহস্যময়।'

কান খাড়া হয়ে গেছে কিশোরের। ভাল কোন রহস্য পেলে আর কিছু চায় না সে।

'দেখো, মুখ খোলাতে পারো কিনা। বুড়োবুড়ি খুব ভাল মানুষ। বলেও ফেলতে পারেন।'

'যদি ঢুকতেই না দেন?'

হাসলেন মিস কেলেট। 'যাও, আমি আছি এখানে। দরজা না খুললে পরে যাব। নাকি এখনই সঙ্গে যেতে বলছ?'

গাড়ির দরজা খুলল কিশোর। 'না, আমিই যাই। লাঞ্চ নিয়ে গেছি দেখলে না খুলে পারবেন না। আধঘণ্টা পর এসে নিয়ে যাবেন আমাকে।'

ঘুরে গাড়ির পেছনে চলে এল কিশোর। হীটেড ট্রলি থেকে গরম গরম দুই প্লেট রোস্ট বীফ আর এক প্লেট পুডিং বের করল। হাত নেড়ে মিস কেলেটকে চলে যেতে ইশারা করে পা বাড়াল কটেজের মরচে পড়া গেটটার দিকে।

নীল রঙ করা সামনের দরজায় টোকা দিল সে। চিৎকার করে বলল, 'ওল্ড-মেন'স ভলান্টিয়ার!'

সাড়া নেই।

আবার টোকা দিল সে। জানালায় পর্দা টানা। ভেতরে কেউ আছে কিনা উঁকি দিয়ে দেখার উপায় নেই। দোতলার দিকে তাকাল। ওখানকার বেডরুমের জানালায়ও পর্দা টানা। বাড়ি আছেন তো সেভারনরা?

কি করবে ভাবছে কিশোর, এই সময় ফাঁক হয়ে গেল নিচতলার জানালার পর্দা। দেখা গেল একটা মুখ।

'ওল্ড-মেন'স ভলান্টিয়ার!' সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল সে। 'আপনাদের লাঞ্চ নিয়ে এসেছি।'

বন্ধ হয়ে গেল ফাঁকটা।

দরজার শেকল খোলার শব্দ। ছিটকানি খুলল। দরজা খুলে দিলেন এক বৃদ্ধা। ছোটখাট মানুষ। মাথার চুল সব সাদা। সন্দেহভরা চোখে তাকিয়ে রইলেন কিশোরের দিকে।

'মিসেস সেভারন?'

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধা, 'হ্যাঁ।'

'আপনাদের লাঞ্চ নিয়ে এসেছি। জলদি নিন। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

'তোমাকে তো চিনি না। মিস কেলেট কোথায়?'

'আরেক বাড়িতে গেছেন। আমি তাঁর সহকারী। একা পেরে ওঠেন না। তাই আমাকে নিয়ে এসেছেন। আমার নাম কিশোর পাশা।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিশোরের আপাদমস্তক দেখলেন বৃদ্ধা। মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, 'জন, লাঞ্চ।' কিশোরের দিকে ফিরে অস্বস্তিভরা হাসি হেসে শেকলটা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন। 'এসো। কিছু মনে কোরো না। আজকাল অপরিচিত কাউকে ঢুকতে দিতে ভয় লাগে আমাদের।'

'হ্যাঁ, সাবধান থাকা ভাল। চোর-ডাকাতে ভরে গেছে দেশটা।'

কিশোর ঘরে ঢুকতেই দরজা লাগিয়ে ছিটকানি তুলে দিলেন বৃদ্ধা। তার হাত থেকে ট্রে-টা নিতে নিতে বললেন, 'তুমি কি একটু বসবে? আমরা লাঞ্চটা সেরে নিই?'

'সারুন, সারুন, কোন অসুবিধে নেই। আমি বসছি। মিস কেলেটের

ফিরে আসতে সময় লাগবে।'

রান্নাঘরে ট্রে-টা রেখে এলেন মিসেস সেভারন। কিশোরকে নিয়ে এলেন বসার ঘরে।

'থ্যাংকস,' পুরানো, আরামদায়ক একটা সোফায় বসে বলল কিশোর। ওক কাঠে তৈরি ছোট কফি টেবিলে রাখা দুটো ম্যাগাজিন আর একটা ছবির অ্যালবাম। 'অ্যালবামটা দেখি? মানুষের ছবি দেখতে ভাল লাগে আমার।'

'দেখো। তবে মানুষের ছবির চেয়ে এই কটেজের ছবিই বেশি।'

সেভারনরা লাঞ্চ খেতে বসল। অ্যালবামের পাতা ওল্টাতে লাগল কিশোর। কটেজ আর বাগানটার সুন্দর সুন্দর ছবি। বাগানের ঠেলাগাড়িতে বসা এক বৃদ্ধের ছবি আছে। মিস্টার সেভারনের ছবি, অনুমান করল কিশোর।

প্রথম পাতায় রয়েছে এক যুবকের বেশ কয়েকটা ছবি। খাটো করে ছাঁটা চুল। লম্বা, সুগঠিত শরীর, ব্রোঞ্জ-রঙ চামড়া। পরনে জিনস আর কলেজ সোয়েটশার্ট। মিসেস সেভারনের সঙ্গে চেহারার অনেক মিল।

অ্যালবাম থেকে মুখ তুলে ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল কিশোর। ছোট্ট ঘর। ওক কাঠের মোটা মোটা কড়িকাঠ। ম্যানটলপীসে রাখা মাউন্টে একটা ছবি–অ্যালবামে যে যুবকের ছবি আছে তার। অ্যাথেনসের পারথেননের সামনে দাঁড়িয়ে তোলা। কড়া রোদ। পিঠে ঝোলানো ব্যাকপ্যাক। হাসিমুখে ক্যামেরার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে।

দ্রুত অ্যালবামের বাকি পাতাগুলো দেখা শেষ করে একটা ম্যাগাজিন তুলে নিল কিশোর। টান লেগে ভেতর থেকে বেরিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল একটা চিঠির খাম। ওপরে ছাপ মারা একটা লোগো–কোন কোম্পানির নামের আদ্যক্ষর যুক্ত করে তৈরি। সাধারণ জিনিস। কৌতূহল জাগাল না কিশোরের। খামটা আবার আগের জায়গায় ঢুকিয়ে রাখল সে।

স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মিসেস সেভারন।

'ও কিশোর পাশা,' পরিচয় করিয়ে দিলেন বৃদ্ধা। 'ভলান্টিয়ার সার্ভিসের সদস্য।'

সোফা থেকে উঠে গিয়ে মিস্টার সেভারনের সঙ্গে হাত মেলাল কিশোর, 'হালো, মিস্টার সেভারন। অ্যালবামটা খুব সুন্দর।' ম্যানটলপীসের ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কি আপনাদের ছেলের ছবি?'

ছেলের কথা উঠতেই আড়ষ্ট হয়ে গেলেন দুজনে। তাঁদের ভঙ্গি দেখেই বুঝে গেল কিশোর, কি যেন গোপন করতে চাইছেন। অবাক হলো সে।

'ইয়ে...' আমতা আমতা করে জবাব দিলেন মিসেস সেভারন, 'ছুটিতে থাকার সময় ওর কোন বন্ধু হয়তো তুলেছিল ছবিটা। হঠাৎ করেই একদিন ডাকে এসে হাজির, ও...'

'ও, কি?' কৌতূহল হলো কিশোরের।

'ও...ও চলে যাবার পর।' অ্যালবামটা তুলে নিয়ে গিয়ে একটা ড্রয়ারে রেখে দিলেন মিসেস সেভারন।

'তারমানে এখানে থাকে না আপনাদের ছেলে?'

মাথা নাড়লেন মিসেস সেভারন। না।

ফায়ারপ্লেসের সামনের একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন মিস্টার সেভারন। ভঙ্গি এখনও আড়ষ্ট।

'তাহলে কোথায়...?' জিজ্ঞেস করতে গেল কিশোর।

'দূরে থাকে,' আচমকা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মিস্টার সেভারনের কণ্ঠ।

স্পষ্ট বোঝা গেল এই প্রসঙ্গে আর কথা বলতে চান না মিসেস সেভারনও। 'কোন স্কুলে পড়ো তুমি?'

'রকি বীচ হাই।'

দুজনের আচরণে কৌতূহল বেড়ে গেছে কিশোরের। ছেলের সম্পর্কে কথা বলতে চান না কেন? বুড়ো মানুষেরা তো সাধারণত ছেলেমেয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই খুশি হয় বেশি, যতটা পারে বকর বকর করে, কিন্তু এঁরা ঠিক উল্টো। ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন নাকি?

'কোথায় থাকো?' জানতে চাইলেন মিস্টার সেভারন।

ইয়ার্ডের ঠিকানা জানাল কিশোর।

'রকি বীচে কতদিন?' মিসেস সেভারন জিজ্ঞেস করলেন।

'বহু বছর। প্রায় জন্মের পর থেকে।'

'ভাল লাগে?'

'লাগে।'

'আমরাও আছি বলতে গেলে প্রায় সারাটা জীবনই। জ্যাকিও এখানেই জন্মেছে...'

মিস্টার সেভারনের ভ্রূকুটি দেখে থেমে গেলেন মিসেস সেভারন। লক্ষ করল কিশোর।

'এই কটেজটা কিনেছি মাত্র বছরখানেক আগে,' আবার ছেলের প্রসঙ্গ চাপা দেয়ার চেষ্টা করলেন মিস্টার সেভারন। 'খুব ভাল লাগে জায়গাটা। শান্ত, নীরব; কোন গোলমাল ছিল না, কিন্তু...'

অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর। পুরো এক মিনিট চুপ করে থাকার পরও যখন মুখ খুললেন না মিস্টার সেভারন, না জিজ্ঞেস করে আর পারল না সে, 'কিন্তু কি, মিস্টার সেভারন? কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে?'

তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লেন মিস্টার সেভারন, 'না না, কি ঘটবে?'

'মিস কেলেট আমাকে বললেন বাড়িটাতে নাকি ভূতের উপদ্রব আছে।'

অস্বস্তিভরা ভঙ্গিতে স্বামীর দিকে তাকাতে লাগলেন মিসেস সেভারন। সত্যি যেন ভূতের ভয়ে কাবু হয়ে আছেন।

হাসি ফুটল মিস্টার সেভারনের মুখে। অবাক করল কিশোরকে।

'সব গাঁজা, বুঝলে। অতি কল্পনা। আমার স্ত্রী ভূতকে ভীষণ ভয় পায়।'

সলজ্জ হাসি ফুটল মিসেসের মুখে। 'তুমিই তো ভয়ের গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে ভয়টা বাড়াও আমার।'

'কিন্তু ঘর নাকি খুব ঠাণ্ডা হয়ে যায় মাঝে মাঝে,' কিশোর বলল।

'ঘরে রোদ না ঢুকলে তো হবেই,' জোর দিয়ে কথাটা বলতে পারলেন না

মিসেস সেভারন। 'এমনিতেই জায়গাটা বড় বেশি নীরব; দুপুরবেলায়ও গা ছমছম করে, তার ওপর…

'তার ওপর কি?' কিশোরের মনে হলো জরুরী কোন কথা বলতে চেয়েছিলেন মিসেস সেভারন, বলতে দিলেন না মিস্টার সেভারন। 'বাদ দাও ওর কথা,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। প্রসঙ্গটাকে হালকা করার জন্যে বললেন, 'আমার স্ত্রীর ভূতে আসর করা ঘরটা দেখবে নাকি?'

'দেখব না মানে! এক্ষুণি চলুন।'

'এসো,' হাসলেন মিস্টার সেভারন। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি ওকে দেখিয়ে আনি। তুমি ততক্ষণে বাসনগুলো ধুয়ে ফেলো।'

'আপনাদের কষ্ট করার দরকার নেই,' কিশোর বলল। 'ধোয়াধুয়িগুলোও আমরাই করব। আমাদের দায়িত্ব…'

'কোন অসুবিধে নেই,' মিসেস সেভারন বললেন। 'বসেই তো থাকি। বরং কাজ করলে ভাল লাগবে। রান্না করে যে লাঞ্চ এনে খাওয়াচ্ছ, তাতেই আমরা কৃতজ্ঞ; কত কাজ আর ঝামেলা বাঁচাচ্ছ।'

'ধোও তুমি, আমরা যাচ্ছি,' স্ত্রীকে বলে কিশোরের দিকে তাকালেন মিস্টার সেভারন। 'এসো।'

এই সময় বাইরে গাড়ির হর্ন বাজল।

তাড়াতাড়ি গিয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে তাকাল কিশোর। 'এহ্‌হে, মিস কেলেট চলে এসেছেন! আর কয়েক মিনিট দেরিতে এলে কি হত…' নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল সে। মিস্টার সেভারনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'অন্য কোন সময় এলে কি ঘরটা দেখাবেন?'

'নিশ্চয় দেখাব। যখন ইচ্ছে চলে এসো। এলে খুশিই হব। কথা বলার লোক পাই না।'

পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করল কিশোর। বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নিন, রাখুন এটা। যদি কখনও কোন প্রয়োজন মনে করেন, ফোন করবেন।'

কার্ডটা দেখলেন মিস্টার সেভারন। 'কিশোর গোয়েন্দা!…খুব ভাল।' মুখ তুলে তাকালেন তিনি। 'কিন্তু প্রশ্নবোধকগুলো কেন? আত্মবিশ্বাসের অভাব?'

এই প্রশ্নটা বহুবার বহুজনের মুখে শুনেছে কিশোর। দমল না। বলল, 'মোটেও না। বরং আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি আমাদের। প্রশ্নবোধকগুলো বসানোর তিনটে কারণ। এক, রহস্যের ধ্রুবচিহ্ন এই প্রশ্নবোধক। যে কোন রহস্য সমাধানে আগ্রহী আমরা। ছিঁচকে চুরি থেকে শুরু করে ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, এমনকি ভৌতিক রহস্যের তদন্তেও পিছপা নই। দুই, চিহ্নগুলো আমাদের ট্রেডমার্ক। আর তিন, যেহেতু দলে তিনজন, তাই তিনটে চিহ্ন দেয়া হয়েছে।' একটু থেমে বলল, 'কারও কাজ করে দেয়ার জন্যে পয়সা নিই না আমরা। গোয়েন্দাগিরি করাটা আমাদের শখ।'

দুই

'তারমানে ঘরটা দেখতে পারলে না!'

কিশোরের মতই নিরাশ হলো মুসাও। বেড়ায় হেলান দিল। তিন গোয়েন্দার ওঅর্কশপে বসে আছে ওরা।

'আরেকবার গেলেই হয়,' রবিন বলল। 'বলে তো এসেছই।'

'হ্যাঁ। যাব।'

আঁতকে উঠল মুসা, 'ওই ভূতের ঘর দেখতে!'

হাসল কিশোর, 'এইমাত্র না দেখে আসতে পারলাম না বলে দুঃখ করলে?'

ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'আমি যাই। ফায়ারকে অনেকক্ষণ খাবার দেয়া হয়নি। খিদে পেলে চেঁচিয়ে, মাটিতে লাথি মেরে পাড়া মাত করবে। মা শেষে রেগে গিয়ে আমাকে সহ কানটি ধরে বের করে দেবে বাড়ি থেকে।' পকেট থেকে একটা চকলেট বের করে মোড়ক খুলল সে। মট মট করে দুই টুকরো ভেঙে তুলে দিল দুজনের হাতে। বাকিটা মুখে পুরে কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল, 'তাহলে যাচ্ছই ভূত দেখতে?'

'হ্যাঁ।'

'কবে?'

'কাল সকালে।'

'সকালে আমার গিটারের ক্লাস আছে,' রবিন বলল। 'তারপর যাব লাইব্রেরিতে। দুপুরের পর হলে যেতে পারি।'

'ঠিক আছে। দুপুরের পরই যাব।'

মুসা আর রবিন চলে যাওয়ার পর দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল কিশোর। ডেস্কের অন্যপাশে তার চেয়ারে এসে বসল। টেবিলে উপুড় করে ফেলে রাখা হয়েছে একটা বই, একটা রহস্য কাহিনী : দি মিস্টরি অভ দা রেড জুয়েলস। কিছুটা পড়ে ফেলে রেখে গিয়েছিল। তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল।

শেষ হওয়ার বহু আগেই বুঝে ফেলল চোর কোন্ লোকটা। আর পড়ার কোন মানে হয় না। বিরক্ত হয়ে বইটা রেখে দিল। রহস্য কাহিনী পড়তে গেলেই এই অবস্থা হয় তার। আগেই বুঝে ফেলে। ব্যস, মজা শেষ।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। স্কুলের ম্যাগাজিনের জন্যে একটা আর্টিকেল লেখার কথা। হাতে সময় আছে। এখন বসতে পারে। কিন্তু লিখতে ইচ্ছে করছে না। একে তো ম্যাগাজিনের সম্পাদিকা কেরি জনসনের সঙ্গে বনাবনতি নেই, তার ওপর বিষয় যেটা ঠিক করে দেয়া হয়েছে সেটাও

একেবারে পচা—শহুরে মানুষের ঘুরে বেড়ানোর প্রবণতা এবং ফুটপাথ সমস্যা। এ জিনিস নিয়ে যে কেউ ভাবতে পারে, ভাবলেও অবাক লাগে তার। তথ্য জানার জন্যে লাইব্রেরি থেকে খুঁজেপেতে একটা বই নিয়ে এসেছে সে। সঙ্গে রকি বীচের একটা ম্যাপ।

স্যারকে কথা যখন দিয়েছে লিখবে, লিখতেই হবে। খানিকক্ষণ উসখুস করে কাগজ-কলম টেনে নিল সে। এই সময় বাঁচিয়ে দিল তাকে টেলিফোন।

তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল, 'হ্যালো!'

'কিশোর?'

মিসেস সেভারনের গলা। সঙ্গে সঙ্গে কান খাড়া হয়ে গেল কিশোরের। ঢিলেঢালা ভাবটা চলে গেল। 'হ্যাঁ, বলছি!'

'কিশোর,' ফিসফিস করে বললেন বৃদ্ধা, জোরে বলতে ভয় পাচ্ছেন যেন, 'একটা কথা...'

'বলে ফেলুন!' উত্তেজনায় টানটান হয়ে গেছে কিশোরের স্নায়ু।

'দুপুরে...' ভীত মনে হচ্ছে মিসেস সেভারনকে। 'আসলে...'

কথা শেষ করতে পারলেন না। একটা ধমক শুনতে পেল কিশোর।

'এমন করছ কেন, জন!' মিসেস সেভারনের কাতর কণ্ঠ শোনা গেল। 'কিশোরকে বললে ক্ষতি কি?'

আবার শোনা গেল ধমক। মিস্টার সেভারন কি বললেন, রিসিভারে কান চেপে ধরেও বুঝতে পারল না কিশোর।

'কিশোর,' আবার লাইনে ফিরে এলেন মিসেস সেভারন, 'সরি, বিরক্ত করলাম। পরে কথা বলব...রাখি, গুডবাই।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান, মিসেস সেভারন!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

কট করে শব্দ হলো। রিসিভার নামিয়ে রাখা হয়েছে অন্যপাশে।

একটা মুহূর্ত নিজের হাতে ধরা রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর আস্তে করে নামিয়ে রাখল। ম্যানিলা রোডের ওই বাড়িটাতে রহস্যময় কোন ঘটনা যে ঘটছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই আর তার।

*

'আরে এসো না, পায়ে জোর নেই নাকি তোমাদের!' ফিরে তাকিয়ে বলল মুসা। সাইকেল থামিয়ে এক পা মাটিতে নামিয়ে দিয়েছে। সেভারনদের বাড়িতে চলেছে। আগের দিন বলেছিল যাবে না, কিন্তু রবিন আর কিশোর রওনা হতেই আর সঙ্গে না এসে পারেনি।

'এত তাড়াতাড়ি চালাও কেন, বলো তো!' কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। 'তোমার গায়ে নাহয় জোর বেশি, আমাদের তো আর নেই।'

বেশ গরম পড়েছে। মুখ লাল হয়ে গেছে তার।

হাসল মুসা। 'সেজন্যেই তো বলি, ব্যায়ামের ক্লাসে যোগ দাও। শরীরটাকে ফিট করে ছেড়ে দেবে।'

'কে যায় এত কষ্ট করতে...'

'তাহলে শরীরও ফিট হবে না।'

'কি বকবক শুরু করলে! সময় নষ্ট,' প্যাডালে চাপ দিল কিশোর। 'চলো।'

ম্যানিলা রোডে সেভারনদের বাড়ির সামনে পৌছল ওরা। সামনের রাস্তাটা বাদেও বাড়ির পাশ দিয়ে ঘাসে ঢাকা আরেকটা মোটামুটি চওড়া রাস্তা চলে গেছে একটা ছোট আপেল বাগানে। গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে আঙুরের ঝোপ। তার ওপাশে বুনো গাছপালার জঙ্গল। বাতাসে দুলছে ফুলে ভরা ডালগুলো।

কাঠের গেটের পাশে বেড়ার গায়ে সাইকেল ঠেস দিয়ে রাখল ওরা। বাগানের দিকের রাস্তাটা ধরে এগিয়ে গেল। সামনের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

'খুলবে বলে তো মনে হচ্ছে না,' তৃতীয়বার দরজায় টোকা দেয়ার পরেও সাড়া না পেয়ে বলল কিশোর। 'ভুল হয়ে গেছে। আমরা যে আসছি, ফোন করে জানিয়ে আসা উচিত ছিল।'

'বাইরে বেরিয়ে যায়নি তো?' একটা ফুলের বেডের পাশে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে ভেতরে দেখার চেষ্টা করল মুসা। পর্দা টানা থাকায় কিছুই দেখতে পেল না।

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'বাইরে যেতে পারে না বলেই খাবার দিয়ে যেতে হয় ওদের। বাইরে বেরোনোর সমস্যা আছে।'

মুসার হাত ধরে টান দিল রবিন, 'সরে এসো। এভাবে তোমাকে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখলে আরও ঘাবড়ে যাবে ওরা।'

সরে এল মুসা 'পেছন দিক দিয়ে গিয়ে দেখি আছে নাকি।'

কিন্তু পেছনে এসেও কাউকে দেখতে পেল না সে। কয়লার বাঙ্কারের ওপর গলা বাড়িয়ে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। খালি। বাগানের ছাউনির পাশ ঘুরে এসে দাঁড়াল সাদা রঙ করা সুন্দর একটা ভিক্টোরিয়ান সামার-হাউসের সামনে। জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাল। কয়েকটা সাধারণ টুকিটাকি জিনিস ছাড়া মেঝেতে বিছানো রয়েছে পোকায় কাটা একটা পুরানো কার্পেট, দুটো ধুলো পড়া পুরানো ডেকচেয়ার, আর আপেল রাখার কয়েকটা কাঠের বাক্স। বাক্সগুলো খালি। বহু বছর এখানে কেউ ঢুকেছে বলে মনে হলো না।

বাগানের শিশিরে ভেজা ঘাস মাড়িয়ে হেঁটে গেল সে। বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল তাকিয়ে রইল একপাশের সবুজ তৃণভূমির দিকে। রঙবেরঙের প্রজাপতি আর বড় বড় ভোমরা উড়ে বেড়াচ্ছে ফুল থেকে ফুলে। বাটারকাপ, অক্স-আই ডেইজির ছড়াছড়ি। আর রয়েছে লম্বা, ব্রোঞ্জ রঙের এক ধরনের বুনো গুল্ম। দারুণ জায়গা! ফায়ারকে এনে ছেড়ে দিলে মন মত চরে খেতে পারবে।

হঠাৎ একটা ঝিলিক দেখতে পেল মাঠের কিনারের বনের মধ্যে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল সে। কিসের আলো? টর্চ? মনে হয় না। বাচ্চারা হয়তো খেলা করছে কোন ধাতব জিনিস বা কাঁচে প্রতিফলিত হয়েছে রোদ।

ভাবনাটা মাথা থেকে দূর করে দেবার আগেই গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। গলায় ঝোলানো জিনিসটা দূর থেকেও চিনতে

পারল মুসা। দূরবীন।

একটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল। বোধহয় মুসাকে দেখল তারপর আবার চলে গেল গাছের আড়ালে। দূরবীনের কাঁচে লেগে ঝিক করে উঠল রোদ।

কে লোকটা? কটেজের ওপর চোখ রাখছিল কেন? ভাবতে ভাবতে কটেজের পাশ ঘুরে সামনের দিকে এগোল মুসা।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন মিস্টার সেভারন। মুসাকে দেখেই চিৎকার করে উঠলেন, 'অ্যাই, ছেলে, কে তুমি?'

'ও মুসা, মিস্টার সেভারন,' তাড়াতাড়ি পরিচয় দিল কিশোর। 'আমাদের সঙ্গেই এসেছে। সামনের দরজায় সাড়া না পেয়ে পেছন দিক দিয়ে দেখতে গিয়েছিল।'

'ও, তুমিই মুসা।' ধূসর চুলে আঙুল চালালেন তিনি 'তিনজনেই এসেছ জানতাম না...'

হেসে হাত বাড়িয়ে দিল মুসা। মিস্টার সেভারনের হাতটা ধরে রেখে চোখের ইশারায় চারপাশটা দেখিয়ে বলল, 'খুব সুন্দর জায়গা। ঘোড়দৌড়ের প্র্যাকটিস করার জন্যে এরচেয়ে ভাল আর হয় না।'

মুসার হাতটা ছেড়ে দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার সেভারন। 'হ্যাঁ। তবে ওখানে যেতে হলে,' তৃণভূমিটা দেখিয়ে বললেন, 'আমার জায়গার ওপর দিয়ে ছাড়া যেতে পারবে না। ঘোড়া চলাচলের একটা রাস্তা আছে বনের ভেতর দিয়ে। রাইডিং স্কুলের ছেলেরা মাঝে মাঝেই আসে এখানে ঘোড়ায় চড়া প্র্যাকটিস করতে।' মুসার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন তিনি, 'ঘোড়ায় চড়তে ভাল লাগে মনে হয় তোমার?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'লাগে। আমার নিজেরই একটা ঘোড়া আছে।'

'তাহলে তো ভালই। প্র্যাকটিস করতে ইচ্ছে হলে চলে এসো যে কোন সময়। আগাম অনুমতি দিয়ে রাখলাম।'

'থ্যাংকিউ, মিস্টার সেভারন।'

'চলো, রাস্তাটা দেখিয়ে আনি তোমাকে।...দাঁড়াও, এক মিনিট, আমার ছড়িটা নিয়ে আসি।...কিশোর, রবিন, তোমরা ঘরে গিয়ে বসো, আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলো। কথা বলার মানুষ পেলে খুশি হবে ও, তোমাদের মত শ্রোতা পেলে।...কাল রাতের ঘটনাটা খুব রসিয়ে রসিয়ে বলতে পারবে।'

'কাল রাতে আবার কি ঘটল?' আগ্রহী হয়ে উঠল কিশোর।

'সেটা তার কাছেই শুনো।'

ছড়ি নিতে ঘরে ঢুকলেন মিস্টার সেভারন।

মুসার সঙ্গে বাগানের দিকে কিছুদূর এগিয়ে গেল কিশোর সামার-হাউসটা দেখে বলল, 'বাহ্, খুব সুন্দর তো।' কাছে গিয়ে জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাল। 'কিন্তু কেউ থাকে বলে তো মনে হয় না।'

কথাটা যেন মুসার কানেই গেল না। কিশোরের বাহু চেপে ধরল, 'কিশোর, একটা ঘটনা ঘটে গেছে।'

'কি?'

'বনের মধ্যে একটা লোক...'

'মানে?'

'কটেজের ওপর চোখ রাখছিল।'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'তুমি শিওর?'

'হ্যাঁ। গলায় ঝোলানো একটা দূরবীন। আমাকে দেখেই লুকিয়ে পড়ল। সন্দেহ হলো সেজন্যেই।'

'কেমন দেখতে?'

মাথা নাড়ল মুসা, 'মুখ দেখিনি। লোকটা বেশ লম্বা। মাথায় চওড়া কানাওয়ালা নরম হ্যাট। ওর কাজকারবার মোটেও ভাল লাগেনি আমার।'

নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'হুঁ! হাঁটতে গেলে এখন সাবধান থাকবে। বুঝতে পারছি না, সেভারনদের বাড়ির ওপর নজর রাখতে যাবে কে! তবে যদি রেখে থাকে, কোন কারণ নিশ্চয় আছে। তারমানে সেভারনদের যারা বন্ধু, তারা লোকটার শত্রু। আমাদের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। চোখকান খোলা রেখো।...ওই যে, মিস্টার সেভারন বেরিয়েছেন। তোমরা যাও। আমি আর রবিন মিসেস সেভারনের সঙ্গে কথা বলিগে। শুনি, কাল রাতে কি ঘটেছে।'

তিন

কটেজের সামনের ঘরে রবিনকে বসতে দিলেন মিসেস সেভারন।

'চা'টা আমিই বানিয়ে নিয়ে আসি, মিসেস সেভারন,' প্রস্তাব দিল রবিন।

রাজি হলেন না মিসেস সেভারন, 'না, আমিই পারব। অত দুর্বল ভেবো না আমাকে। তোমরা আরাম করে বসো।'

রান্নাঘরে চলে গেলেন তিনি।

কিন্তু বসে থাকতে ভাল লাগল না রবিনের। উঠে ম্যানটলপীসের দিকে এগিয়ে গেল জ্যাকি সেভারনের ছবিটা দেখার জন্যে। পর্দা টানা থাকায় ঘরে আলো কম। ভাল করে দেখার জন্যে নামিয়ে আনতে গেল। কাত হয়ে কার্ডবোর্ডের মাউন্ট থেকে খসে পড়ে গেল ওটা। তাড়াতাড়ি তুলে নিল আবার। আড়চোখে রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল মিসেস সেভারন দেখে ফেললেন কিনা।

ছবিটা আবার মাউন্টে ঢোকাতে গিয়ে ছবির নিচে প্রিন্ট করা তারিখটা চোখে পড়ল ওর। গত বছরের তারিখ ১০ আগস্ট।

ঘরে ঢুকল কিশোর।

ছবি রেখে তার কাছে সরে এল রবিন।

মুসা কি দেখেছে, রবিনকে জানাল কিশোর।

'সাবধান করে দিলে না ওকে?' দূরবীনধারী লোকটার কথা শুনে চিন্তিত

হলো রবিন।

'করেছি।'

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। পর্দা ফাঁক করে তাকাল। মাঠের কিনারে পৌঁছে গেছে মুসা আর মিস্টার সেভারন। নিচু হয়ে একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কাটল মুসা। হাত নেড়ে তৃণভূমির অন্যপ্রান্তে কি যেন তাকে দেখাতে চাইছেন মিস্টার সেভারন।

গলাটাকে বকের মত পাশে লম্বা করে দিয়েও কিছু দেখতে পেল না কিশোর। বাইরে না গেলে দেখা যাবে না। হতাশ ভঙ্গিতে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সে।

ট্রে হাতে ঘরে ঢুকলেন মিসেস সেভারন। তাঁকে সাহায্য করতে উঠে গেল রবিন।

আগের দিনের সোফাটায় বসল কিশোর। এক কাপ চা এগিয়ে দিল রবিন। কফি টেবিলটায় সেটা রাখতে গিয়ে গোটা তিনেক চিঠি চোখে পড়ল কিশোরের। একটাতে সেই বিচিত্র লোগো ছাপ মারা। বাকি দুটোতে ডাক বিভাগের সীল দেখে বোঝা যায় লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে এসেছে। ঠিকানায় মিসেস সেভারনের নাম। পেঁচানো হাতের লেখা।

হাত বাড়িয়ে একটা চিঠি তুলে নিতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর। অন্যের চিঠি দেখা ঠিক না। মিসেস সেভারন কিছু মনে করতে পারেন।

চায়ের কাপে চুমুক দিল সে। মুখ তুলে তাকাল বৃদ্ধার দিকে। 'কাল রাতে নাকি কি ঘটেছে, মিসেস সেভারন?'

'হ্যাঁ।'

শোনার জন্যে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে কিশোর। 'বলুন না, শুনি।'

লম্বা ঘাস মাড়িয়ে তখন বনের কাছে পৌঁছে গেছে মুসা আর মিস্টার সেভারন। ঢুকে পড়ল বনের মধ্যে। রাস্তাটা দেখতে পেল মুসা। পুরানো ওকের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গিয়ে বেরিয়েছে একটা খোলা জায়গায়। পায়ের নিচে কার্পেটের মত বিছিয়ে আছে ঝরা পাতা।

'কাটতে না কাটতে রাস্তায় উঠে আসে কাঁটালতা, দুদিনও যায় না,' মিস্টার সেভারন বললেন। 'ছাত্ররাই কেটে কেটে পরিষ্কার করে রাখে।'

কোন ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থেকে কুহু-কুহু করে উঠছে একটা কোকিল। ওটার মিষ্টি স্বরের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন কর্কশ স্বরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে ওকের ডালে বসা একটা দাঁড়কাক।

মিস্টার সেভারন জানালেন বহু শত বছর ধরে আছে এখানে বনটা।

'দারুণ জায়গা! ঘোড়া নিয়ে সত্যি আসতে পারব তো? কোন অসুবিধে হবে না?'

'না, হবে না। যখন খুশি চলে এসো।'

অদ্ভুত এই বনটার ভেতর দিয়ে ঘোড়া ছোটাতে কেমন লাগবে ভাবতেও রোমাঞ্চিত হলো মুসা।

মিস্টার সেভারন বলে চলেছেন, 'এই এলাকার সবচেয়ে পুরানো বন এটা। লোকে এখনও বেড়াতে এসে মজা পায় এখানে। তবে কদ্দিন পারে আর জানি না। যে হারে কাটাকাটি শুরু হয়েছে...আমি যখন যুবক ছিলাম, তখনও অনেক বড় ছিল ওই বন। মাঠের ওপাশটাতেও ঘন বন ছিল সব তো কেটে সাফ করেছে।'

'ওই যে নতুন স্পোর্টস সেন্টার আর শপিং সেন্টার খুলেছে ওটার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ,' বিষণ্ণ হয়ে গেল মিস্টার সেভারনের দৃষ্টি 'আর কিছুদিন পর খোলা জায়গা বলতে কিচ্ছু থাকবে না। সব বাড়িঘর দিয়ে ভরে ফেলবে।'

গাছপালার ফাঁক দিয়ে একটা সরু রাস্তা চোখে পড়ছে। তাতে একটা সাদা রঙের ভ্যানগাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল মুসা

'কার গাড়ি?' মিস্টার সেভারনও দেখেছেন। 'এ রকম জায়গায় তো গাড়ি পার্ক করে না কেউ।'

'একটু আগে একটা লোককে দেখেছি আমি। দূরবীন দিয়ে আপনাদের বাড়ির ওপর চোখ রাখছিল।'

থমকে দাঁড়ালেন মিস্টার সেভারন। 'কি বলছ! চলো চলো. ফিরে যাই। মিসেস সেভারনকে একা ফেলে এসেছি!'

তাঁর উদ্বেগ দেখে অবাক হলো মুসা 'একা কোথায়? কিশোর আর রবিন আছে। কেউ কিছু করতে পারবে না তাঁর

মুসার কথা শেষও হলো না, বনের মধ্যে গুলির শব্দ হলো। লাফিয়ে উঠল মুসা। এত কাছে কে গুলি করছে? শব্দ লক্ষ করে সে ঘুরতেই দেখতে পেল লোকটাকে। চোখের পলকে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ছায়ার মত।

'এখানে কি শিকারের অনুমতি আছে?' জানতে চাইল সে

মাথা নাড়লেন মিস্টার সেভারন। ভুরু কোঁচকালেন। 'না। কে গুলি ছুঁড়ছে বুঝতে পারছি না। ওই ভ্যানে করেই এসেছে মনে হচ্ছে ভ্যানের ছাতে চড়ে বেড়া ডিঙানো সম্ভব।'

আবার গুলির শব্দ। স্লুই ভেলোসিটি শটগান থেকে ছোঁড়া হচ্ছে। অতিরিক্ত কাছে।

ভয় লাগছে মুসার। 'এখানে থাকাটা নিরাপদ মনে হচ্ছে না আমার। কোন্ সময় এসে গায়ে লাগে!'

গাছের ফাঁকে আবার ছায়ামূর্তিটাকে চোখে পড়ল মুসার। কাঁটাঝোপের কাছে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে এদিকেই তাকিয়ে আছে। হাতের বন্দুকের নল এদিকে ফেরানো।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁধে বন্দুকের বাঁট ঠেকিয়ে নিশানা করল লোকটা।

মিস্টার সেভারনের হাত ধরে টান দিল মুসা, 'চলুন। লোকটার ভাবসাব সুবিধের লাগছে না আমার।'

তৃতীয়বার গুলির শব্দ হলো। ওদের মাথার ওপরের ডালে ছরছর করে এসে লাগল ছররা। ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল দু'জনে।

'পাখি তো কই, উড়ছে না,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'আমাদেরকেই নিশানা করছে না তো?'

হাতটা ধরে রেখেই বুঝতে পারছে সে, মিস্টার সেভারন কাঁপতে শুরু করেছেন। মাথা নেড়ে কম্পিত গলায় বললেন, 'মনে হয় না!'

'চুপ করে থাকুন। তাহলে ও মনে করবে আমরা চলে গেছি। হয়তো আর গুলি করবে না।'

ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে রইল দু'জনে। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে মুসার হৃৎপিণ্ডটা। ভয় হতে লাগল, সেই শব্দও শুনে ফেলবে লোকটা। ঝোপঝাড় ভেঙে কে যেন এগিয়ে আসতে লাগল।

ওদের ঝোপটার কাছে এসে দাঁড়াল একজোড়া বুট। পা ফাঁক করে দাঁড়াল। পায়ের সামনে তেরছা ভাবে এসে পড়েছে সূর্যরশ্মি। পকেট থেকে আরও দুটো কার্তুজ বের করে বন্দুকে ভরল সে। ধীরে ধীরে বন্দুক তুলে নিশানা করল ওদের দিকে।

চার

দম আটকে ফেলল মুসা। চারপাশটা বড় বেশি নীরব। পাতার ফাঁক দিয়ে তাকাল আবার লোকটার দিকে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। খুঁজছে কাউকে।

একটা পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল মুসা। গাছের গায়ে লেগে ঝোপের মধ্যে গড়িয়ে পড়ল পাথরটা।

আবার ঝোপঝাড় ভেঙে সেদিকে ছুটল লোকটা। কাঁটাঝোপে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। চাপা গোঙানি শোনা গেল। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে আবার দিল দৌড়।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মিস্টার সেভারনকে হাত ধরে টেনে তুলল মুসা। যে পথে এসেছিল, তাঁকে নিয়ে সেই পথটা ধরে ছুটল কটেজের দিকে। ঝোপের ধারে দুটো কার্তুজের খোসা পড়ে থাকতে দেখে কুড়িয়ে নিল। এখনও গরম। পরে ভাল করে দেখবে ভেবে ঢুকিয়ে রাখল জিনসের পকেটে।

'মিস্টার সেভারন, পুলিশকে জানানো দরকার এখনই। ওই লোকটা পাগল।'

মুসাকে অবাক করে দিয়ে মাথা নাড়লেন মিস্টার সেভারন। 'না। আমি পুলিশের কাছে যাব না।'

'কিন্তু আরেকটু হলেই আমাদের খুন করে ফেলেছিল! ঘোড়ায় চড়ে আসাটা তো এখানে বিপজ্জনক। গুলির শব্দে ভয় পেয়ে গেলে পিঠ থেকে সওয়ারী উল্টে ফেলে পালানোর চেষ্টা করবে ঘোড়া। মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাবে। লোকটা ভীষণ বিপজ্জনক।'

তার পরেও পুলিশের কাছে যেতে রাজি হলেন না মিস্টার সেভারন।

জ্যাকেটে লেগে থাকা শুকনো পাতা ঝেড়ে ফেলে বললেন, 'লোকটা চলে গেছে এতক্ষণে। আমার ধারণা, ভুল করেছে সে। হরিণ-টরিণ বা ভালুক ভেবে আমাদের গুলি করেছে।'

'তাহলেও মস্ত অপরাধ করেছে সে, কারণ এখানে শিকার করা বেআইনী। তার ভুলের জন্যে মারাত্মক জখম হতে পারতাম আমরা। এ ভাবে যেখানে সেখানে গুলি চালানোর জন্যে তো আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স দেয়া হয় না। পুলিশকে না জানালে এখন সেটা আমাদের অপরাধ বলে গণ্য হবে।'

বন থেকে বেরিয়ে দেখল ওদের দিকে দৌড়ে আসছে রবিন।

'কি হয়েছে?' দূর থেকেই চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল সে। 'গুলির শব্দ শুনলাম।'

'একটা উন্মাদ আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছিল,' জবাব দিল মুসা।

'কেন?' কাছে চলে এসেছে রবিন।

'ভুল করেছে,' মুসাকে কথা বলতে দিলেন না মিস্টার সেভারন। 'শটগান থেকে গুলি ছোঁড়ার প্র্যাকটিস করছিল বোধহয়।' দুই আঙুলে টিপে ধরে কাপড় থেকে আরেকটা পাতা তুলে ফেলে দিলেন তিনি। 'কোন ক্ষতি হয়নি আমাদের।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মুসা। ঘটনাটাকে দুর্ঘটনা বলে চালাতে চাইছেন মিস্টার সেভারন।

ছড়িতে ভর দিয়ে দিয়ে দ্রুত বাড়ির দিকে এগিয়ে চললেন তিনি।

রবিনের হাত চেপে ধরল মুসা, 'রবিন, একটা লোক সত্যি সত্যি আমাদের ভয় দেখাতে চেয়েছিল।'

'তোমাকে নয় নিশ্চয়; ভয়টা আসলে দেখাতে চেয়েছে মিস্টার সেভারনকে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। 'এমনিতেই তো যথেষ্ট ভয়ের মধ্যে আছেন তাঁরা, আর কত?'

সব শুনে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল মিসেস সেভারনের।

'আরও যে কত কি ঘটবে খোদাই জানে!' দুই হাতে মাথা চেপে ধরলেন তিনি। 'কাল রাতে এ রকম একটা ব্যাপার...তারপর এখন এই! টিকতে দেবে না!'

'কাল রাতে কি হয়েছিল?' জানতে চাইল মুসা।

'ভূতের উপদ্রব আছে যে ঘরটায়,' জবাব দিল কিশোর, 'সেটাতে নাকি অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেয়েছেন মিসেস সেভারন।'

'ভয়ানক শব্দ!' মিসেস সেভারন বললেন। 'মনে হলো নাকি স্বরে কাঁদছে কেউ, তারপর আবার খিলখিল করে হাসছে। ইনিয়ে বিনিয়ে কি সব বলছে।'

'জিনিসপত্রও নাকি তছনছ করেছে,' কিশোর বলল।

'ছায়ামূর্তিটার কথা বাদ দিচ্ছ কেন?' রবিন বলল।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অধৈর্য কণ্ঠে বললেন মিস্টার সেভারন, 'তারমানে বলে দিয়েছ ওদের! এ সব অতি কল্পনা...'

'না, কল্পনা নয়,' রেগে উঠলেন মিসেস সেভারন, 'আমি দেখেছি ওটাকে! কোন ভুল ছিল না। ফিনফিনে পোশাক পরা কুয়াশার মত একটা ধূসর মূর্তি হালকা পায়ে ছুটে গেল লনের ওপর দিয়ে।'

বোঝানোর চেষ্টা করলেন মিস্টার সেভারন, 'দেখো, কুয়াশার মধ্যে চাঁদের আলোয় অদ্ভুত সব আকৃতি তৈরি হয়, বাতাসে কুয়াশা উড়ে বেড়ানোর সময় মনে হয় মানুষ হাঁটছে...'

জোরে জোরে মাথা নেড়ে মিসেস সেভারন বললেন, 'না, আমি যা দেখেছি ঠিকই দেখেছি। চাঁদের আলোয় কুয়াশায় কি হয় না হয় জানা আছে আমার।'

স্বামী-স্ত্রীর তর্কটা বন্ধ করার জন্যে কিশোর বলল, 'ঘরটা আমাদের দেখাবেন বলেছিলেন?'

'তা তো দেখাবই। নিশ্চয় দেখাব,' মিসেস বললেন। 'তোমরা গোয়েন্দা। দেখো, কিছু বুঝতে পারো নাকি।'

ওদের নিয়ে চললেন তিনি। ভূতুড়ে ঘরটা রয়েছে বাড়ির পেছন দিকে, রান্নাঘরের পরে।

'বাড়ির সবচেয়ে পুরানো অংশ এটা,' সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন মিস্টার সেভারন। 'স্থানীয় একজন মিস্ত্রি বানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, মিস্টার জারভিস যখন থাকতেন। আমাদের আগের মালিক মিস্টার জারভিস, তাঁর কাছ থেকেই বাড়িটা কিনেছি। পেছনের এই দিকটা তেমন ব্যবহার করি না আমরা। জ্যাকি এ ঘরটাকে তার স্টাডি বানিয়েছিল। এখানকার জিনিসপত্র বেশির ভাগই তার। কিন্তু...' থেমে গেলেন তিনি। তারপর বললেন, 'ভূত নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না তার।'

দরজা খুললেন মিসেস। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগল গোয়েন্দাদের গায়ে। শীতের বাতাসের মত।

'খাইছে!' চমকে গেল মুসা। কিশোরের হাত খামচে ধরল।

হাতটা ছাড়িয়ে নিল কিশোর। 'ভয় পাচ্ছ?'

নীরবে মাথা নাড়ল মুসা।

'এ ঘরে আসতে আমার ভাল লাগে না,' কেঁপে উঠলেন মিসেস সেভারন। গায়ে কাঁটা দিল মনে হলো। 'জ্যাকি চলে যাওয়ার পর এটাকে সেলাইয়ের ঘর বানিয়েছিলাম আমি। কিন্তু এমন ঠাণ্ডার ঠাণ্ডা, হাড়ের মধ্যে ব্যথা শুরু হয়ে যায় আমার।'

সাবধানে ঘরে পা রাখল তিন গোয়েন্দা। কেঁপে উঠল কিশোর। তার টি-শার্ট আর সুতির প্যান্ট ঠাণ্ডা ঠেকাতে পারছে না। বাইরে কড়া রোদ থাকা সত্ত্বেও ঘরটার মধ্যে ডিসেম্বরের বিকেলের মত ঠাণ্ডা।

'বাপরে! সত্যি ঠাণ্ডা!' রবিন বলল।

'রোদ লাগে না কোন দিক দিয়ে,' মিস্টার সেভারন বললেন। 'ঘরের মধ্যে নেই কোন ধরনের হীটিং সিসটেম। শীতকালে যে আর্দ্রতা ঢোকে, সেটা আর বেরোতে পারে না। সারা বছর সেঁতসেঁতে হয়ে থাকে। গরম হবে

কোত্থেকে।'

'আগুন জ্বেলেও গরম করার চেষ্টা করে দেখেছি,' মিসেস বললেন। 'কাজ হয়নি। যে ঠাণ্ডা সেই ঠাণ্ডা।'

'নিচে একটা পুরানো সেলার আছে,' মিস্টার সেভারন বললেন। 'সেটাতে আছে চিমনি। সেই চিমনি দিয়ে নিচের ঠাণ্ডা ওপরে উঠে আসে।'

'আগের মালিক কিছু জিনিসপত্র ফেলে গেছেন,' হাত তুলে দেখালেন মিসেস সেভারন। 'ওই যে কার্পেটটা, ওটা ছিল তাঁদের। নতুন বাড়ি করে চলে গেছেন, তাতে এ জিনিস মানাবে না–বেশি পুরানো আমলের, তাই ফেলে গেছেন। আর ওই বুকশেলফটাও...'

কিশোর দেখল, মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে আছে কতগুলো বই। দেয়াল থেকে খুলে পড়েছে একটা ছবি। কেউ ফেলে দিয়েছে মনে হচ্ছে। পুরানো কার্পেটটা মেঝের বেশির ভাগ অংশই ঢেকে রেখেছে, জায়গায় জায়গায় দুমড়ানো। টেনে সোজা করে দেয়ার জন্যে নিচু হলো সে।

'অবাক কাণ্ড!' কিশোরকে দোমড়ানো জায়গাগুলো সমান করতে দেখে মিসেস সেভারন বললেন, 'আমি তো ভেবেছিলাম, ওটা পেরেক দিয়ে লাগানো। সোজা হবে না। কুঁচকালও, সোজাও হচ্ছে আবার!'

মেঝেতে পড়ে থাকা জিনিসগুলো তুলে সেলাইয়ের জিনিসপত্র রাখার বাক্সে রাখল রবিন। কিশোরকে সাহায্য করার জন্যে কার্পেটের একদিক ধরে টান দিল। নড়ল না। মেঝের তক্তার সঙ্গে আটকানো রয়েছে এদিকটা। বাক্সটা দিল মিসেস সেভারনের হাতে।

'গির্জায় যারা বিয়ে করতে আসে, তাদের পোশাক বানাতাম আমি,' মিসেস সেভারন বললেন। 'এখন আর পারি না। কাজ করতে গেলেই আঙুল কেমন আঁকড়ে আসে।'

'আশ্চর্য!' ঘরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বলল কিশোর। দেয়ালের কাঠের রঙ গাঢ় বাদামী। চেহারাটা কেমন বিষণ্ন করে দিয়েছে ঘরটার। 'দেখলে অবশ্য ভূতুড়েই মনে হয়।'

'তুমি বলছ এ কথা!' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।

'ভূতুড়ে লাগলেই যে ভূত থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই।'

'ভূতুড়ের মানে কি তাহলে?'

জবাব দিল না কিশোর।

জানালার কাছে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন মিস্টার সেভারন। মিসেস দলে ভারী হয়ে যাচ্ছেন দেখে যেন হতাশ হয়েছেন।

'আপনি বিশ্বাস করেন না এ সব?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না,' মাথা নাড়লেন মিস্টার সেভারন।

'মেঝেতে জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়ল কি করে? কেউ তো নিশ্চয় ফেলেছে।'

তাঁর হয়ে জবাবটা দিয়ে দিল রবিন, 'ভূমিকম্পেও পড়তে পারে। ক্যালিফোর্নিয়ায় তো আর ভূমিকম্পের অভাব হয় না, যখন তখন কেঁপে ওঠে

মাটি।'

'তাহলে বাকি ঘরগুলোর জিনিস মাটিতে পড়ল না কেন?' প্রশ্ন করলেন মিসেস সেভারন।

শুকনো হাসি হাসলেন মিস্টার সেভারন। 'বিশ্বাসই যখন করো, আসল কথাটাই বলে দাও ওদের।'

'আসল কথা?' ভুরু কুঁচকাল কিশোর।

'জোয়ালিন।'

'জোয়ালিন!' পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। মিস্টার সেভারনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'জোয়ালিনটা কে?'

এক এক করে তিনজনের দিকে তাকালেন মিস্টার সেভারন। লম্বা দম ছাড়লেন। তারপর বললেন, 'ভূত!'

পাঁচ

আবার দৃষ্টি বিনিময় করল গোয়েন্দারা।

মুসা ভাবছে, সত্যি সত্যি তাহলে বাড়িটাতে ভূতের উপদ্রব আছে! একটা মেয়ের ভূত রাত দুপুরে সত্যি ঘুরে বেড়ায় বাড়িময়!

ওদের দিকে তাকিয়ে কোনমতে মুখে হাসি ফোটালেন মিসেস সেভারন। তারপর ফিরলেন স্বামীর দিকে। 'গল্পটা শুনিয়েই দাও না ওদের।'

চেয়ারে হেলান দিলেন মিস্টার সেভারন। 'এই কটেজটা এক সময় অনেক বড় ছিল। আঠারোশো শতকে তৈরি করা একটা দুর্গের অংশ এটা। এই ঘরটা ছিল বিশাল ডাইনিং রুমের অংশ। মালিক ছিল ওয়ারনার নামে এক ধনী লোক। ওদের একমাত্র মেয়ে জোয়ালিন। অপূর্ব সুন্দরী। জন্মেছিল নববর্ষের দিনে। মা-বাবার চোখের মণি।'

'ভূতে ধরল কি করে তাকে?' ফিসফিস করে বলল মুসা। ভয়ও পাচ্ছে, কৌতূহলও দমন করতে পারছে না।

'শোনোই না!' রবিন বলল।

'এক জিপসি যুবকের প্রেমে পড়েছিল সে,' মিস্টার সেভারন বললেন।

চেপে রাখা দমটা আস্তে করে ছাড়ল রবিন। 'বাহ্, বেশ রোমান্টিক তো!'

গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'রোমান্টিক দেখলে কোথায়? এ তো ডবল ভূতের আলামত!'

মিস্টার সেভারন বললেন, 'তার বাবার ধারণা ছিল, ওদের টাকা-পয়সা দেখেই মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছে যুবক। ওসবের লোভে। তা ছাড়া সামান্য এক জিপসি যুবককেও পছন্দ করতে পারছিল না সে। অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়েও মেয়েকে ফেরাতে না পেরে শেষে ঘরে তালা দিয়ে রাখল।'

'সেই পুরানো কাহিনী!' বিড়বিড় করল কিশোর। 'বড়লোক বাপ তার

মেয়েকে কোনমতেই এক ছন্নছাড়ার হাতে তুলে দিতে চায় না। অতএব দুর্ঘটনা! তাই তো?'

মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার সেভারন। 'বাপের ওপর অভিমান করে মেয়ে কোন খাবারই স্পর্শ করল না; না খেয়ে খেয়ে মারা গেল।'

'এই ঘরের মধ্যে!' আঁতকে উঠল মুসা। চারপাশে তাকাতে লাগল এমন ভঙ্গিতে, যেন এখনই ভূতটা বেরিয়ে এসে ঘাড়ে চাপবে ওর।

'না, এখানে না, অন্য আরেকটা ঘরে; বহু আগেই আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে ওটা। দুর্গে আগুন লেগেছিল। তবে, এ ঘরে না মরলেও,' ওদের দিকে তাকিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে হেসে বললেন মিস্টার সেভারন, 'এখানে রাতের বেলা চুরি করে জোয়ালিনের সঙ্গে দেখা করতে আসত যুবক।'

'খাইছে!' মুসার ভঙ্গি দেখে মনে হলো সময় থাকতে উঠে চলে যাবে কিনা ভাবছে।

'জোয়ালিনের আর কোন ভাই-বোন ছিল না। তার মৃত্যুর পর খুব বেশিদিন আর বাঁচেনি তার বাবা-মা। পুরো পরিবারটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। লোকে বলে, জোয়ালিন এখনও তার প্রেমিকের অপেক্ষায় আছে। রাতের বেলা নাকি বেরিয়ে পড়ে তারই খোঁজে।'

গল্প শেষ হওয়ার পরে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল তিন গোয়েন্দা।

ঘোরের মধ্যে থেকে যেন বলে উঠল রবিন, 'বেচারি!'

'কি সব মানুষ!' বিরক্ত হয়ে বলল মুসা, 'খাবার নিয়ে আবার কেউ গোস্‌সা করে নাকি? মরার যেন আর কোন উপায় খুঁজে পেল না!'

'না খেয়েই নাহয় মরল,' মিস্টার সেভারন বললেন, 'কিন্তু তাতেই কি ভূত হয়ে যেতে হবে নাকি? আসলে এ রকম ইমোশনাল গল্প ভালবাসে লোকে, সেজন্যেই তৈরি করে।'

'তবে,' কিশোর বলল, 'মিসেস সেভারন যদি রাতের বেলা কিছু দেখেই থাকেন, তার কোন একটা বাস্তব ব্যাখ্যা নিশ্চয় রয়েছে।'

রবিন বলল, 'আপনাদের কেউ ভয় দেখাতে চেয়েছে।'

চট করে পরস্পরের চোখের দিকে দৃষ্টি চলে গেল বুড়ো-বুড়ির, কিশোরের চোখ এড়াল না সেটা।

'এস্টেট থেকে আসা পোলাপানগুলো হতে পারে,' মিস্টার সেভারন বললেন। 'ওদেরকে এদিকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি আমি। নিশ্চয় ভূতের গুজবটা ওরা শুনেছে। রাতে ভয় দেখাতে এসেছে আমাদের।'

মেঝেতে পড়ে থাকা একটা বই তুলে নিল কিশোর। মলাট ওল্টাল। সাদা পাতাটায় পেঁচানো অক্ষরে লেখা রয়েছে একটা নাম–জ্যাকুয়েল সেভারন। চিঠির ঠিকানার হাতের লেখা আর এই লেখার সঙ্গে মিল রয়েছে। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বলল, 'তারমানে ওরা ভাল ছেলে না। ভাল হলে রাতের বেলা অন্যের বাড়িতে ঢুকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করত না। ওরা আরও খারাপ কিছু করতে পারে। চুরিদারি, কিংবা যা খুশি। সাবধান থাকতে হবে আপনাদের। জানালায়ও তালা লাগাতে হবে। পুরানো আমলে তৈরি এ সব

জানালা সহজেই বাইরে থেকে খুলে ফেলা যায়।

'হ্যাঁ,' কিশোরের সঙ্গে একমত হলেন মিস্টার সেভারন।

ঘর দেখা হয়েছে। সারি বেঁধে বেরোনোর সময় জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'গুজবটা কি সবাই জানে নাকি এদিকের?'

'জানে,' মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার সেভারন। 'আগের মালিক তো তার বাড়িতে যে ভূত আছে এটা নিয়ে গর্বই করত। আমরা বাড়িটা কেনার আগে জ্যাকি যখন দেখতে এসেছিল, সব বলেছিল তাকে জারভিস। জ্যাকি গিয়ে সবখানে গপ মেরে ছড়িয়েছে, তার বাবা একটা ভূতুড়ে বাড়ি কিনতে যাচ্ছে। বলেছে হয়তো মজা করার জন্যেই, কিন্তু...'

এই সময় বাড়ির বাইরে থেকে ডাক দিল কে যেন। জানালার পর্দা সরাতে দেখা গেল ডাক পিয়ন। দরজার নিচ দিয়ে কয়েকটা চিঠি ঠেলে দিয়ে চলে গেল সে।

তুলে নিলেন মিস্টার সেভারন। ঠিকানাগুলো পড়তে লাগলেন। উদ্বিগ্ন মনে হলো তাঁকে।

কৌতূহলী হয়ে গলা বাড়িয়ে দিল কিশোর। একটা চিঠিতে দেখল সেই একই রকম লোগো। 'এস' আর 'এইচ' অক্ষর দুটো একটার সঙ্গে আরেকটা পেঁচিয়ে লিখে তৈরি করা হয়েছে লোগোটা।

'ওদের চিঠিও আছে?'

'কাদের' চিঠি, নামটা ইচ্ছে করেই যেন চেপে গেলেন মিসেস সেভারন।

মিস্টার সেভারনও একই রকম চেপে যাওয়া ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ।'

চিঠিগুলো হলের টেবিলে রেখে দিলেন তিনি

'ও আমাদের ছাড়বে না!' বিড়বিড় করে বললেন মিসেস সেভারন।

*

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তিন গোয়েন্দাকে বিদায় জানালেন দু'জনে।

রাস্তা দিয়ে কয়েকশো গজ এসে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। সাইকেল থেকে নেমে সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রাখল একটা দেয়ালে। দুই সহকারীকে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর? কে কি সূত্র পেলে?'

'আমি পেয়েছি,' রাগত স্বরে বলল মুসা, 'একটা খুনীকে! বনের মধ্যে আরেকটু হলেই ফুটো করে দিয়েছিল আমাকে।' পকেট থেকে কার্তুজের খোসা দুটো বের করল মুসা। 'এই দেখো। তুলে নিলাম যখন, তখনও গরম ছিল।'

একটা খোসা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল কিশোর, 'একটু অন্য রকম।'

'মানে?' কিশোরের হাত থেকে খোসাটা নিয়ে রবিনও দেখতে লাগল।

'চাচা একবার একটা পুরানো বন্দুক কিনে এনেছিল, কয়েক বাক্স পুরানো গুলি সহ,' কিশোর বলল। 'গুলিগুলো এ রকম ছিল। চাচা বলেছে, ঘরে বানানো গুলি ছিল ওগুলো।'

কিশোরের হাতে খোসাটা ফিরিয়ে দিল রবিন। 'এ রকম গুলি কখনও দেখিনি আমি। কোন মন্তব্য করতে পারব না।'

'আমিও দেখিনি,' মুসা বলল।

'হুঁ,' ওর দিকে তাকাল কিশোর। 'একটা লোক ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চাইল, দুটো গুলির খোসা পেলে; এ ছাড়া আর কিছু?'

মাথা নাড়ল মুসা। 'না। লোকটার চেহারা দেখতে পারলে ভাল হত। পাতার জন্যে ওপরটা দেখা যাচ্ছিল না। কাছে এসে যখন দাঁড়াল, চোখে পড়ল শুধু গাঢ় রঙের জ্যাকেটের নিচের অংশ। জিনসের প্যান্ট ছিল পরনে। পায়ে বুট। আর দশজন সাধারণ মানুষের মত।'

'দূরবীন দিয়ে চোখ রাখছিল যে লোকটা, সে-ই তাহলে?'

কাঁধ ঝাঁকাল মুসা, 'আর কে হবে।'

'ইস্, আল্লাহ্ বাঁচিয়েছে!' ওর কাঁধে হাত রাখল কিশোর, 'গুলি যে লাগেনি তোমার গায়ে! সর্বনাশ হয়ে যেত!'

'হ্যাঁ, আমি মারা যেতাম,' কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে বলল মুসা। 'এতিম হয়ে যেতে তোমরা।'

হাসল কিশোর।

ওকে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'তুমি কি জেনেছ?'

'কিছু চিঠি দেখেছি, তার মধ্যে দুটো চিঠি এসেছে কোন একটা কোম্পানি থেকে। লোগো দুটো এক। আরেকটা জিনিস অনুমান করছি–কেউ একজন হুমকি দিচ্ছে সেভারনদের?'

'হুমকি; তারমানে ব্ল্যাকমেল?'

'জানি না। মিসেস সেভারন কি বললেন শুনলে না? "ও আমাদের ছাড়বে না।" এই ও-টা কে?'

রবিন কোন জবাব দিতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, 'লোগোটা দেখতে কেমন?'

নোটবুক বের করে কলম দিয়ে তাতে 'এস' এবং 'এইচ' অক্ষর পেঁচিয়ে একটা ছবি আঁকল কিশোর। সেটা দেখিয়ে বলল, 'এই যে, এই রকম। দেখেছ কখনও?'

মাথা নাড়ল রবিন।

মুসাও মাথা নেড়ে বলল, 'না। কি এঁকেছ, মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বোঝা যাবে, পরে,' নোটবুকটা পকেটে রাখতে রাখতে বলল কিশোর, 'এ সব ছাড়াও ওবাড়িতে আছে একটা ভূতুড়ে ঘর। সারা ঘরে জিনিসপত্র ছড়িয়ে রেখে যাওয়ার ব্যাপারটা ইঙ্গিত করে, ওঁদের ভয় দেখাতে চাইছে কেউ। ঘরটা ভূতুড়ে হলেও কাজটা ভূতের নয়, এটা ঠিক।'

'জোয়ালিনের গল্প তুমি বিশ্বাস করছ না তাহলে?' ভুরু কোঁচকাল মুসা।

'গল্প গল্পই। তবে ঘটনা যা ঘটছে, তাতে ভূতের হাত নেই, আছে জলজ্যান্ত মানুষের হাত। কেউ ঘরে ঢুকে জিনিসপত্রগুলো ছড়িয়ে ফেলে

গেছে, কোন সন্দেহ নেই আমার তাতে।'

'তাহলে আমাদের জানতে হবে এখন,' রবিন বলল, 'সেই শয়তান লোকটা কে এবং কেন এই উৎপাত করছে।'

'ঠিক,' মুসা বলল।

'কিন্তু জানা যাবে কি করে?'

'সেকথায় পরে আসছি। তার আগে আরেকটা কথা বলে নিই–লোগো ছাড়াও আরও কয়েকটা চিঠি দেখেছি আমি। ঠিকানার ওপর যে রকম হাতের লেখা, জ্যাকির বইতেও একই রকম লেখা দেখেছি। তারমানে...'

'চিঠিগুলো জ্যাকির কাছ থেকে এসেছে!' কথাটা শেষ করে দিল রবিন। উত্তেজিত মনে হলো তাকে।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ। পোস্টমার্কও দেখেছি। যেখান থেকে চিঠিগুলো এসেছে সেখানকার পোস্টমার্ক।'

'কোনখান থেকে?'

'লস অ্যাঞ্জেলেস।'

'লস অ্যাঞ্জেলেসের কোনখান থেকে?'

'তা কি করে বলব?'

নিরাশ হলো রবিন। 'তাহলে আর লাভটা কি হলো! ঠিকানা না জানলে কিছু বের করা যাবে না।'

'জানব। শুরুতেই হাল ছেড়ে দিচ্ছ কেন? সবে তো তথ্য পেতে আরম্ভ করেছি আমরা।'

পকেট থেকে চকলেট বের করে মোড়ক ছাড়াল মুসা। 'শান্ত থাকতে হলে চকলেটের বিকল্প নেই।' একটা টুকরো ভেঙে রবিনকে দিল সে। আরেকটা কিশোরকে। বাকিটা নিজের মুখে ফেলে চিবাতে শুরু করল।

চকলেট মুখে দিয়ে হাসি ফুটল রবিনের মুখে।

হেসে মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'দেখলে তো, মগজটা কেমন হালকা হয়ে গেল? চকলেটের বিকল্প নেই।'

চকলেট গালে ফেলে কিশোর বলল, 'বাড়ি যাওয়া দরকার। ওই পচা প্রবন্ধটা শেষ করে ফেলতে হবে। যত তাড়াতাড়ি ঘাড় থেকে নামানো যায় ততই মঙ্গল। হুঁহ্, আর কাজ পেল না, পথিকদের নিয়ে প্রবন্ধ। নামটাও বাজে–ফুটপাথ এবং পথচারী!'

'সত্যি,' মুখ বাঁকাল মুসা, 'পচা সাবজেক্টই। তুমি না নিলেই পারতে।'

'কি করব না নিয়ে? যে ভাবে চাপাচাপি শুরু করল...'

'তা ঠিক। মিস্টার গোবরেডকে এড়ানোই মুশকিল। বাঁচলাম। আমি এ সব লেখালেখির মধ্যেও নেই, আমাকে গছাতেও পারবে না...'

সাইকেলটা রাস্তায় এনে উঠে বসল কিশোর। রবিন আর মুসাও চড়ল যার যারটায়। এগিয়ে চলল আবার।

পথের মোড়ে হঠাৎ দেখা গেল সাদা একটা ভ্যান। টায়ারের আর্তনাদ তুলে তীব্র গতিতে ছুটে আসছে।

'খাইছে!' বলেই ব্রেক কষে গতি কমিয়ে ফেলল মুসা। 'ভ্যানটাকে দেখেছি!'

'কোথায়?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল কিশোর।

'বনের মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। আমি আর মিস্টার সেভারন দু'জনেই দেখেছি।'

সাবধান হয়ে গেল কিশোর। মুসার কথা শুনে নয়, গাড়িটাকে অস্বাভাবিক দ্রুত ছুটে আসতে দেখে। সরু রাস্তায় আরও যে যানবাহন আছে কেয়ারই করছে না যেন গাড়িটা। গতি বাড়াচ্ছে বরং। কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, এঞ্জিনের শব্দে চাপা পড়ে গেল।

সরে যাবার চেষ্টা করল। বেধে গেল মুসার সাইকেলে। হ্যান্ডেলবারটা ছাড়িয়ে আনার জন্যে টানাটানি শুরু করল কিশোর।

'ছাড়ো, ছাড়ো!' চিৎকার করে উঠল মুসা। লাফ দিয়ে নেমে কিশোরের হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিয়ে এল রাস্তার পাশে। আছড়ে পড়ল সাইকেল দুটো।

'আরে!' চিৎকার করে উঠল রবিন, 'ইচ্ছে করে চাপা দিতে চাইছে!'

ছয়

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল কিশোর। তাকিয়ে আছে ভ্যানটার দিকে। গর্জন করে মোড়ের ওপাশে হারিয়ে যাচ্ছে ওটা। ফিরে তাকাল দুই সহকারীর দিকে। 'তোমাদের লেগেছে?'

'সামান্য,' মুসা বলল। 'এই ভ্যানটাকেই জঙ্গলের মধ্যে দেখেছিলাম। হলো কি লোকটার? বনের মধ্যে গুলি করল, রাস্তায় বেরিয়ে চাপা দিতে চাইল! মাতাল নাকি?' হাতের তালুর দিকে তাকাল সে। ঘষা লেগে ছড়ে গেছে।

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'আমার মনে হয় সেভারনদের বাড়ি থেকে আমাদের বেরোতে দেখেছে সে। কোন কারণে ভয় দেখাতে চাইছে আমাদের।'

সাইকেলটা তুলল সে। ছিঁড়ে বেঁকে যাওয়া একটা স্পোক সোজা করল।

'একই দিনে দুই দুইবার অল্পের জন্যে বাঁচলাম আজ,' শুকনো কণ্ঠে মুসা বলল। 'গোয়েন্দাগিরির কাজটা বড় বেশি বিপজ্জনক।'

'ছেড়ে দিতে চাও?'

'না না, ছাড়ার কথা বলছি না।'

'লোকটার চেহারা দেখেছ?' শার্ট থেকে ময়লা ঝেড়ে ফেলল রবিন।

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না। গাঢ় রঙের জ্যাকেটটা শুধু চোখে পড়েছে। সরেই তো সারতে পারছিলাম না, দেখব কখন?'

'আমিও পারিনি,' মুসা বলল। 'এক পলকের জন্যে দেখলাম, খেপাটা

স্টিয়ারিঙে হুমড়ি খেয়ে আছে।'

'তবে ভ্যানের পেছনের হলুদ লোগোটা দেখেছি। তোমরা দেখেছ?'

রবিন আর মুসা দুজনেই মাথা নাড়ল।

'আমারও তো তোমার অবস্থা,' রবিন বলল। 'সরে বাঁচব, না দেখব?' হাঁটু ডলল। জ্বালা করছে। 'ছড়ে গেছে মনে হয়। হাড্ডিতেও লাগল কিনা কে জানে। সকালে উঠে আর হাঁটতে পারব না কাল।'

'লোগোটা আমার চেনা,' বিড়বিড় করল কিশোর, 'খামের কোণায় যে লোগো দেখেছি, অবিকল সেরকম। হলুদ রঙের দুটো অক্ষর। এস আর এইচ অক্ষর দুটো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একটার ভেতর আরেকটা ঢুকিয়ে লিখে তৈরি করেছে।

'তবে ওই পেঁচানো অক্ষরের মালিক যারাই হোক,' শুকনো গলায় মুসা বলল, 'তারা ড্রাইভারের পদে একটা পাগলকে চাকরি দিয়েছে, যে দিনে-দুপুরে গাড়িচাপা দিয়ে মানুষ মারতে চায়।'

'ব্যাপারটা কাকতালীয়ও হতে পারে,' রবিন বলল।

'আমার তা মনে হয় না।'

'আমারও না,' কিশোর বলল। 'বনের মধ্যে গুলি করা, রাস্তায় গাড়িচাপা দেয়ার চেষ্টা, এবং একটা বিশেষ লোগো; সবই কাকতালীয় হতে পারে না। ওই লোগোটা কোন্ কোম্পানির, সেটা এখন খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

'কি করে?' রবিনের প্রশ্ন।

'জানি না। তবে উপায় একটা বেরিয়েই যাবে।'

*

পুরানো জিনিস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন রাশেদ পাশা, পুরানো বহু বাড়ি থেকে বহুবার জিনিসপত্র কিনে এনেছেন তিনি। সামনে পেয়ে তাঁকেই প্রথম জিজ্ঞেস করে বসল কিশোর। হতাশ হতে হলো না। ম্যানিলা রোড চেনেন রাশেদ পাশা। দুদিন আগেও গিয়েছেন একটা বাড়িতে পুরানো মাল দেখে আসার জন্যে। আবারও যাবেন। যাই হোক, জায়গাটার আগের মালিক কারা ছিল, পরে কারা কিনেছেন, বলতে পারলেন। সেভারনরা যে কিনেছেন, জানেন তিনি। ভূতের গুজবটাও শুনেছেন। তবে লোগোটা কোন কোম্পানির বলতে পারলেন না। তা না পারলেও একটা মূল্যবান পরামর্শ দিলেন, 'পাবলিক লাইব্রেরিতে চলে গেলেই পারিস। কোম্পানিগুলোর ওপর একটা ডিরেক্টরি করেছে ওরা। ওতে পেয়ে যাবি। এক কোম্পানির লোগো কখনও আরেক কোম্পানি নকল করে না, দুটোর চেহারা অবিকল এক রকম হয় না। সহজেই পেয়ে যাবি।'

চাচাকে ধন্যবাদ দিয়ে তক্ষুণি সাইকেল নিয়ে রওনা হলো লাইব্রেরিতে।

লাইব্রেরির 'তথ্য বিভাগে' ঢুকে তাকের দিকে এগোতে যাবে, কে যেন তার নাম ধরে ডাকল, 'হাই কিশোর!'

ফিরে তাকিয়ে দেখে কেরি জনসন হাত নাড়ছে। তেতো হয়ে গেল

মনটা। শুরু করবে এখন খোঁচানো কথা। আসার আর সময় পেল না মেয়েটা!

না গেলে কথা বলার জন্যে উঠে আসবে কেরি, কোনভাবেই তার হাত থেকে মুক্তি নেই। নিজে গিয়ে বরং কিজন্যে ডাকছে শুনে আসা ভাল। এগিয়ে গেল কিশোর। হাসিটা ধরে রেখে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ, কেরি?'

'ভাল। তুমি এই অসময়ে?'

'পড়াশোনার কি আবার সময়-অসময় আছে নাকি?'

জবাব দিতে না পেরে জিজ্ঞেস করল কেরি, 'তোমার লেখাটার কদ্দূর? ফুটপাথ অ্যান্ড হাইওয়ে?'

'হয়নি এখনও। হয়ে যাবে।'

'ও ব্যাপারে পড়াশোনার জন্যেই এলে নাকি?'

'নাহ্,' বই ঘাঁটতে গেলে তাক দেখেই অনুমান করে ফেলবে কেরি, কি খুঁজতে এসেছে কিশোর। কৌতূহল বেড়ে গেলে উঠে চলেও আসতে পারে দেখার জন্যে। ঝামেলা এড়ানোর জন্যে সত্যি কথাটাই বলল সে, 'একটা সাদা ভ্যানে বিচিত্র একটা লোগো দেখলাম। এস আর এইচ পেঁচিয়ে আঁকা। ভ্যানটা আরেকটু হলেই চাপা দিচ্ছিল আমাকে। পালিয়ে চলে গেল ড্রাইভার। কমপ্লেন করব আমি ওর নামে। ডিরেক্টরি দেখে কোম্পানির নামটা খুঁজে বের করতে এসেছি।'

'লোগোটা কেমন, এঁকে দেখাও তো।'

'চেনো নাকি তুমি?'

'দেখাওই না।'

কেরির সামনে নোটবুক আর পেন্সিল পড়ে আছে। এঁকে দেখাল কিশোর।

'ও, শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানি। চিনি তো। আমার আঙ্কেল চাকরি করে ওখানে।'

'কি বললে?'

'অবাক হওয়ার কিছু নেই। কোম্পানি যখন, যে কেউ চাকরি করতে পারে ওখানে, তাই না? আমার আঙ্কেল হলেই বা কি।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত প্রায় কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে কেরির দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। যাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল, কাকতালীয়ভাবে সে-ই একটা মস্ত উপকার করে দিল; অবশ্য না জেনে, কিশোররা যে তদন্ত করছে এটা জানলে হয়তো এত সহজে বলত না।

'তা তো বটেই,' অবশেষে জবাব দিল কিশোর। 'কোম্পানিটা কিসের? মাছ বেচাকেনার নাকি?'

হাসল কেরি। 'এ কথা মনে হলো কেন?'

'লোগোটা দেখে।'

'মাছের ধারেকাছেও না। জমি কেনাবেচার ব্যবসা করে ওরা। বাড়ি বানানোর কন্ট্রাক্ট নেয়।'

'জমি বেচাকেনা!'

'তোমার হলো কি আজ? কথায় কথায় অবাক হচ্ছ। কেন, জমি

বেচাকেনা কি দোষের নাকি?'

'না না, তা নয়...এমনি...'

বেশি কথা বলতে গেলে কি সন্দেহ করে বসে কেরি, এজন্যে তাড়াতাড়ি ওকে ধন্যবাদ দিয়ে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। বাড়ি ফিরে চলল।

*

'তারমানে...সত্যি সত্যি বলে দিল!' বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন।

বাড়ি ফিরেই ওকে ফোন করেছে কিশোর। 'হ্যাঁ। ভুল করে কি একখান উপকার করে ফেলেছে আমাদের, জানলে এখন নিজের হাত নিজেই কামড়ে খেয়ে ফেলবে।'

'মেজাজ-মর্জি বোধহয় খুব ভাল আছে আজ ওর। যাকগে, কি করবে এখন?'

'যাব ওদের অফিসে। জমি বেচাকেনা করে যখন, সেভারনদের জমিটা নেয়ার চেষ্টা করাটা অস্বাভাবিক নয়। হতে পারে, জায়গাটা কেনার প্রস্তাব দিয়েছে ওরা, বেচতে রাজি হচ্ছেন না মিস্টার সেভারন, সেটা নিয়েই বিরোধ। জমিটা কোম্পানির নেহাত দরকার, তাই ভয় দেখিয়ে বা অন্য যে কোনভাবেই হোক, তাঁদেরকে তুলে দেয়ার চেষ্টা করছে ওরা।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এটাই কারণ। বাবার সঙ্গে কথা বলবে নাকি?'

'কেন?'

'জমিটা নিয়ে কোন বিরোধ থাকলে, কিংবা কোন অঘটন ঘটলে স্থানীয় পত্রিকায় ছোটখাট নিউজ ছাপা হওয়ার কথা। পুরানো পত্রপত্রিকা ঘাঁটলে...'

'আজ ঘুম ভেঙে পুণ্যবান কারও মুখ দেখেছিলাম! চতুর্দিক থেকে চমৎকার সব সাহায্য আসছে। এক্ষুণি চলে এসো ইয়ার্ডে। তুমি এলেই আঙ্কেলকে ফোন করব। আঙ্কেল অফিসে থাকলে এখনই যাব চলে এসো। দেরি কোরো না।'

*

পত্রিকার বিশাল বিল্ডিংটাতে ঢুকে সরাসরি মিস্টার মিলফোর্ডের অফিসে চলে এল দুজনে। খুব ব্যস্ত তিনি। ছেলেদের দেখে সরাসরি কাজের কথায় এলেন, 'বছরখানেক আগেই সম্ভবত ওদের নিয়ে একটা নিউজ ছাপা হয়েছে। বারো-তেরো মাস আগের পত্রিকাগুলো ঘাঁটো, পেয়ে যাবে।'

এ অফিসে বহুবার এসেছে কিশোর আর রবিন। পুরানো পত্রিকা কোথায় রাখা হয় জানে। চলে এল সেঘরে। তাক থেকে পত্রিকার বান্ডিল নামিয়ে টেবিলে ফেলল। তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল দুজনে।

নিউজটা খুঁজে বের করতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বেশি লাগল না। আধ কলামের একটা লেখা বেরিয়েছিল শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির ওপর। কোম্পানির অফিসের একটা ছবি ছাপা হয়েছে। সাইনবোর্ডে বড় করে আঁকা লোগোটাও স্পষ্ট। লম্বা এক মহিলা দাঁড়ানো অফিসের সামনে। মূলত তাকে উদ্দেশ্য করেই ছবিটা তোলা হয়েছে। ছবির নিচে ক্যাপশন : শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির বর্তমান মালকিন মিসেস অগাস্ট শাজিন।

প্রতিবেদন পড়ে জানা গেল কোম্পানির মূল মালিক ছিলেন মিস্টার হ্যারিসন। শাজিন তাঁর স্ত্রী। বিয়ের বছর দুই পরেই ক্যান্সারে মারা গেলেন মিস্টার হ্যারিসন। শেষ দিকে বাজার খারাপ ছিল বলে প্রচুর ঋণ হয়ে গিয়েছিল কোম্পানির। ব্যাংক প্রস্তাব দিল নিলামে চড়ানোর। কিন্তু কোম্পানি বেচল না শাজিন। শক্ত হাতে হাল ধরল। ব্যাংকের ঋণ শোধ করে দিল সুদে-আসলে। কোম্পানিটা আবার দাঁড়িয়ে গেলেও অবস্থা এখনও ভাল নয়।

শাজিনের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে পত্রিকা লিখেছে, মিসেস শাজিন হ্যারিসন এই শহরের পতিত জমিগুলোর একটা বিহিত করতে চান। অহেতুক পড়ে থাকার চেয়ে ওগুলোতে কারখানা বা বহুতল আবাসিক বাড়ি কিংবা মার্কেট গড়ে তুলতে পারলে শহরেরও উন্নতি হবে, লোকের কর্মসংস্থানও হবে। তিনি সেই চেষ্টাই করছেন। এ ভাবে নিজেরও উন্নতি করতে চান, শহরবাসীরও।

চেয়ারে হেলান দিল কিশোর। মগজের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে ভাবনা। কোন সন্দেহ নেই আর তার, অতিরিক্ত লাভ দেখতে পাচ্ছে বলেই সেভারনদের বাড়িটা কিনে নিতে চায় শাজিন। বিরাট জায়গা সেভারনদের, কিন্তু জংলা বলে বাজার দর তেমন হবে না। বিক্রি করতে তাঁদের কোনমতে রাজি করাতে পারলে অল্প পয়সায়ই কিনে নিতে পারবে। আর শাজিনের যা পরিকল্পনা, সেটা বাস্তবায়িত করতে পারলে কোটিপতি হতে দেরি হবে না।

শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির আর কোন নিউজ আছে কিনা দেখতে শুরু করল আবার দুজনে। পাওয়া গেল আরেকটা ছোট খবর। কোম্পানিরই জনৈক কর্মচারী তাদের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছিল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নিরীহ মানুষের জমি দখলের অভিযোগ এনে।

'ইনটারেস্টিং!' কিশোর বলল। গভীর মনোযোগে কয়েকবার করে খবরটা পড়ল সে। মামলাটা আদালতে বিচারের জন্যে ওঠেনি একবারও। ধামাচাপা পড়ে গেল কিছুদিন পর সেই কর্মচারীকে অফিসের টাকা চুরির অপরাধে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। নামটা গোপন করে গেছে পত্রিকা, কারণ এখনও বিচার শেষ হয়নি লোকটার, চোর প্রমাণ করতে পারেনি আদালত।

'তারমানে রহস্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানিতে,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। 'যত শীঘ্র সম্ভব এখন গিয়ে হানা দিতে হবে ওদের অফিসে। কিন্তু তার আগে একবার সেভারনদের বাড়িতে যাওয়া দরকার।'

'কেন?'

জবাব দিল না কিশোর। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে।

সাত

বাড়ির কাছাকাছি আসতে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল এক লোকের সঙ্গে, কুকুর

নিয়ে হাঁটছে। সেভারনদের বাড়ির গেটে কিশোরদের থামতে দেখে এগিয়ে এসে বলল, 'সেভারনরা তো নেই।'

'কোথায় গেছেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'ডে সেন্টারে। সকালে।'

'ও।'

'এতটা পথ অযথাই এলাম,' কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল রবিন। লোকটার চলে যাওয়ার অপেক্ষা করল। তারপর বলল, 'ভেতরে আছে নাকি দেখা দরকার। থেকেও তো দেখা দেন না অনেক সময়।'

'কিন্তু ডে সেন্টারে চলে গেছেন বলল। না দেখলে কি আর বলেছে।'

'ফিরেও তো আসতে পারেন। যেতে দেখেছে, ফিরতে দেখেনি।'

'ঢুকে দেখতে বলছ?'

'অসুবিধে কি?'

এতটা এসে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে কিশোরেরও নেই। কটেজের পেছন দিকটায় এসে একটা জানালা খোলা দেখতে পেল। ভুরু কুঁচকে বলল, 'এ কি!'

'কি?'

'জানালা খোলা

'তাতে কি?'

'দরজা-জানালা বন্ধ রাখার ব্যাপারে অতিরিক্ত সাবধান ওঁরা। দেখা দরকার।'

'কি দেখতে এসেছ জানি না। যাই হোক, তুমি দেখতে থাকো, আমি ওই বনের দিকটায় একটু ঘুরে আসি।'

চারপাশে তাকাতে লাগল কিশোর। সামার-হাউসের দরজা খোলা, কিন্তু কাউকে চোখে পড়ল না। কয়লা রাখার বাংকারটার ওপরে উঠে ফ্যানলাইট উইন্ডোর ফাঁক হয়ে থাকা পাল্লার ভেতর দিয়ে উঁকি দিল।

মাথার ওপর দিয়ে একটা প্লেন উড়ে যাচ্ছে। ওটা চলে যাওয়ার পর যখন শব্দ সরে গেল একটা ঠনঠন শব্দ কানে এল। হাতুড়ি দিয়ে ধাতব কিছু পিটাচ্ছে কেউ। তারপর কটেজের ভেতরে আসবাব টানাটানি করার শব্দ। ভুরু কুঁচকে তাকাল সে সেভারনরা যদি ডে সেন্টারেই চলে গিয়ে থাকেন, কে টানাটানি করছে?

'মিস্টার সেভারন, মিস্টার সেভারন' বলে ডাক দিল সে।

জবাব নেই

ভেতরে ঢুকে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়ে সামার-হাউসে ঢুকে পড়ল সে। পুরানো একটা গুটিয়ে রাখা কার্পেটের পাশে তারের তৈরি পুরানো দুটো কোটের হ্যাঙ্গার। একটা হ্যাঙ্গার নামিয়ে এনে তারের মাথা যেখানে জোড়া দেয়া, সেখানটা খুলে ফেলল। তারটা সোজা করল টেনে টেনে। মাথার কাছটা সামান্য বাঁকিয়ে নিল বড়শির মত করে। ফিরে এসে আবার চড়ল কোল বাংকারে। ছোট ফ্যানলাইট জানালার মধ্যে তারের বাঁকা মাথাটা ঢুকিয়ে

ভেতরের হুড়কো খুলে ফেলল। মূল পাল্লাটা পুরো খুলে ফেলতে আর কোন অসুবিধে হলো না। এবার ঢোকা যাবে ওপথে।

ভাবনা চলেছে ওর মাথায়। ভেতরে যদি কেউ থেকেই থাকে, তাহলে কোনদিক দিয়ে ঢুকল সে? যদি এ জানালাটা দিয়ে ঢুকত, তাহলে আর হুড়কো লাগাত না, খোলা রাখত, যাতে তাড়াহুড়োর সময় দ্রুত বেরিয়ে যেতে পারে।

দুরুদুরু করছে বুকের মধ্যে। জানালা গলে ভেতরে ঢুকল কিশোর। আস্তে করে আবার লাগিয়ে দিল পাল্লা।

দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল একটা মুহূর্ত। ঢোকার আগে রবিনকে ডেকে এনে পাহারা দেয়ার জন্যে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখলে ভাল হত। এখন আর ওসব ভেবে লাভ নেই।

হঠাৎ একটা জোরাল শব্দে চমকে গেল সে। ভূতে আসর করা ঘরটা থেকে আসছে।

আস্তে করে দরজা খুলে সরু হলওয়ে ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল কিশোর। ভূতের ঘরের ভারী ওক কাঠের দরজাটা বন্ধ। তাতে কান চেপে ধরল। ভেতর থেকে আসছে ঠোকাঠুকির শব্দ। বিড়বিড় করে আপনমনে কথা বলছে কেউ।

খুব সাবধানে পিতলের নবটা চেপে ধরে ঘোরানো শুরু করল কিশোর। পুরোটা ঘুরে যেতে ঠেলা দিল। খুলে গেল দরজা। ঠাণ্ডা বাতাস এসে ধাক্কা মারল যেন গালে।

'কি...' বলতে গেল সে।

কালো একটা মূর্তি ঝুঁকে রয়েছে আগুনের ধারে পাতা টেবিলে রাখা টিনের ট্রাংকটার ওপর। ঝট করে সোজা হয়ে ফিরে তাকাল। চমকে গেল কিশোরকে দেখে। পরনে কালো জিনস, গায়ে কালো কমব্যাট জ্যাকেট। মাথার ব্যালাক্লাভা ক্যাপ টেনে নামিয়ে মুখ ঢেকেছে। চোখের জায়গার দুটো ফুটো দিয়ে কালো একজোড়া চকচকে মণি দেখা যাচ্ছে। লোকটা বেশ লম্বা। কেমন ঝুলে পড়া মেয়েলী কাঁধ।

তালা ভেঙে খোলা হয়েছে ট্রাংকটা। কাছেই পড়ে আছে একটা হাতুড়ি। বাইরে থেকে এই তালা ভাঙার শব্দই কানে এসেছিল।

তাড়াতাড়ি ট্রাংকের ভেতর থেকে একমুঠো দলিল তুলে নিল লোকটা। ওগুলো বেঁধে রাখা লাল ফিতেটা ঢিল হয়ে আছে।

'কে আপনি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'কি করছেন?'

কাগজগুলো দ্রুত পকেটে ভরার চেষ্টা করল লোকটা। ঢোকাতে না পেরে হাত থেকে ছেড়ে দিল। তুলে নিল হাতুড়িটা।

'সরো এখান থেকে! যাও!' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বিকৃত কণ্ঠে গর্জে উঠল সে। হাতুড়িটা ঝাঁকাতে লাগল বাড়ি মারার ভঙ্গিতে।

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মগজে। কি করা যায়? দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে যদি এখন দরজার তালাটা লাগিয়ে দিতে পারে, ঘরে আটকা পড়বে লোকটা। তারপর পুলিশকে ফোন করলে...। বাতিল করে দিল ভাবনাটা। ঘরে

আটকে থাকবে না লোকটা। জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে।

ভাবার সময় কম। কাছে চলে এসেছে লোকটা। লাফ দিয়ে পেছনে সরে গিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর। দৌড় দিল সিঁড়ির দিকে।

কিছুদূর উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখল সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে গেছে লোকটা। দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কালো চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে যেন সম্মোহিত করার চেষ্টা করছে ওকে।

বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল এই সময়, 'কিশোর, কোথায় তুমি?'

রবিন!

বুকের মধ্যে রক্ত ছলকে উঠল কিশোরের। চিৎকার করে বলল, 'রবিন, সাবধান!'

গজগজ করে কি যেন বলল লোকটা। এদিক ওদিক তাকিয়ে পালানোর পথ খুঁজল। সোজা গিয়ে সামনের দরজার শেকল সরিয়ে, দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

রবিনের চিৎকার শোনা গেল, 'অ্যাই, অ্যাই!'

দৌড়ে নেমে এল কিশোর। সামনের দরজার সামনে এসে দেখল, রাস্তাটার দিকে বোকা হয়ে তাকিয়ে আছে রবিন।

'কিশোর, লোকটা কে? আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দৌড়ে চলে গেল।'

'চোর! চোর!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমে গেটের দিকে ছুটল। পলকের জন্যে দেখল মোড়ের ওপাশে চলে যাচ্ছে লোকটা।

'চোর!' পেছনে প্রায় কানের কাছে শোনা গেল রবিনের চিৎকার। 'ঢুকল কি করে?'

'জানি না,' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল কিশোর।

'কি নিতে এসেছিল? দামী গহনা-টহনা আছে নাকি?'

'দেখার সময় পাইনি। কতগুলো কাগজ ঘাঁটতে দেখলাম।'

'তাহলে দেখে ফেলো না।'

'এসো।'

ভূতের ঘরটায় ফিরে এল ওরা। ট্রাংকের জিনিসগুলো ছড়িয়ে আছে মেঝেতে।

'এটা কি?' লাল ফিতেয় বাঁধা কাগজের বান্ডিলটা মেঝে থেকে তুলে নিতে নিতে বলল রবিন।

'দেখি।'

ফিতেটা খুলে কাগজগুলো দেখে গম্ভীর হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হুঁ, বাড়ির পুরানো দলিল।'

'এগুলো নিতে চেয়েছিল কেন?'

'জানি না। হতে পারে, সেভারনদের মালিকানার প্রমাণ গায়েব করে দিতে চেয়েছে।'

'আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। নিলে লাভটা কি? তুমি অফিস থেকে যে কোন সময় দলিলের নকল জোগাড় করে নিতে পারবেন মিস্টার সেভারন।' জানালার বাইরে চোখ পড়তে বলে উঠল রবিন, 'ওই যে, সেভারনরা আসছেন।'

কিশোরও এসে দাঁড়াল রবিনের পাশে। স্ত্রীকে ধরে ধরে আনছেন মিস্টার সেভারন।

ঘরের মধ্যে দুই গোয়েন্দাকে দেখে চমকে গেলেন তাঁরা।

'কিশোর!' কিছুই বুঝতে না পেরে চোখ মিটমিট করতে লাগলেন মিসেস সেভারন। 'কি করছ তোমরা এখানে?' খুব ক্লান্ত লাগছে তাঁকে। কাতরকণ্ঠে গুঙিয়ে উঠলেন।

'কি হয়েছে মিসেস সেভারনের?' জানতে চাইল কিশোর।

'ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে,' মিস্টার সেভারন বললেন। 'মোড়ের ওপাশে আমাদের নামিয়ে দিয়েছে মিনিবাসের ড্রাইভার, ডে সেন্টার থেকে এলাম আমরা। হেঁটে এগোচ্ছি, এই সময় মোড়ের ওপাশ থেকে দৌড়ে এসে ধাক্কা দিয়ে কোরিনকে মাটিতে ফেলে দিল একটা লোক, একেবারে উন্মাদ, পাগল ছাড়া কিছু তো মনে হয় না!'

'খামোকা ভয় পাচ্ছ তুমি, জন,' মিসেস বললেন। 'আমার কিছু হয়নি! লাগেনি কোথাও। পড়ে গিয়ে চমকে গেছি, এ ছাড়া আর কিচ্ছু হয়নি।'

'চিনতেও পারলাম না লোকটাকে...'

'আমি জানি, কে,' কিশোর বলল। 'যে লোক এ ঘরে ঢুকেছিল, সে-ই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে মিসেস সেভারনকে।'

'এ ঘরে ঢুকেছিল!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল মিসেস সেভারনের। চিৎকার দিয়ে উঠতে গিয়ে, মুখে হাত চাপা দিলেন। 'কিন্তু তোমরাই বা ঢুকলে কি করে?'

কিভাবে ঢুকেছে জানাল কিশোর। শেষে বলল, 'আপনাদের না বলে ঢোকার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু ঘরের মধ্যে শব্দ শুনে সন্দেহ হলো, ভাবলাম চোরটোর হবে, তাই...'

বাধা দিয়ে মিসেস বললেন, 'জন, আমি ভেবেছি জানালাটা তুমি লাগিয়ে গেছিলে!'

গম্ভীর হয়ে গেলেন মিস্টার সেভারন, 'মনে তো ছিল লাগিয়েছি...বাসটা এসে যেভাবে হর্ন দিতে শুরু করল, মাথার ঠিক থাকে নাকি কারও!'

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না,' কিশোর বলল, 'চোরটা ঢুকল কোন পথে? জানালা দিয়ে ঢোকেনি। বেরিয়ে গেল সামনের দরজা খুলে।' একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল দুজনের দিকে। 'তবে কিছু নিতে পারেনি।'

'আর থাকছি না আমি এখানে, অনেক হয়েছে!' আচমকা তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস সেভারন। 'তোমার বাড়ির মায়া ছাড়ো!'

'একটা চোরের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাব?' মিস্টার সেভারন নরম হলেন না।

'তাহলে কি পড়ে পড়ে মরব?'

'কে মারছে তোমাকে? অতি সাধারণ চোর। দুটো ছেলেকে দেখেই ভয়ে পালাল। ও কি করবে?'

'আমি একবার ভাবলাম,' কিশোর বলল, 'ওকে আটকে ফেলে পুলিশকে ফোন করব...'

'করোনি তো? ভাল করেছ। পুলিশ-টুলিশ চাই না এখানে।'

'কিন্তু...'

'কোন কিন্তু নেই!'

ধরে ধরে একটা চেয়ারে মিসেস সেভারনকে বসিয়ে দিল কিশোর আর রবিন।

'রবিন,' কিশোর বলল, 'এক কাপ চা বানিয়ে এনে দাও না মিসেস সেভারনকে।'

'যাচ্ছি,' বলেই রান্নাঘরের দিকে চলে গেল রবিন।

তাকের ওপর কাপ-পিরিচ নাড়াচাড়ার শব্দ শোনা গেল। দুজনের দিকে তাকাল কিশোর। 'দেখুন, দয়া করে এবার সব বলুন এখানে কি ঘটছে। কিছু লুকাবেন না, প্লীজ। আমরা আপনাদের সাহায্য করতে চাইছি। আমার বিশ্বাস, কেউ একজন ভালমত পেছনে লেগেছে আপনাদের। বাড়ি থেকে না তাড়িয়ে ছাড়বে না।'

নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিসেস সেভারন। তারপর মাথা তুলে তাকালেন স্বামীর দিকে। শান্তকণ্ঠে বললেন, 'বলো, জন।'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন মিস্টার সেভারন। 'যত নষ্টের মূল একজন মহিলা।'

'অগাস্ট শাজিন?'

ভুরু কুঁচকে গেল মিস্টার সেভারনের, 'তুমি জানলে কি করে?'

'তদন্ত করে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিস্টার সেভারন। 'তদন্তটা কিভাবে করেছ, জানতে চাই না। তবে একটা কথা স্বীকার করছি, বয়েস কম হলে কি হবে, খুব ভাল গোয়েন্দা তোমরা। নাম যখন জানো, এটাও নিশ্চয় জানো, জমি কেনাবেচার ব্যবসা আছে তার।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'জানি। এটাও অনুমান করেছি, আপনাদের বাড়ি থেকে আপনাদের তাড়াতে চাইছে সে-ই। জোর করে কিনে নিতে চাইছে। যেহেতু আপনারা রাজি হচ্ছেন না, ভয় দেখিয়ে বিদেয় করতে চাইছে।'

'হ্যাঁ। বনের ওপাশে যে স্পোর্টস সেন্টার আর শপিং সেন্টার করেছে, ওগুলোর মালিক শাজিন কোম্পানি। আরও নানা রকম সেন্টার করতে চায় সে, এর জন্যে বড় জায়গা দরকার, আর সেকারণেই আমাদের জায়গাটা নেয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। বাজারদরের চেয়ে বেশি তো দিতেই চায়, অন্য জায়গায় একটা বাড়িও দেবে বলেছে। কিন্তু সাফ বলে দিয়েছি, বেচব না। বুড়ো বয়েসে একটু শান্তি দরকার, শান্তিতে বাস করতে চাই; নড়াচড়া এখন

একদম সহ্য হবে না।'

'কিন্তু জন, জ্যাকি...'

'ওর কথা থাক।'

ছেলের কথা উঠতে কাঁদতে শুরু করলেন মিসেস সেভারন।

মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন মিস্টার সেভারন।

অস্বস্তিতে পড়ে গেল কিশোর। উসখুস করে বলল, 'যাই, দেখি, রবিনের চা কদ্দূর হলো।'

রান্নাঘরের দিকে যাওয়ার পথে হলঘরে চোখ পড়ল তার। টেবিলে পড়ে আছে এখনও চিঠিগুলো। কানে আসছে স্ত্রীর প্রতি মিস্টার সেভারনের সান্ত্বনাবাক্য।

এটাই সুযোগ! দ্রুত টেবিলটার কাছে চলে এল কিশোর। লস অ্যাঞ্জেলেস পোস্ট অফিসের ছাপ মারা চিঠিটা তুলে নিল। ঠিকানার হাতের লেখাটা দেখতে লাগল ভালমত। কোন সন্দেহ নেই। বইটাতে জ্যাকি সেভারনের লেখার সঙ্গে ঠিকানার হাতের লেখার হুবহু মিল রয়েছে।

কাঁপা হাতে চিঠিটা বের করল কিশোর। ওপরের দিকটায় শুধু তারিখ লেখা, কোনখান থেকে পাঠিয়েছে লেখেনি। নিরাশ ভঙ্গিতে মাটিতে পা ঠুকল সে। কিন্তু কাগজ উল্টে অন্যপাশটা দেখতেই চোখ স্থির হয়ে গেল তার। রবারের স্ট্যাম্প দিয়ে সীল মারা রয়েছে : পাসড্। প্যাসিফিক কাউন্টি প্রিজন, প্যাসিফিক কাউন্টি, লস অ্যাঞ্জেলেস।

প্রিজন! মানে জেলখানা! নিজের অজান্তেই ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। সেভারনদের ছেলে জেলখানায় বন্দি। সেজন্যেই তার সম্পর্কে কোন কথা বলতে চান না ওঁরা, এতক্ষণে পরিষ্কার হলো ব্যাপারটা।

জেলখানায় বন্দি, তারমানে অপরাধী। কিন্তু সেভারনদের মত ভালমানুষদের ছেলে অপরাধী এটা মেনে নিতে কষ্ট হলো তার। মনে পড়ল পত্রিকার নিউজটার কথা : শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির এক কর্মচারী কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছিল, পরে তাকেই চোর সাব্যস্ত করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

চিঠিটা আবার খামে ভরে টেবিলে আগের জায়গায় রেখে দিল কিশোর।

*

'বাজি রেখে বলতে পারি আমি, জ্যাকি অফিস থেকে টাকা চুরি করেনি। সব সাজানো ঘটনা। তাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে।'

বাড়ি ফেরার পথে সাইকেল চালাতে চালাতে বলল কিশোর।

'কে ফাঁদে ফেলল?' জানতে চাইল রবিন।

'এখনও বুঝতে পারছ না? চলো, বাড়ি চলো। সব বলব।'

আট

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ জ্যাকি নির্দোষ?' বেড়ায় হেলান দিল টুলে বসা মুসা। তিন গোয়েন্দার ওঅর্কশপে জরুরী আলোচনায় বসেছে ওরা।

'হ্যাঁ,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর। 'নিশ্চয় জ্যাকি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল শাজিনের জন্যে, কায়দা করে তাই জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এক ই সাথে সেভারনদের মনোবলও ভেঙে দিতে চেয়েছে।'

'অফিসে চাকরি করত বলে নাহয় ছেলেটাকে জেলে ঢোকানোর সুযোগ পেয়েছে,' রবিন বলল, 'কিন্তু তার বাবা-মাকে কি করে কটেজ থেকে সরাবে?'

'ওই যে, ভয় দেখাচ্ছে। সারাক্ষণ এ রকম স্নায়ুর ওপর চাপ দিতে থাকলে, এক সময় হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন সেভারন। সেটা রুখতে হবে আমাদের। ওই চোরটা কে, কোনখান থেকে এসেছে জানতে পারলে ভাল হত।'

'সেই লোকটা না তো,' মুসা বলল, 'যে আমার ওপর গুলি চালিয়েছিল? আমাদের গাড়ি চাপা দিতে চেয়েছিল?'

'আমার তাই ধারণা,' কিশোর বলল।

'লোগোওয়ালা ভ্যানটা যেহেতু চালায়, তারমানে শাজিনের কোম্পানিতে চাকরি করে সে?'

'করতে পারে। কিংবা শাজিন ওকে বহালই করেছে সেভারনদের ভয় দেখানোর জন্যে। ভয় পেয়ে সরে গেলে তখন বাধ্য হয়ে কটেজ আর সমস্ত জায়গা শাজিনের কাছে বিক্রি করে দেবেন মিস্টার সেভারন, মহিলা নিশ্চয় সেটাই ভাবছে।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মুসা বলল, 'এক কাজ করলে কেমন হয়, জ্যাকিকে একটা চিঠি লিখে দিতে পারি আমরা। ও এখন কোথায় আছে জানি। দিতে অসুবিধে কি?'

'কোন অসুবিধে নেই,' ড্রয়ার থেকে কাগজ-কলম বের করল কিশোর। 'বরং ভাল হবে। বাবা-মাকে তখন চিঠি লিখে বাড়ি ছাড়তে নিষেধ করবে সে। তাতে মনে জোর পাবেন সেভারনরা।'

'কি লিখবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'লিখব, আমরা তার বাবা-মা'র তিনজন বন্ধু। লিখব, তাঁদের জন্যে আমরা উদ্বিগ্ন, কারণ অগাস্ট শাজিন...' থেমে গেল কিশোর।

'থামলে কেন?' ভুরু নাচাল মুসা।

চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'লিখব, তার বাবা-মাকে ভয় দেখানোর জন্যে লোক নিয়োগ করেছে শাজিন। ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে।'

'তা দেখা যায়,' মাথা দোলাল রবিন।
'এখানে যা যা ঘটছে, সবই লিখব। ওর বাবা-মা যে পুলিশের কাছে যেতে চাইছেন না, এ কথাও জানাব।'
'আচ্ছা,' অন্য প্রসঙ্গে গেল মুসা, 'শাজিন আর তার শয়তান গুণ্ডাটা কি বুঝতে পারছে আমরা তদন্ত করছি?'
মাথা নাড়ল কিশোর, 'মনে হয় না। ও হয়তো ভেবেছে, আমরা সেভারনদের বন্ধু, কিংবা আত্মীয়; তাই ওঁদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বন্ধ করার জন্যে আমাদেরও ভয় দেখিয়েছে। ভেবেছে বন্দুক তুললে আর গাড়ি চাপা দেয়ার ভয় দেখালেই সুড়সুড় করে গর্তে ঢুকে পড়ব আমরা।'
'ব্যাটাকে হাতে পেলেই হয় একবার, ওর বন্দুক দেখানো আমি বের করব!'
জ্যাকিকে চিঠি একটা লিখেই ফেলল কিশোর।
রবিন বলল, 'আমার কাছে দাও। বাড়ি যাবার পথে পোস্ট করে দিয়ে যাব। আশা করি কালই চিঠিটা পেয়ে যাবে সে।'

*

পরদিন সকালে মিসেস সেভারনের ফোন পেল কিশোর।
'কিশোর,' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন তিনি, 'তোমরা কি একবার আসতে পারবে?'
'পারব। কেন, মিসেস সেভারন?'
'কাল রাতে অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। তোমরা এসো। এলে তদন্ত করতে পারবে।'

*

তিন গোয়েন্দা কটেজে পৌঁছে দেখল রাতের ঘটনায় মিসেস সেভারন গেছেন ভড়কে, মিস্টার সেভারন গেছেন রেগে।
'দেখো, কি করেছে,' মাড়িয়ে নষ্ট করে ফেলা ফুলের বেডগুলো দেখালেন মিস্টার সেভারন। 'পাতাবাহারের বেড়াটা পুরো ধসিয়ে দিয়েছে।' রাগে, ক্ষোভে হাতের মুঠো শক্ত হয়ে এল তাঁর। গলাটা খসখসে শোনাল। 'আরও কি সর্বনাশ করেছে জানো? বাগানের পুকুরটার পানি নষ্ট করে দিয়েছে পোকা মারার বিষ ফেলে। গন্ধ পাচ্ছ? সমস্ত গোল্ডফিশগুলো মেরে ফেলেছে।'
নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকতে লাগল কিশোর। 'হ্যাঁ, পাচ্ছি। ফুল গাছের পোকা মারার জন্যে আমিও এ বিষ পানির সঙ্গে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করেছি বহুবার।'
নিচু হয়ে নষ্ট করে ফেলা ফুলের বেডগুলো পরীক্ষা করতে লাগল সে। জুতোর ছাপ চোখে পড়ল। রাবার সোলের জুতো। গোড়ালিতে গোল গোল চক্র, ভালমতই দাগ বসে গেছে। 'আপনাদের ভয় দেখিয়ে ভড়কে দেয়ার জন্যেই এ কাজ করেছে শয়তানটা।' মুখ তুলে মিস্টার সেভারনের দিকে তাকাল সে, 'যাতে কটেজ বেচে দিয়ে চলে যান।'
'জানি,' তিক্তকণ্ঠে বললেন মিস্টার সেভারন। 'চলো, ঘরে চলো। একটা

জিনিস দেখাব তোমাকে।'

*

ঘরে পা দিয়ে মিসেস সেভারনকে রবিন আর মুসার কাছে বলতে শুনল কিশোর, '...কাল রাতে আবার শুনেছি সেই অদ্ভুত শব্দ।'

'ক'টার সময়?' জানতে চাইল রবিন।

'রাত বারোটার দিকে...বারোটায় শুরু হলো, কয়েক ঘণ্টা ধরে চলল।'

'বাতাসের শব্দ নয়তো?' মুসা জিজ্ঞেস করল, যদিও তার সন্দেহ নেই ভূতে করেছে ওসব শয়তানি। 'সত্যি, রাতের বেলা শব্দগুলো ভয়ঙ্কর লাগে শুনতে। ফায়ার পর্যন্ত মাঝে মাঝে ঘাবড়ে গিয়ে অস্থির হয়ে ওঠে।'

'আমার মনে হয় না বাতাসের শব্দ,' মিসেস সেভারন বললেন। 'শুধু কি তাই...' কাঁপা হাতে কার্ডিগানের পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে দিলেন তিনি, 'দেখো!'

মুসা বা রবিন ধরার আগেই এগিয়ে এসে চিঠিটা নিয়ে নিল কিশোর। খামের গায়ে নোংরা আঙুলের ছাপ। ভেতরে এক টুকরো কাগজ। তাতে টাইপ করে একটা লাইন লেখা। বাংলা করলে দাঁড়ায়:

কাল রাতে ঘুমাতে পেরেছ?

নীরবে কাগজটা রবিনের দিকে বাড়িয়ে দিল কিশোর, যাতে রবিন আর মুসা দুজনেই দেখতে পারে।

'খাইছে!' দেখেই বলে উঠল মুসা। মিসেস সেভারনের দিকে তাকাল। 'কখন পেলেন?'

'সকালে। ডাকবাক্সে,' গলা কাঁপছে মিসেস সেভারনের। 'কি করব আমরা, বলো তো? এই অত্যাচার আর তো সহ্য করতে পারছি না!'

নীরবে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা।

সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে আস্তে করে তাঁর বাহুতে হাত রাখল কিশোর। 'আজ রাতে এসে পাহারা দেব আমরা। কোনমতে যদি ধরতে পারি বাছাধনকে, জেলের ঘানি না টানিয়ে ছাড়ব না। কত্তবড় সেয়ানা লোক, দেখে নেব।'

'না না, এ কাজ করতে দেব না আমি তোমাদের! ওরা লোক ভাল না। বিপদ হতে পারে। খারাপ কিছু ঘটে গেলে কি জবাব দেব তোমাদের বাবা-মা'র কাছে?'

'এ নিয়ে এক বিন্দু চিন্তাও আপনি করবেন না,' অভয় দিল রবিন। 'বিপদে পড়লে কি করে উদ্ধার পেতে হয় জানা আছে আমাদের। শুনলে আমাদের আব্বা-আম্মা কিছু তো বলবেই না, বরং তারাও সাহায্য করতে চাইবে আপনাদের।'

'হ্যাঁ,' রবিনের কথায় সুর মিলিয়ে বলল মুসা, 'কিচ্ছু চিন্তা করবেন না আপনারা।'

হাসলেন মিসেস সেভারন। কিন্তু দ্বিধা যাচ্ছে না তাঁর। 'তবু, সাবধান থাকা

উচিত তোমাদের।'

'তা তো থাকবই,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'আমাদের জন্যে চিন্তা করবেন না।'

বিদায় নেয়ার আগে কিশোর জানতে চাইল, হুমকি দিয়ে লেখা নোটটা তার কাছে থাকলে কোন অসুবিধে আছে কিনা।

'কি করবে এটা দিয়ে?' জানতে চাইলেন মিস্টার সেভারন।

'এখনও জানি না। তবে তদন্ত করতে গেলে কাজে লাগতে পারে।'

'বেশ, রাখো। কাজে লাগলে তো ভালই।'

*

'টাইপিঙের গোলমালটা চোখে পড়েছে তোমাদের?' বাড়ি ফেরার সময় সাইকেল চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ,' রবিন বলল, 'ও অক্ষরটা সবখানেই বড় হাতের, বাক্যের শুরুতেও, বাক্যের মাঝখানেও। মেশিনের ওই কী'টা নষ্ট। টিপতে গেলে বার বার ক্যাপিটল লেটারটাই ওঠে।'

'সেজন্যেই চিঠিটা নিয়ে এলাম। এই সূত্র ধরেই লেখকের আস্তানা আর তার নামটা খুঁজে বের করে ফেলতে পারব। তারপরে রয়েছে খামের ওপর আঙুলের ছাপ। প্রমাণও করা যাবে কে লিখেছে চিঠিটা, কোনমতেই পার পাবে না। বাগান যে তছনছ করেছে, তাকেও ধরা কঠিন হবে না। চিঠির লেখক আর বাগান তছনছকারী একই লোক হলে তো আরও ভাল।'

'সেভারনদের ওখানে ক'টার সময় যেতে হবে?' জানতে চাইল মুসা।

'দেখি। এগারোটার আগে গিয়ে বোধহয় লাভ হবে না।'

*

উষ্ণ রাত। গা আঠা করা গরম। বাতাসে ঝড়ের সঙ্কেত। ওঅর্কশপের বেড়ায় হেলান দিয়ে রাখা সাইকেল তিনটা যখন সরিয়ে এনে চেপে বসল তিন গোয়েন্দা, এক টুকরো ঘন কালো মেঘ ঢেকে দিয়েছে চাঁদ।

'ঝড় আসবে,' আকাশের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বলল রবিন।

'নৈশ অভিযানের ষোলোকলা পূর্ণ হবে তাহলে,' শুকনো গলায় বলল মুসা।

'কি আর হবে,' শান্ত রয়েছে কিশোর, 'উত্তেজনাটা বাড়বে আরকি।'

সাইকেলের আলোটা জ্বেলে দিল সে। সামনের জঞ্জালের ওপর ছড়িয়ে পড়ল আলো। প্যাডালে চাপ দিয়ে বলল, 'চলো, যাই।'

*

সেভারনদের বাড়িতে বনের কিনারে একটা ওক গাছের নিচে বসে আছে তিনজনে। মাথার ওপর বাতাসে মড়মড়, সরসর, কটকট করছে গাছের ডালপাতা। কালো মেঘের আড়াল থেকে মুহূর্তের জন্যে বেরিয়ে আবার ঢুকে গেল চাঁদটা। দূর থেকে ভেসে এল বজ্রের চাপা গুমগুম শব্দ। পৃথিবীটাকে গুঁড়িয়ে দেবার হুমকি দিচ্ছে যেন।

'ব্যাপারটা মোটেও পছন্দ হচ্ছে না আমার,' পকেট থেকে চকলেট বের

করে মোড়ক খুলতে শুরু করল মুসা। 'শুধু চোর-ডাকাত হলে এক কথা ছিল, মানুষকে আমি কেয়ার করি না, কিন্তু...'

একটা পেঁচা ডাকল ওকের ডালে। কাঁপা, কর্কশ, ভুতুড়ে ডাক ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। সেই সঙ্গে বাতাসের ক্রুদ্ধ ফিসফিসানি মিলে এক ভয়ানক পরিবেশ সৃষ্টি করল। গায়ে কাঁটা দিল মুসার। সরে এসে গা ঘেঁসে বসল দুই সঙ্গীর মাঝখানে।

অন্ধকারে মুচকি হাসল রবিন। ফিসফিস করে বলল, 'এমন রাতেই ভ্যাম্পায়ারেরা বেরোয়। সেই সিনেমাটাতে দেখোনি, দুটো টিনএজার ছেলেমেয়ে কিভাবে রক্ত খেতে বেরিয়েছিল রাত দুপুরে...'

'আহ, কি সব অলক্ষুণে কথা শুরু করলে...'

'চুপ!' চাপা গলায় সাবধান করল কিশোর। 'ওই দেখো!'

'কি-কি...' ভীষণ চমকে গিয়ে তোতলাতে শুরু করল মুসা।

'আরে, দেখছ না? ওই যে, ওদিকে।'

রবিন আর মুসাও দেখল, পা টিপে টিপে সেভারনদের কটেজের দিকে এগিয়ে চলেছে একটা ছায়ামূর্তি। হাতে ঝুলিয়ে কোন ভারী জিনিস বয়ে নিচ্ছে।

'এল কোত্থেকে ও?' অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রবিন। 'মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো নাকি?'

'ভ্যা-ভ্যা-ভ্যাম্পায়াররা যে কোনওখান থেকে...'

'আমি শিওর, রাস্তায় কোনখানে গাড়িটা রেখে এসেছে ও,' মুসাকে থামিয়ে দিয়ে বলল কিশোর। 'এবং কি গাড়ি, তা-ও বলে দিতে পারি।'

হঠাৎ দশদিক আলোকিত করে দিল বিদ্যুতের তীব্র নীল শিখা। ক্ষণিকের জন্যে স্পষ্ট দেখা গেল লোকটাকে। মাথায় ব্যালাক্লাভা ক্যাপ, গায়ে গাঢ় রঙের পোশাক।

'সেই লোকটাই!' উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর।

'খাইছে!' আপনাআপনি মুসার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল শব্দটা।

একদৌড়ে ঘাসে ঢাকা সবুজ জমি পেরিয়ে বাগানে ঢুকে পড়ল লোকটা।

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। সেই সঙ্গে বিকট শব্দে বাজ পড়ল। মুখ তুলে তাকাল তিনজনেই। ওকের বড় একটা ডালে আঘাত হেনেছে বজ্র। স্ফুলিঙ্গ আর আগুনের কণা লাফ দিয়ে উঠে গেল কালচে ধোঁয়াটে আকাশে। আতঙ্কিত চিৎকার করে উড়ে গেল একঝাঁক পাখি।

ভয় পেয়েছে গোয়েন্দারাও। বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে দেখল ভেঙে পড়ছে ডালটা।

সবার আগে সামলে নিল মুসা। এক চিৎকার দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সামনে ছুটে গিয়ে ডাইভ দিয়ে পড়ল বনের মধ্যে, আরও ঘন গাছপালার আড়ালে। দেখাদেখি অন্য দুজনও তা-ই করল। কানফাটা শব্দ করে ভেঙে পড়ল ডালটা, একটু আগে ওরা যেখানে ছিল ঠিক সেখানে। বড় বাঁচা বেঁচেছে।

ঘাসের মধ্যে উবু হয়ে বসে আছে মুসা। কিশোর আর রবিন বসলে জিজ্ঞেস করল, 'লাগেটাগেনি তো?'

'না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর।
রবিনও জানাল লাগেনি।
আবার গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল তিনজনে।
'যা চেঁচামেচি করলাম,' তিক্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'আশেপাশের দশ মাইলের মধ্যে সবাই জেনে গেছে। বসে থেকে কোন লাভ হলো না। লোকটা নিশ্চয় চলে গেছে।'
'না, যায়নি,' মুসা বলল। 'ওই যে।'
সেঁভারনদের বাগানেই আছে এখনও লোকটা। বজ্রপাত, ডাল ভেঙে পড়া আর বাতাসের শব্দে বোধহয় চেঁচামেচি কানে যায়নি তার, কিংবা গেলেও মানুষের চিৎকারটা আলাদা করে বুঝতে পারেনি। হাতের ভারী জিনিসটা দেখা যাচ্ছে না। ঝুঁকে আছে ছাউনিটার ধারে। আগুন জ্বলে উঠল। একটা মুহূর্ত আলোকিত করে রাখল লোকটার মাথা।
'কি করছে?' বাতাসের শব্দকে ছাপিয়ে ফিসফিস করে বলল রবিন।
'বুঝতে পারছি না,' মুসা বলল। 'তবে ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে না ভাল কিছু।'
আবার জ্বলে উঠল আগুন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ কিশোর। চিৎকার করে উঠল, 'সর্বনাশ! ছাউনিতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে!'

নয়

ঝট করে সোজা হলো লোকটা। চারপাশে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল কে কথা বলেছে। মোরগের মত ঘাড় কাত করে রেখেছে শোনার জন্যে।
'শুনে ফেলেছে!' কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব খাদে নামিয়ে রেখে রবিন বলল।
কেরোসিন বা পেট্রলে ভেজানো কাপড়ের টুকরোয় আগুন ধরিয়ে ছাউনির ওপর ছুঁড়ে মারল লোকটা। লাফ দিয়ে সরে দাঁড়াল লোকটা। এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখল আগুনটা ধরছে কিনা। তারপর ঘুরে দৌড় মারল সামনের গেটের দিকে। চোখের পলকে গেট পেরিয়ে রাস্তায় চলে গেল।
আবার আলোকিত হয়ে গেল বাগানের একটা ধার। বিদ্যুতের আলোয় নয় এবার, আগুনের। দাউ দাউ করে ধরে যাচ্ছে।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'জলদি চলো!' লম্বা ঘাস মাড়িয়ে ছুটল ছাউনির দিকে।
'হোসটা ওদিকে!' কাছে পৌছে চিৎকার করে বলল সে। 'পেছনের দরজার ওপাশে আছে, সকালে দেখেছি।' বুঝতে পারছে তাড়াতাড়ি নেভাতে না পারলে সামার-হাউসটাতেও ধরে যাবে। 'রবিন, ট্যাপটা ছেড়ে দিয়ে এসো।'
ট্যাপ ছাড়তে গেল রবিন। কিশোর আর রবিন মিলে দ্রুত হোসপাইপটা খুলে ফেলতে শুরু করল। পানি বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে আগুনের দিকে পাইপের মুখ ঘুরিয়ে দিল কিশোর। কিন্তু কমার কোন লক্ষণ নেই আগুনের।

ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। কেরোসিন নয়, পেট্রল ছিটিয়েছে লোকটা। শুধু পানি দিয়ে এ আগুন নেভানো যাবে না। উপায়?

মরিয়া হয়ে সামার-হাউসের দিকে তাকাল কিশোর। দরজাটা খোলা। একদৌড়ে ঢুকে পড়ল সে। গুটিয়ে রাখা পুরানো কার্পেটটা ধরে টান দিল। নড়ে উঠল ওটা। কিন্তু একা একা টেনে বের করা খুব কঠিন কাজ।

'এই, এসো তো, ধরো আমার সঙ্গে!'

বাইরে বের করে কার্পেট দিয়ে আগুন লাগা জায়গাগুলো ঢেকে দেয়ার চেষ্টা করল ওরা। সেটা আরও কঠিন কাজ। পুরানো আমলের কার্পেট, বেজায় ভারী। আগুনের ওপর ছুঁড়ে মেরে ছড়িয়ে দেয়া সহজ কথা নয়।

'নাহ্, হবে না!' আশা ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। কিন্তু কাজ বন্ধ করল না। ওপরে ছড়াতে না পেরে কম্বলের কোণা আর ধার দিয়ে বাড়ি মারতে লাগল বেড়ার গায়ে। সেই সঙ্গে চলছে হোস দিয়ে পানি ছিটানো।

আগুনের আঁচে মুখের চামড়া আর চুল পুড়ে যাবার জোগাড় ওদের। ধোঁয়া বাড়ছে। ঘন হচ্ছে ক্রমে।

'কমছে, কমছে!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'থেমো না। চালিয়ে যাও।'

অবশেষে নিভে এল আগুন। বাতাসে ধোঁয়া, পেট্রল আর কম্বল পোড়া উলের তীব্র গন্ধ। কম্বলটা আগুনের ওপর ফেলে রাখলে নতুন করে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হতে পারে। টেনে সরিয়ে এনে পা দিয়ে মাড়িয়ে পোড়া জায়গাগুলো নিভিয়ে দিতে লাগল মুসা আর কিশোর। ছাউনির যেসব জায়গায় এখনও আগুন জ্বলছে, সেসব জায়গা লক্ষ্য করে সমানে পানি ছিটিয়ে চলল রবিন। পানি লাগলেই ছাঁৎ করে ওঠে আগুন, গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে।

'ভাগ্যিস কার্পেটটার কথা মনে পড়েছিল তোমার,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। ধপ করে বসে কপালে হাত বোলাতে লাগল, 'শুধু পানি দিয়ে এই আগুন কোনমতেই নেভানো যেত না।'

মুসা আর কিশোরও এসে বসল ওর পাশে। দুজনেই ক্লান্ত।

'আমরা না এলে আজ এখানে কি ঘটত কে জানে,' গম্ভীর স্বরে বলল কিশোর।

'দেখো, কি পেয়েছি,' হলুদ রঙের একটা পেট্রল ক্যান তুলে দেখাল মুসা। 'কোল বাঙ্কারের ওপাশে ফেলে দিয়েছিল।' ঝাঁকি দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'অর্ধেক ভরা এখনও। সুযোগ পেলে সারা বাড়িই পুড়িয়ে দিত আজ।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর, 'কটেজেও লাগাত।'

আঁতকে উঠল রবিন। 'ভেতরে মানুষ আছে জানা সত্ত্বেও!'

'জানা সত্ত্বেও। বড় ভয়ঙ্কর শত্রু সেভারনদের। স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে মানুষ খুন করতেও দ্বিধা করবে না, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এখন।'

চুপ করে ভাবতে লাগল তিনজনেই।

কটেজের পেছনের দরজা খুলে গেল হঠাৎ। বেরিয়ে এলেন মিস্টার আর মিসেস সেভারন। দুজনের পরনেই শোবার পোশাক। আতঙ্কিত ভাবভঙ্গি।

ঘরের ভেতর থেকে আগুন লাগাটা নিশ্চয় দেখেছেন তাঁরা। সাহস করে বেরোতে বেরোতে দেরি হয়ে গেছে।

কি ঘটেছে তাঁদেরকে জানাল তিন গোয়েন্দা।

টর্চ জ্বেলে ছাউনির পোড়া জায়গাগুলো দেখাতে লাগল কিশোর। মাটিতে পড়ে থাকা একটা জিনিসের ওপর চোখ পড়তেই এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে তুলে নিল। একটা ব্যাজ। জ্যাকেটে লাগানো ছিল। খসে পড়ে গেছে। পরে ভালমত দেখবে ভেবে পকেটে রেখে দিল ওটা সে।

ঝড় থেমে গেছে। কিন্তু আকাশের রঙ এখনও কালির মত কালো। সকাল বেলা আবার আসতে হবে, মনে মনে বলল কিশোর; এত অন্ধকারে রাতের বেলা আর কোন সূত্র খুঁজে পাওয়ার ভরসা কম।

*

'কি বলে যে ধন্যবাদ দেব তোমাদের!' মিসেস সেভারন বললেন। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকেছেন।

'আপনাদের কার্পেটটা গেল,' প্রশংসা-পর্বটা ধামাচাপা দেয়ার জন্যে বলল রবিন।

'যায় যাক,' মিস্টার সেভারন বললেন। 'পড়েই তো ছিল, বরং একটা জরুরী কাজে লাগল।'

'এখন তো পুলিশকে অবশ্যই জানানো দরকার,' গরম চকলেটের মগে চুমুক দিতে দিতে বলল মুসা। 'ব্যাপারটা এখন বিপজ্জনক হয়ে গেছে। বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ওরা। এখনও সাবধান না হলে শেষে মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারে।'

'না,' পুলিশকে জানাতে এখনও আপত্তি আছে মিস্টার সেভারনের, 'নিজেরাই সামলাতে পারব আমরা। তোমরা আমাদের সাহায্য করছ, এতেই হবে, পুলিশকে আর দরকার নেই।'

ভুরু তুলে দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। অসহায় ভঙ্গি করল মুসা। সেভারনদের অনুমতি ছাড়া পুলিশের কাছে যেতে পারছে না ওরা।

হাত ধোয়ার ছুতো করে বেরিয়ে গেল কিশোর। বাথরূম থেকে ফেরার পথে হলে ঢুকে টেবিলটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চিঠিগুলো এখনও আগের জায়গাতেই আছে। সেভারনদের ব্ল্যাকমেল করার মাধ্যম যদি চিঠি হয়ে থাকে, অর্থাৎ চিঠি দিয়ে যদি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকে অগাস্ট শাজিন, তাহলে প্রমাণ জোগাড় করা সহজ হবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, টেলিফোন এবং চিঠি, দু'ভাবেই হুমকি দিয়ে সেভারনদের জ্বালাতন করছে মহিলা।

খুঁজতে শুরু করল কিশোর।

রান্নাঘরে কথা শোনা যাচ্ছে। বেরোনোর আগে রবিনকে চোখ টিপে বেরিয়েছিল কিশোর। ইঙ্গিতটা বোধহয় বুঝতে পেরেছে রবিন, বুড়োবুড়িকে কথা বলে ব্যস্ত রেখেছে। সুযোগটা কাজে লাগাল কিশোর।

প্রয়োজনীয় জিনিসটা খুঁজে পেতে সময় লাগল না। শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির লোগো ছাপ মারা একটা খাম। তুলে নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল

কিশোর। উত্তেজনায় কাঁপছে হাতটা।
দ্রুতহাতে খামটা খুলে চিঠি বের করে তাতে চোখ বোলাল। লিখেছে : এটাই তোমাদের শেষ সুযোগ। আমাদের প্রস্তাবে রাজি না হলে সোজা পুলিশকে গিয়ে বলব শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির অফিস থেকে টাকা চুরি করে সেই টাকা দিয়েই কটেজটা কিনেছে তোমাদের ছেলে জ্যাকি, টাকাগুলো সেজন্যেই পাওয়া যায়নি। কটেজটা তোমরা এমনিতেও রাখতে পারবে না, যেভাবেই হোক দখল করে নেয়া হবে; জেদ করে অহেতুক বিপদ আর ঝামেলা বাড়াবে শুধু শুধু। তারচেয়ে আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাওয়াই তোমাদের জন্যে সবদিক থেকে উত্তম।
তাহলে এই ব্যাপার! ভাল বুদ্ধি বের করেছে শাজিন। নিজের অজান্তেই মৃদু শিস দিয়ে উঠল কিশোর। পুলিশ যদি বিশ্বাস করে বসে চোরাই টাকা দিয়ে কটেজ কেনা হয়েছে, বাজেয়াপ্ত করবে বাড়িটা। তারপর নীলামে বেচে দেবে কোম্পানির টাকা পরিশোধ করার জন্যে। কোম্পানিই তখন কিনে নেবে কটেজ আর আশেপাশের সমস্ত জায়গা।
উত্তেজনায় বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়েছে কিশোরের। চিঠিটা আবার খামে ভরে রেখে দিল আগের জায়গায়।
পেছনে খুট করে শব্দ হতেই চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে তাকাল সে। মিস্টার সেভারন দাঁড়িয়ে আছেন। তাকিয়ে আছেন তার দিকে।
চোখে চোখ পড়তেই রাগত স্বরে বললেন, 'এখানে কি করছ? ব্যক্তিগত চিঠি পড়ছিলে কেন? আমাদের মুখ থেকে শুনে কি বিশ্বাস হচ্ছিল না?'
'সরি...' পেছন থেকে বলে উঠল রবিন। সে-ও এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। 'ওপরতলায় আমি হাত ধুতে যাওয়ার সময় ধাক্কা লেগে উল্টে পড়েছিল টেবিলটা। তুলে সোজা করে রেখেছিলাম বটে, তবে চিঠিপত্রগুলো সব মেঝে থেকে তোলা হয়নি। তাড়াহুড়োয় তখনকার মত বেরিয়ে গিয়েছিলাম। কিশোরকে বলেছি ঠিক করে সাজিয়ে রাখতে।'
আটকে রাখা দমটা সশব্দে ছাড়ল কিশোর। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল রবিনের দিকে। বুদ্ধি করে বাঁচিয়ে দিল।
সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন মিস্টার সেভারন। 'সত্যি বলছ, চিঠিগুলো পড়োনি?'
'অ্যাঁ...' সরাসরি মিথ্যে বলতে বাধছে, একটা জবাব খুঁজে বেড়াচ্ছে কিশোর যেটা বললে প্রশ্নটা এড়ানো যাবে, আবার মিথ্যেও বলা হবে না।
এবার বাঁচাল মুসা। হলঘরের কথা সে শুনেছে কিনা বোঝা গেল না, রবিনের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'কিশোর, ক'টা বাজল খেয়াল আছে? রাত তিনটে। মা কোন কারণে আমার ঘরে আমার খোঁজ করতে গিয়ে যদি না দেখে, সারা বাড়ি মাথায় করবে...'
'অ্যাঁ!' হাতঘড়ি দেখে আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করল কিশোর। সেভারনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চিঠিগুলোর জন্যে আমি দুঃখিত, মিস্টার সেভারন।'
'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' টেবিল থেকে চিঠির বান্ডিল তুলে নিলেন

মিস্টার সেভারন। হলুদ লোগোওয়ালা চিঠিটা বের করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেটার দিকে। বোধহয় বোঝার চেষ্টা করলেন খোলা হয়েছে কিনা। নীরস কণ্ঠে বললেন, 'যতবারই আসা যাওয়া করি এখান দিয়ে, চিঠিগুলো চোখে পড়ে, দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে গেছি...'

গটমট করে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন। কয়লার চুলার ঢাকনা খোলার শব্দ শুনল তিন গোয়েন্দা, তারপর সশব্দে বন্ধ হলো আবার।

'পুড়িয়ে ফেললেন!' চোখের চারপাশ কুঁচকে গেছে রবিনের।

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে কিশোর বলল, 'বোকার মত প্রমাণগুলোকে নষ্ট করলেন। দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই আমাদের। চলো, যাই।'

ওরা বেরোনোর সময় সামনের দরজা লাগিয়ে দিতে এলেন মিসেস সেভারন। কিশোর বলল, 'যোগাযোগ রাখবেন। সাহায্যের প্রয়োজন মনে করলে খবর দেবেন আমাদের।'

*

রাস্তায় বেরিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'চিঠিটাতে কি লেখা ছিল?'

জানাল কিশোর।

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'এত্তবড় শয়তান মহিলা তো আর দেখিনি! আমরা এখন কি করব?'

'ওই মহিলার বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় করব। জ্যাকিকে যে ফাঁসানো হয়েছে, এটা প্রমাণ করতে পারলে ওকে তো বের করা যাবেই, মহিলাকেও জেলের ভাত খাওয়ানো যাবে। তাতে সেভারনদের বাড়িটাও বাঁচবে।'

'কিন্তু কিভাবে সেটা সম্ভব?'

'শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির অফিসে গিয়ে তদন্ত করা ছাড়া তো আর কোন উপায় দেখছি না।'

'গেলেই কি আর তদন্ত করতে দেবে নাকি?'

'না, দেবে না। গোপনে করতে হবে কাজটা।'

'কিন্তু ঢোকার জন্যেও তো একটা ছুতো দরকার,' রবিন বলল। 'এই, এক কাজ করলে কেমন হয়? স্কুলের প্রোজেক্টের কাজ নিয়ে গেছি বলব। বলব, রকি বীচের উন্নয়ন নিয়ে বিল্ডিং কোম্পানিগুলো কি ভাবনা-চিন্তা করছে সেটা জানতে গেছি। সুযোগ দিলে অগাস্ট শাজিনের একটা সাক্ষাৎকারও নেব।'

'বুদ্ধিটা ভালই। কিন্তু...'

'কিন্তু কি?'

'ব্যালাক্লাভা পরে এসেছিল যে লোকটা, সে তখন অফিসে থাকলে আমাদের চিনে ফেলবে।'

'মুসাকে সঙ্গে সঙ্গে চিনবে, এটা ঠিক। আমাদের দুজনকে না-ও চিনতে পারে। ওকে নেব না, তাইলেই হবে। কিংবা আরও এক কাজ করা যায়, আমি একাই যাব। রাস্তায় গাড়িটা ছুটে আসার সময় তুমি সামনে ছিলে, তোমাকে দেখার সম্ভাবনা বেশি; আমাকে কম, তাই আমি একা...'

'তারপরেও ঝুঁকি থেকে যায়...'

'গোয়েন্দাগিরিতে ঝুঁকি থাকবেই, তাই বলে কি পিছিয়ে যেতে হবে?' বহুবার বলা কিশোরের কথাটাই কিশোরকে ফিরিয়ে দিল রবিন।

হেসে ফেলল কিশোর, 'নিলে একচোট। ঠিকই বলেছ, ঝুঁকির ভয়ে পিছিয়ে গেলে গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দেয়া উচিত।'

'তাহলে কখন যাচ্ছি?'

'কাল সকালেই যাও।'

দশ

পরদিন সকালে ওল্ড প্যাসিফিক স্ট্রীটের এক কানাগলিতে ঢুকল রবিন। ঠিকানা দেখে বাড়িটা খুঁজে বের করতে সময় লাগল না। বাড়ির পেছনে নদী। কিংবা বলা যায় নদীর পাড়ে বাড়িটা, মুখটা অবশ্য রাস্তার দিকে ফেরানো। সামনের দরজায় একটা নোটিশ টানানো, তাতে বলা হয়েছে লিফট নষ্ট। পড়তে গিয়ে একটা জিনিস চোখে পড়ল রবিনের। ইংরেজিতে টাইপ করা লেখাগুলোর 'ও' অক্ষরটা সবখানেই ক্যাপিটল্ লেটারে। সেভারনদের বাড়িতে পাওয়া চিঠির লেখার মত। কাজে লাগতে পারে ভেবে নোটিশটা ছিঁড়ে নিয়ে পকেটে রেখে দিল সে।

সাবধানে ঠেলা দিল দরজায়। ক্যাঁচকোঁচ করে খুলে গেল পাল্লা। ভেতরে ঢুকল সে। ম্লান আলোকিত একটা হলওয়ে।

সামনে ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ির রেলিঙের বার্নিশ নষ্ট হয়ে গেছে, চটা উঠে গেছে কাঠের। লিফটের দরজায় আরেকটা নোটিশ : লিফট অচল।

নাক কুঁচকাল রবিন। বহুকাল ধরে পরিষ্কার না করলে, অযত্ন অবহেলায় ফেলে রাখলে এ রকম গন্ধ হয়।

সিঁড়ির পাশে দেয়ালে প্লাস্টিকের ফলকে লেখা রয়েছে, শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির অফিসটা তিনতলায়।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল সে। পেছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ফিরে তাকিয়ে কাউকে দেখল না। একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো। তারপর চুপচাপ।

নিচতলা কিংবা দোতলার অন্য কোন অফিসে ঢুকেছে লোকটা। চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ফেলে আবার উঠতে শুরু করল সে।

তিনতলায় উঠে সামনে একটা দরজা দেখতে পেল। দ্বিধা করে ঠেলা দিল পাল্লায়। খুলে যেতে ভেতরে পা রাখল।

অফিস নয়, ঢুকেছে একটা ছোট রান্নাঘরে। আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। এখানেও অযত্নের ছাপ। নোংরা। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে সিংক।

ছোট একটা টেবিলে রাখা একটা কালি লাগা কেটলি, পাশে চা-পাতার ব্যাগ। গোটা তিনেক কাপ-পিরিচ আছে।

মেঝেতে চোখ পড়ল ওর। আটকে গেল দৃষ্টি। ধুলোয় ঢাকা ময়লা মেঝেতে জুতোর ছাপগুলো চেনা চেনা লাগল। কোথায় দেখেছে? মনে পড়ল। সেভারনদের বাগানে। জুতোর সোল অবিকল এক রকম। গোড়ালিতে গোল গোল চক্র। রাতের বেলা চুরি করে যে লোক বাগানে ঢুকেছিল সে এসেছিল এ ঘরে! বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। তবু চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে অকাট্য প্রমাণ। একই ডিজাইনের জুতো অনেকেই পরতে পারে ভেবে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল সম্ভাবনাটা, কিন্তু খুঁতখুঁতি গেল না মন থেকে। এককোণে একটা কাঠের আলমারি দেখে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল। ভেতরে হুক থেকে ঝুলছে একটা কালো রঙের জ্যাকেট। ঘরের একমাত্র জানালাটায় উঁকি দিয়ে বাইরে একটা ফায়ার এসকেপ দেখতে পেল।

এ ঘরে আর কিছু দেখার নেই। তবে যা দেখেছে, অনেক। বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। পাশে দুটো দরজার পরে আরেকটা দরজা দেখল, পাল্লার গায়ে লেখা রয়েছে 'অফিস'।

দম নিয়ে আস্তে করে টোকা দিল দরজায়। সাড়া এল ভেতর থেকে, 'আসুন।'

পাল্লাটা ফাঁক করে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে বলল সে, 'হাই।'

টেলিফোনের রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বসে আছে এক তরুণী, রিসিপশনিস্ট। রবিনের দিকে তাকিয়ে নীরবে হাসল, চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইশারা করল।

হাতের ফাইলটা কোলের ওপর রেখে নিরীহ ভঙ্গিতে বসে পড়ল রবিন। চারপাশে তাকাতে গিয়ে চোখ পড়ল পাশের একটা দরজার ওপর, তাতে নেমপ্লেটে লেখা 'অগাস্ট শাজিন'-এর নাম। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে পাল্লাটা। টেবিলে রাখা একটা টাইপরাইটারের খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' ফোনে কথা বলছে তরুণী। 'কাল রেডি হবে? হবে তো?...ঠিক আছে, আমি নিজেই আসব নিতে...না ভাই, তাড়াতাড়ি দরকার। বড় অসুবিধার মধ্যে আছি। শর্টহ্যান্ডে ডিকটেশন নিতে নিতে আর ভাঙা টাইপরাইটার দিয়ে টাইপ করতে করতে জান শেষ হয়ে গেল।'

ডেস্কে রাখা কতগুলো কাগজ দেখতে পেল রবিন। শর্টহ্যান্ডে কি সব লেখা।

'ধন্যবাদ,' বলে ফোনটা নামিয়ে রাখল তরুণী। রবিনের দিকে তাকাল, '...না?'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল রবিন। মনে মনে গুছিয়ে নিল কথাগুলো। বলল, 'আমার নাম রবিন মিলফোর্ড। স্কুলের একটা প্রোজেক্টের জন্যে তথ্য জোগাড় করতে এসেছি আমি। স্থানীয় কন্ট্রাক্টর আর বিল্ডাররা আগামীতে শহরটাকে উন্নত করার জন্যে কি কি প্ল্যান করেছে সে-সম্পর্কে জানতে চাই। আগামী দশ বছরে কি কি করছে তারা।'

রবিনের কথা শুনে খুশি মনে হলো রিসিপশনিস্টকে। 'অনেক কাজই করবে, অন্তত আমাদের কোম্পানি। শহরের পশ্চিম ধারে বড় বড় কতগুলো শপিং সেন্টার আর হাউজিং এস্টেট বানানোর পরিকল্পনা আছে আমাদের। কিন্তু সমস্যা হয়েছে জায়গা নিয়ে। কিছু কিছু বাসিন্দা তাদের জায়গা বিক্রি করতে নারাজ। কোনমতেই তাদের বোঝানো যাচ্ছে না।'

'তাই নাকি?' ভুরু উঁচু করল রবিন। 'তাইলে তো আর হচ্ছে না।'

দ্বিধা করল রিসিপশনিস্ট। 'অবশ্য, মিসেস শাজিন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। একবার যেটা ধরেন সেটা শেষ না করে তিনি ছাড়েন না। ম্যানিলা রোডের ধারে যে বন আছে, ম্যানিলা উড, সেটা পরিষ্কার করে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক বানানোরও ইচ্ছে আছে তাঁর। সবচেয়ে ঝামেলাটা হচ্ছে ওখানকার জমি নিয়েই।'

কান খাড়া করে ফেলল রবিন। 'কি ধরনের ঝামেলা?'

'এক বুড়োর অনেকখানি জায়গা আছে ওখানে। সে ওটা ছাড়তে চাইছে না। এদিকে ভূমি অফিস থেকে নোটিশ দিয়ে দিয়েছে আগামী তিন দিনের মধ্যে যদি মালিকানার দলিল দাখিল করতে না পারেন মিসেস শাজিন, ওই জায়গার মালিক আর হতে পারবেন না। অনুমতিপত্র বাতিল করতে হবে। আবার নতুন করে দরখাস্ত করতে হবে তাঁকে।'

'হুঁ, নিজের জায়গা না হলে ঝামেলাই। অন্যের জায়গার ওপর কিছু করার চিন্তা করে আগে থেকেই প্ল্যান করে বসে থাকার কোন মানে হয় না।'

'তা ঠিক,' নড়েচড়ে উঠল রিসিপশনিস্ট। 'তোমার বোধহয় আরও কিছু জানা বাকি আছে? এক কাজ করো, পেছনের অফিসটায় চলে যাও। অনেক পরিকল্পনার নীলনকশা আর তথ্য লেখা কাগজ দেয়ালে সাঁটানো আছে, ওগুলো দেখে জেনে নাওগে। আমার জরুরী কাজ আছে।' ডেস্কে রাখা কাগজগুলো দেখিয়ে বলল, 'এ চিঠিগুলো টাইপ করতে হবে। মিসেস শাজিন এসে ঠিকমত না পেলে রেগে যাবেন।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে,' উত্তেজনা চেপে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে রবিন। এ ভাবে তাকে ঢালাও সুযোগ দিয়ে দেবে রিসিপশনিস্ট, ভাবতে পারেনি।

'ইচ্ছে করলে ফটোকপিও করে নিতে পারো,' তরুণী বলল। 'পুরানো প্ল্যানের কপিও পাবে তাকে রাখা ফাইলে। সেগুলোও দেখতে পারো। ফাইলিং কেবিনেটের পাশেই পাবে ফটোকপির মেশিন।'

রিসিপশনিস্টকে আরও একবার ধন্যবাদ দিল রবিন।

পেছনের ঘরে এসে ঢুকল। কাগজপত্র দেখে দেখে দ্রুত কিছু নোট নিল। যদি রিসিপশনিস্ট দেখতে চায় যাতে দেখাতে পারে। কোন নোটই না নিলে সন্দেহ করে বসতে পারে। এখান থেকেই শুনতে পেল টেলিফোন বাজছে। রিসিপশনিস্টের কথা কানে এল।

'ডেড ফাইলস' লেখা কেবিনেটটা টান দিয়ে খুলল রবিন। কাগজপত্র ঘাঁটতে শুরু করল। গায়ে 'জারভিস' লিখে রাখা একটা ফাইল দৃষ্টি আকর্ষণ

করল। মনে পড়ল, সেভারনদের আগে কটেজটার মালিক ছিল জারভিস নামে এক লোক।

ফাইলটা বের করে এনে খুলল সে। সেভারনদের জায়গাটাতে কি করা হবে, তার দুটো প্ল্যান পাওয়া গেল। মেশিনে ঢুকিয়ে দুটো প্ল্যানেরই একটা করে কপি করে নিল সে। আরও কিছু কাগজপত্রের কপি করে নিল, যাতে রিসিপশনিস্ট দেখলেও বুঝতে না পারে ঠিক কোন কাগজগুলোতে রবিনের আগ্রহ। ফাইলগুলো আবার ঢুকিয়ে রাখল আগের জায়গায়। রাখতে গিয়েই নজরে পড়ল আরেকটা সবুজ ফাইল। কৌতূহলী হয়ে বের করে আনতে যাবে এই সময় অফিসরুমে কথা শোনা গেল।

'চলে এসেছেন,' রিসিপশনিস্ট বলল। 'এত সকালে আসবেন তা তো বলেননি।'

'হ্যাঁ, ডরোথি, আসতে হলো,' শোনা গেল অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠ। 'জরুরী আরও কয়েকটা চিঠি লিখতে হবে। ডিকটেশন মেশিন আর কম্পিউটারটা এসেছে?'

'না, রেডি হয়নি এখনও। কাল গিয়ে আনতে বলেছে।'

'তাই নাকি। তাহলে তো মুশকিল হয়ে গেল...'

নিশ্চয় অগাস্ট শাজিন। দেখার জন্যে দরজা ফাঁক করে উঁকি দিল রবিন। কালো জিনস আর কালো শার্ট পরা লম্বা এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে শাজিনের অফিসের সামনে। একটা হাত দরজার নবে। কুচকুচে কালো চুল। চোখও তেমনি কালো। গায়ের রঙ মোমের মত সাদা। ঠোঁটে টুকটুকে লাল লিপস্টিক। হরর ছবির ভ্যাম্পায়ারের কথা মনে পড়িয়ে দেয়–ড্রাকুলার স্ত্রী।

মাথার চুল সরানোর জন্যে হাত তুলল শাজিন। হাতের তালুতে প্লাস্টার দেখতে পেল রবিন। যখম-টখম হলে এ রকম প্লাস্টার লাগায়।

'ডরোথি, এক কাপ কফি দেবে? আর আগের চিঠিগুলো নিয়ে এসো তো একটু আমার অফিসে। কিছু অদল-বদল দরকার।'

অফিসে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল শাজিন। আর দেরি করল না রবিন। বেরিয়ে এল পেছনের ঘর থেকে।

'পেয়েছ?' হেসে জিজ্ঞেস করল ডরোথি।

'হ্যাঁ,' নিচুস্বরে জবাব দিল রবিন। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কয়েকটা কাগজের কপিও করে নিয়েছি। দেখতে চান?'

ডরোথি দেখতে না চাইলেই খুশি হয় রবিন। ভয় পাচ্ছে, কোন সময় বেরিয়ে চলে আসে শাজিন, দেখে ফেলে তাকে। আপাতত ওর সামনে পড়তে চায় না। মহিলাকে দেখেই ওর সামনে যাওয়ার চিন্তাটা বাদ দিয়ে দিয়েছে সে। থাক তো সাক্ষাৎকার নেয়া।

হাত নাড়ল ডরোথি, 'লাগবে না। নিয়ে যাও।'

আরও একবার ধন্যবাদ আর সেই সঙ্গে 'গুডবাই' জানিয়ে তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে এল রবিন। দ্রুতপায়ে নিচে নামতে শুরু করল।

বাইরে বেরিয়ে ঘড়ি দেখল। অনেকক্ষণ লাগিয়ে দিয়েছে। চিন্তায় পড়ে

গেছে নিশ্চয় মুসা আর কিশোর।

*

'ম্যানিলা রোডে উন্নয়নের প্ল্যানটা পাওনি?' জানতে চাইল কিশোর। তিন গোয়েন্দার ওঅর্কশপে বসেছে ওরা।

'না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের অফিসেই রয়ে গেছে হয়তো এখনও। রিসিপশনিস্ট বলল, তিনদিনের মধ্যে জমির মালিকানার দলিল জমা দিতে না পারলে ওদের অনুমতিপত্র বাতিল হয়ে যাবে।'

'এ জন্যেই মরিয়া হয়ে উঠেছে ড্রাকুলাটা,' মুসা বলল। রবিনের মুখে শাজিনের বর্ণনা শুনে প্রথমে তার সন্দেহ হয়েছিল, মহিলাটা আসল ড্রাকুলাই নয় তো? তবে পরে মনে পড়েছে, আসল ভ্যাম্পায়াররা দিনের আলোয় বেরোতে পারে না। শাজিন বেরিয়েছে, তারমানে সে আসল ভ্যাম্পায়ার নয়, মানুষরূপী ভ্যাম্পায়ার–নইলে সেভারনদের মত এত নিরীহ বুড়ো মানুষকে অত্যাচার করতে পারে! তবে তার মতে আসল ভ্যাম্পায়ারের চেয়ে মানুষ-ভ্যাম্পায়াররা অনেক বেশি খারাপ।

ছিঁড়ে আনা নোটিশটা দেখল কিশোর। সেভারনদের হুমকি দিয়ে লেখা নোটটা বের করল। দুটোতেই 'ও' অক্ষরটা অবিকল এক রকম।

'শাজিনের টেবিলে একটা পুরানো টাইপরাইটার দেখেছি,' রবিন জানাল, 'নিশ্চয় ওটা দিয়ে টাইপ করেছে। ওদের কম্পিউটার বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে বা কোন কিছু, পচা টাইপরাইটার দিয়ে তাই চিঠি টাইপ করেছে।'

'হুঁ!' মাথা দোলাল কিশোর। 'তাহলে রান্নাঘরের মেঝেতে জুতোর ছাপও দেখেছ?'

'হ্যাঁ। যে লোক রাতে এসে সেভারনদের বাগান তছনছ করেছে, সেই লোক ঢুকেছিল শাজিনের অফিসের রান্নাঘরে, জ্যাকেট লুকিয়ে রেখেছে আলমারিতে।'

এক মুহূর্ত চুপচাপ নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'সেভারনদের কটেজের নকশাটা কপি করে এনেছ কেন?'

'কৌতূহল হলো, তাই। ভাবলাম, নকশা দেখে সেলার আর ভুতুড়ে ঘরটায় খোঁজাখুঁজি করতে সুবিধে হবে।'

'হুঁ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। মুহূর্তে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে, হারিয়ে গেছে গভীর চিন্তায়।

এগারো

পরদিন সকালে ফায়ারের পিঠে চেপে সেভারনদের বাড়ি রওনা হলো মুসা।

সুন্দর সকাল। মাঠ আর ঝোপঝাড় থেকে ওঠা ভোরের কুয়াশার সবে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে সোনালি রোদের বর্শা। দৃপ্তপায়ে হেঁটে চলেছে

পেশীবহুল, খয়েরী রঙের ঘোড়াটা।

সামনে ঝুঁকে চকচকে গলাটায় চাপড়ে দিয়ে বলল মুসা, 'কতদিন ঠিকমত দৌড়াই না, নারে? জায়গাই নেই সেরকম। আজ পেয়েছি। মনের সুখে দৌড়ে নেব।'

যেন মুসার কথা বুঝে সায় দিতেই মাথা ঝাড়ল ফায়ার।

কটেজের পাশ দিয়ে ওকে নিয়ে বনের দিকে এগোল মুসা। নেচে নেচে এগোচ্ছে ফায়ার। নাক উঁচু করে দুই ফুটো ছড়িয়ে তাজা বাতাস টানল বুক ভরে, অস্থির ভঙ্গিতে মাথা ঝাড়ল আরেকবার।

'অত অস্থির হচ্ছিস কেন?' আদর করে ওর গলায় হাত বুলিয়ে দিল মুসা, 'জায়গামত আসিনি এখনও।' শক্ত করে জিনের ওপর চেপে বসল সে। লাগামটায় আঙুলের চাপ শক্ত করে পা টান টান করে দিল রেকাবে। দৌড়ানোর জন্যে তৈরি হচ্ছে।

গেট পেরিয়ে এসেই হাতে পেঁচিয়ে খাটো করে ফেলল লাগামটা। জোরে চলার ইঙ্গিত করল ফায়ারকে। মুসাদের বাড়ি থেকে হেঁটে এসে ইতিমধ্যেই গা গরম হয়ে গেছে ঘোড়াটার। মুহূর্তে দৌড়ানো শুরু করল।

দক্ষ ঘোড়সওয়ারের মত ওকে নিয়ন্ত্রণে রাখল মুসা। বেশি জোরেও ছুটল না, বেশি আস্তেও না। হেসে বলল, 'ওভাবে পেশী ফোলাচ্ছিস কেন? উড়তে চাস? থাক, পঙ্খীরাজ হওয়ার দরকার নেই। যেভাবে বলছি সেভাবেই চল।'

কিন্তু জোরে ছোটার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল ঘোড়াটা। শেষে রাশ খানিকটা ঢিল করে ওকে ছুটতে দিল মুসা। মুহূর্তে যেন উড়ে এসে বনের রাস্তায় ঢুকল ফায়ার। সামনে ঝুঁকে বসে রইল মুসা। রেকাবে আরও টান টান হয়ে গেছে পা। সে-ও ছোটার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু অচেনা পথে জোরে ছুটতে অস্বস্তি হতে লাগল তার। দৌড়ানো থামাল ফায়ারের। দুলকি চালে চলল কয়েক মিনিট। শেষে আবার হাঁটাতে শুরু করল আগের মত। হাত লম্বা করে আস্তে চাপড়ে দিল ঘোড়াটার ঘামে ভেজা ঘাড়।

'দারুণ ছুটতে পারিস তুই, ফায়ার!' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নিজের কপাল থেকেও ঘাম মুছল মুসা। 'সত্যি, প্রশংসা করার মত!'

রেকাবে পায়ের ভর রেখে উঠে দাঁড়াল সে। পা দুটো ছড়ানোর জন্যে। চোখে পড়ল সাদা ভ্যানটা। আগের দিন যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

এখানে কি করছে ও, এত সকালে! প্রথমেই এই ভাবনাটা এল মুসার মাথায়। নিশ্চয় উঁকিঝুঁকি মারতে এসেছে সেভারনদের বাড়িতে। আরও অঘটন ঘটানোর তালে আছে।

ঘোড়া থেকে নামল সে। মাথার টুপিটা খুলে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখল। ফায়ারকে বাঁধল গাছের সঙ্গে। গলাটা চাপড়ে দিয়ে বলল, 'থাক এখানে, ফায়ার, ঘাস খা। আমি গিয়ে ভ্যানটা দেখে আসি। বেশিক্ষণ লাগবে না।'

ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল সে। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোল গাড়িটার

দিকে। পেছনে আঁকা সেই লোগো, এখন আর অপরিচিত নয়। জানালা দিয়ে ভেতরে দেখল। পেছন দিকে এসে হাতল ধরে মোচড় দিতেই খুলে গেল দরজাটা।

'খাইছে!' আপনমনেই বলে উঠল সে, 'ভাগ্যটা ভালই আমার!'

আশেপাশে কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে উঠে বসল ভ্যানের মধ্যে। লাগিয়ে দিল দরজাটা।

মেঝেতে পড়ে আছে একটা শটগান। পাশে রাখা এক বাক্স কার্তুজ। জানে কি দেখবে, তবু সন্দেহ নিরসনের জন্যে ডালাটা খুলে দেখল। সেদিন এই কার্তুজ দিয়েই গুলি করা হয়েছিল। সন্দেহ নেই। দুটো কার্তুজ তুলে নিয়ে পকেটে রাখল। চোখ বোলাল আর কি আছে দেখার জন্যে। এক কোণে একটা প্লাস্টিকের কনটেইনার, গায়ে মড়ার খুলি আর ক্রসবোন আঁকা স্টিকার লাগানো। মুখটা খুলে গন্ধ শুঁকল। পোকা মারার বিষ। একই রকম গন্ধ পাওয়া গিয়েছিল সেভারনদের বাগানের পুকুরে।

হাসি ফুটল মুসার ঠোঁটে। ঘুরতে এসে শাজিনদের বিরুদ্ধে এ রকম জোরাল প্রমাণ পেয়ে যাবে আশা করেনি। ভ্যান-চালকের চেহারাটা এখন দেখা দরকার, চিনে নেয়া দরকার, তারপর নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যেতে পারে।

গাড়ি থেকে নামতে যাবে, এই সময় কানে এল পায়ের শব্দ। ঝট করে মাথা নামিয়ে ফেলল সে। ড্রাইভারের পাশের দরজা খুলে গেল। আতঙ্কিত হয়ে শুনতে পেল, ইগনিশনে চাবি ঢোকানোর শব্দ এবং তারপর ইঞ্জিনের গর্জে ওঠা। মুসা কোন কিছু করার আগেই চলতে শুরু করল গাড়ি। গতি বেড়ে গেল মুহূর্তে। অসহায় হয়ে গুটিসুটি হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

*

একভাবে পড়ে আছে মুসা। মাথা তুললেই আয়নায় তাকে দেখে ফেলবে ড্রাইভার। ফলে লোকটার চেহারা দেখার জন্যেও মাথা তুলতে পারছে না।

মিনিট দশেক এক গতিতে গাড়ি চালিয়ে এসে ব্রেক কষে গাড়ি থামাল ড্রাইভার। দরজা খুলে নামল। দড়াম করে লাগিয়ে দিল। সরে যেতে লাগল পায়ের শব্দ।

সব যখন চুপচাপ হয়ে গেল আবার, আস্তে মাথা তুলল মুসা। পেছনের জানালা দিয়ে তাকাল। রাস্তার ধারে বড় একটা বাড়ির সামনে থেমেছে গাড়িটা। রাস্তাটার দুই ধারেই গাছের সারি।

কোথায় এল সে? আশেপাশে তাকিয়ে চিনতে পারল না জায়গাটা। ড্রাইভারকে দেখা গেল না, তবে বাড়ির দোতলার জানালায় ছায়া নড়তে দেখল। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কেউ।

আলো লাগছে চোখে। কপালের সামনে হাত এনে রোদ বাঁচিয়ে ভালমত তাকাল। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে হাত-আয়নায় চেহারা দেখে ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাচ্ছে এক মহিলা। লম্বা কালো চুল, মোমের মত সাদা চামড়া। শাজিনকে দেখেনি সে, রবিনের কাছে চেহারার বর্ণনা শুনেছে। মহিলাকে দেখেই এখন

বুঝল, ও শাজিন ছাড়া আর কেউ নয়। ভ্যাম্পায়ারের কথা ভেবে কাঁটা দিল গায়ে। 'দিনের বেলা বেরোয় না ওই রক্তচোষা ভূত' মনকে বুঝিয়ে জোর করে ভয় তাড়াল।

জানালার কাছ থেকে মহিলা সরে যেতেই দরজাটা খুলল সে। লাফ দিয়ে নামল। আবার লাগিয়ে দিল দরজা। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল কেউ লক্ষ করছে কিনা। সরে এসে ভ্যানটাকে সামনে রেখে আড়াল করে বসে তাকাল আবার বাড়িটার দিকে।

চিৎকার শোনা গেল এই সময়। দেখল বাগানের রাস্তা ধরে তার দিকেই দৌড়ে আসছে মহিলা। বোঝা গেল, কোনভাবে দেখে ফেলেছে।

আর বসে থাকতে সাহস করল না মুসা। উঠেই দিল দৌড়।

'এই এই, শোনো!' চিৎকার করে ডাকল মহিলা।

ফিরেও তাকাল না মুসা।

*

রাস্তার শেষ মাথায় দেখতে পেল একটা পাবলিক পার্কে ঢোকার লোহার গেট। ওর মধ্যে ঢুকে পড়তে পারলে গাছের আড়ালে বা অন্য কোথাও লুকাতে পারবে। ফিরে তাকাল কাঁধের ওপর দিয়ে। পেছন পেছন দৌড়ে আসছে মহিলা। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ভাবল মুসা, ফায়ার কাছাকাছি থাকলে লাফ দিয়ে গিয়ে এখন ওর পিঠে চড়ে বসতে পারত।

পার্কের মধ্যে এক জায়গায় ছুটাছুটি করে খেলছে বাচ্চারা। তাদের কাছে দৌড়ে এসে একটা স্লিপারের আড়ালে বসে পড়ল মুসা। আশা করল তাকে দেখতে পাবে না মহিলা।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে লাগল কয়েকটা ছেলেমেয়ে। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ থাকতে ইশারা করল। আস্তে করে মাথা বের করে গেটের দিকে তাকিয়ে দেখল দ্বিধান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহিলা। কয়েকটা অস্বস্তিকর মুহূর্ত। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে যেদিক থেকে এসেছিল আবার সেদিকে হেঁটে চলল মহিলা।

হাঁপ ছাড়ল মুসা।

আরও কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে উঠে দাঁড়াল। রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। তাকে ঘিরে ভিড় জমাতে শুরু করেছে বাচ্চারা। একটু আগে যেটা স্বস্তির কারণ হত, সেটা এখন বিরাট অস্বস্তি। তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করল উল্টোদিকের গেটের দিকে। প্রথমে জানতে হবে কোন জায়গায় তাকে নিয়ে এসেছে শাজিন, তারপর যেতে হবে ফায়ারকে আনতে।

পার্ক থেকে বেরোতে গেটের ওপরের লেখা দেখে জানতে পারল, জায়গাটার নাম অগাস্টভিল।

ম্যানিলা রোডে পৌঁছে বনের ভেতর থেকে ফায়ারকে নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় আরেক ঘটনা ঘটল। ঝোপের ভেতর থেকে হঠাৎ করে সামনে এসে দাঁড়াল সেই লোকটা, দূরবীন হাতে যাকে সেদিন সেভারনদের বাড়ির

ওপর নজর রাখতে দেখা গিয়েছিল। এমন করে বেরোল, চমকে দিল ঘোড়াটাকে, ঘাবড়ে গিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে শুরু করল ওটা। কয়েকবার পিঠ থেকে পড়তে পড়তে বাঁচল মুসা।

বারো

সকালবেলা এত কিছু করে ফিরে আসার পর সেদিন আর সেভারনদের বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করল না তার। রবিনও কাজে ব্যস্ত, ফোনে কিশোরকে জানিয়ে দিল, সে-ও যেতে পারবে না।

বিকেল বেলা ইয়ার্ডে এসে সকালের সমস্ত ঘটনার কথা কিশোরকে খুলে বলল মুসা।

শনিবার সকালে নাস্তা সেরেই সেভারনদের বাড়িতে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। আগের দিন বিকেলে ফোনে যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করেছে কিশোর। লাইন না পেয়ে শেষে অপারেটরকে জিজ্ঞেস করে জেনেছে, তাঁদের ফোন নষ্ট।

'আজ নিশ্চয় মেরামত করে ফেলবে,' সাইকেল চালাতে চালাতে দুই সহকারীকে বলল কিশোর।

কটেজে পৌঁছে দরজায় বার বার টোকা দিয়েও কোন সাড়া পেল না।

'মিসেস সেভারন!' চিৎকার করে ডাকল কিশোর। সিঁড়ির গোড়ায় পড়ে থাকতে দেখল দুধের দুটো খালি বোতল। একটাতে একটা ভাঁজ করা কাগজ রবারের ব্যান্ড দিয়ে আটকানো। জানালার দিকে তাকিয়ে আবার চিৎকার করে বলল সে, 'মিসেস সেভারন, আমি কিশোর!'

কান পেতে অপেক্ষা করতে লাগল।

'কই, কেউ তো জবাব দিচ্ছে না,' মুসাও মোরগের মত ঘাড় বাঁকা করে কান পেতে রেখেছে।

'ঘুম থেকে ওঠেননি হয়তো এখনও,' হাতঘড়ি দেখল রবিন। 'এখনও অনেক সকাল। বেশি তাড়াতাড়ি চলে এসেছি।'

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল তিনজনে। কি করবে বুঝতে পারছে না। গাড়ি নিয়ে হাজির হলো দুধওয়ালা। গাড়ি থেকে নেমে দুধের বোতলের খাঁচা হাতে শিস দিতে দিতে এগোল কটেজের দিকে।

'হাই,' তার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর।

'হাই,' কাছে এসে দাঁড়াল দুধওয়ালা। কৌতূহলী চোখে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাতে তাকাতে বলল, 'দেখা করতে এলে নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'দরজায় ধাক্কা দিচ্ছি, খুলছেন না।'

'এতক্ষণে তো রোজ উঠে পড়েন ঘুম থেকে। আরও জোরে ধাক্কা দাও।' খাঁচাটা নামিয়ে রেখে খালি বোতলের গায়ে আটকানো কাগজটা খুলে নিয়ে

পড়ল দুধওয়ালা। 'এক লিটার বেশি দিতে বলেছেন।' আনমনে বিড়বিড় করল, 'মেহমান এসেছে নাকি! কখনোই তো আসে না।' খাঁচা থেকে তিনটা বোতল বের করে সিঁড়িতে রাখল সে। খালি বোতল দুটো তুলে খাঁচার খোপে রাখল। কি মনে করে লেটার-বক্সটার দিকে তাকাল। 'খবরের কাগজটা নেই। তারমানে উঠে পড়েছেন তাঁরা।' গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের ডাক শুনতে পাননি। আরও জোরে ধাক্কা দাও।' খাঁচাটা তুলে নিয়ে আবার শিস দিতে দিতে চলে গেল সে।

'দাঁড়াও,' মুসা বলল, 'পেছনে গিয়ে দেখে আসি বাগানে বেরোলেন কিনা।'

বাড়ির পাশ ঘুরে এসে এগোতে এগোতে থমকে দাঁড়াল মুসা। বাড়ির ভেতর থেকে কথা কানে এসেছে। এত সকালে টিভি অন করে দিয়ে বসে আছেন নাকি? সেজন্যে ওদের ডাক শুনতে পাননি?

সামার-হাউসের দরজা খোলা। ওখানে নেই তো মিস্টার সেভারন? উঁকি দিয়ে দেখতে গেল।

কিন্তু সামার-হাউসটা খালি। জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরতে গিয়েও ফিরে তাকাল আবার। কোথায় যেন অস্বাভাবিক কিছু রয়েছে। কোনটা অস্বাভাবিক লেগেছে, ধরতে সময় লাগল না। কার্পেটটা বিছানো নেই মেঝেতে, আগুন নেভানোর জন্যে রাতে ওরা বের করে নিয়ে যাওয়ার পর আর বিছানো হয়নি। বাইরেই ফেলে রেখেছে। কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া লাগছে মেঝেটা।

কি ভেবে দরজাটা ঠেলে আরও ফাঁক করল সে। পুরানো কাঠের বাক্স আর জঞ্জালের গন্ধ। আপেল রাখার পুরানো কয়েকটা কাঠের বাক্স ফেলে রাখা হয়েছে দেয়াল ঘেঁষে, আর গোটা দুই ভাঙা ডেকচেয়ার। ভুরু কুঁচকে জিনিসগুলোর দিকে তাকাতে লাগল সে।

ট্র্যাপ-ডোরটা চোখে পড়তে দম বন্ধ করে ফেলল। তাকিয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে। আগের বার যখন এসেছিল, কাঠের মেঝে ঢাকা ছিল কার্পেটটা দিয়ে। সেজন্যে দেখা যায়নি ওটা।

আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে লাফ দিয়ে নামল বাগানে। উত্তেজনায় কাঁপছে। খবরটা বন্ধুদের জানানোর জন্যে ছুটল।

*

সামার-হাউসে ঢুকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ট্র্যাপ-ডোরটার দিকে তাকিয়ে রইল তিনজনে।

'কোথায় নেমেছে?' বলে হাঁটু মুড়ে ওটার সামনে বসে পড়ল রবিন। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে ঝুঁকে তাকাল নিচের দিকে। মেঝে আর ট্র্যাপ-ডোরের মাঝের ফাঁকে আঙুল ঢোকানোর চেষ্টা করল। না পেরে বলল, 'কিছু একটা দরকার। চাড় মেরে তুলতে হবে।'

'ও, ভুলে গিয়েছিলাম,' মুসা বলল, 'কটেজের মধ্যে কথার আওয়াজও শুনেছি। হয় টিভি চালানো হয়েছে, নয়তো কথা বলেছেন সেভারনরাই। বেশি

ভেতরের দিকে রয়েছেন, নিজেদের মধ্যে আলাপে ব্যস্ত, সেজন্যেই আমাদের ডাক শুনতে পাননি।'

'কিংবা হয়তো ইচ্ছে করেই খুলছেন না কোন কারণে।'

ঘরের চারদিকে তাকাচ্ছে কিশোর। একটা বাক্সের নিচে ডাল ছাঁটার পুরানো মরচে পড়া বড় একটা কাঁচি দেখে বের করে নিল সেটা। রবিনের পাশে গিয়ে বসল চাড় মেরে ট্র্যাপ-ডোরটা তুলতে ওকে সাহায্য করার জন্যে।

নড়ে উঠল ডোরটা। চাপ বহাল রেখে বলল কিশোর, 'উঠে যাবে। চাপ ছেড়ো না। আরও জোরে।'

ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল কব্জা। বিচিত্র শব্দে গোঙাল পাল্লাটা হঠাৎ ওপরে উঠে গেল। চিত হয়ে পড়ে গেল কিশোর।

হেসে উঠল মুসা।

কিশোরও হাসল। উঠে বসে কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়তে লাগল।

রবিন কাশছে। গর্তের চারপাশে জমে থাকা ধুলো উড়ছে। নাকে ঢুকে গেছে তার।

দরজার বাইরে তাকিয়ে দেখল কিশোর, কেউ আসছে কিনা। প্রচুর হই-চই হচ্ছে। হট্টগোল কানে গেলে দেখতে আসতে পারে।

গর্তের ভেতরে উঁকি দিল মুসা। বদ্ধ বাতাসের ভাপসা গন্ধ লাগল নাকে।

'কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না,' বলল সে। 'টর্চ আছে?'

'দিনের বেলা, তাই টর্চ আনার কথা ভাবিইনি,' জবাব দিল কিশোর।

'ছাউনিটাতে আছে কিনা দেখে আসি,' বলে উঠে চলে গেল রবিন ফিরে এসে জানাল, 'টর্চ নেই, তবে ম্যাচ পেয়েছি। এই যে।'

বাক্সটা হাতে নিয়ে ঝাঁকি দিল কিশোর। ভরা নয়, অল্প কয়েকটা কাঠি। খস করে একটা কাঠি জেলে জ্বলন্ত কাঠি সহ হাতটা নামিয়ে দিল নিচে।

ইঁটের তৈরি একটা সিঁড়ি নেমে গেছে।

কিশোরকে অবাক করে দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঝাপটা মেরে নিভিয়ে দিল আগুনটা। দুই সহকারীর দিকে ফিরল সে। 'সিঁড়ি আছে যখন, নামা যায়, কি বলো?'

ভূতের ভয় থাকা সত্ত্বেও আমতা আমতা করে রাজি হয়ে গেল মুসা। রবিন তো আগেই রাজি।

সাবধানে খাড়া সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা। কাঠি মাত্র কয়েকটা, নিতান্ত প্রয়োজনের সময় ছাড়া জ্বালবে না ভেবে অন্ধকারেই অনুমানে নির্ভর করে নামছে কিশোর। পা ফসকাল মুসা। পড়ে যেতে যেতে কোনমতে সামলাল। গোড়ালি মচকে ফেলেছিল আরেকটু হলেই।

'আরে কি করছ!' চিৎকার করে উঠল কিশোর

'সরি!' বিড়বিড় করল মুসা। 'আই কিশোর, আরেকটা কাঠি জ্বালো না। মনে তো হচ্ছে কবরের মধ্যে ঢুকেছি, বাপরে বাপ, যা অন্ধকার! কি জায়গারে এটা!'

'কি আর? এখানে দিনদুপুরেও ভ্যাম্পায়ারেরা ঘোরাফেরা করে,' ফিসফিস

করে বলল রবিন, ভয় পাওয়ার ভান করছে। 'আরেকটু সামনে এগোলেই হয়তো হোঁচট খাব ড্রাকুলার কফিনে...'

'দোহাই তোমার, রবিন, তেনাদের নিয়ে হেলাফেলা কোরো না...!' কেঁপে উঠল মুসার গলা।

আরেকটা কাঠি জ্বালল কিশোর। নিচু ছাত। সাদা রঙ করা দেয়ালের বহু জায়গায় প্লাস্টার খসে গেছে, ছাতলা পড়া। আরেক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগল। গায়ে কাঁটা দিল কিশোরের। আগুন দেখে জাল বেয়ে তাড়াহুড়া করে সরে যেতে লাগল একটা মাকড়সা। আলোটা নিভে যাওয়ার আগের মুহূর্তে চোখে পড়ল ওদের, একদিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো একটা ওয়াইন র‍্যাক, আরেক দিকে সম্ভবত কয়লার স্তূপ। সিঁড়িও আছে আরেকটা।

'এটাই বোধহয় সেই সেলার,' মুসা বলল, 'মিস্টার সেভারন যেটার কথা বলেছিলেন।'

'আমি যে পুরানো প্ল্যানটা কপি করে এনেছি,' রবিন বলল, 'তাতেও আছে এটা।'

আরেকটা কাঠি জ্বালল কিশোর। দেখতে দেখতে বলল, 'জায়গাটা যেন কেমন। গা ছমছম করে, তাই না?'

'তুমিও বলছ এ কথা!' জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে মুসা। 'দেখা তো হলো? চলো, যাইগে...'

'আস্তে!' থামিয়ে দিল ওকে কিশোর। 'কথা বলে কারা?'

মাথার ওপর থেকে আসছে চাপা কথার শব্দ।

'মিস্টার সেভারন নাকি?' বিড়বিড় করে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর।

'নিজেরা দুজন ছাড়াও আরও কেউ আছে,' রবিন বলল। 'কে?'

'মিসেস ড্রাকুলা চলে আসেনি তো সাতসকালে উঠে?' মুসার প্রশ্ন।

দম বন্ধ করে, কান পেতে শুনতে লাগল তিনজনে। পাথরের মেঝেতে চেয়ারের পায়া ঘষার শব্দ শুনে বুঝল রান্নাঘরটা ওদের ওপরে কোথাও রয়েছে। কথা শোনা যাচ্ছে ওঘর থেকেই।

'আরেকটা সিঁড়ি যে দেখলাম, সেটা দিয়ে উঠে দেখা যেতে পারে কোথায় উঠলাম,' প্রস্তাব দিল কিশোর।

'এখানে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে সেটা বরং ভাল,' সঙ্গে সঙ্গে বলল মুসা।

এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। তর সইছে না মুসার। আগে আগে উঠতে শুরু করল সে। তার পেছনে থেকে কাঠি জ্বেলে সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরে রাখল কিশোর। সবার পেছনে রবিন।

সিঁড়ির মাথায় উঠে আরেকটা কাঠি জ্বালল কিশোর। ট্র্যাপ-ডোর দেখা গেল এখানেও।

'এটা কি?' ডোরের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে থাকা একটা জিনিস ধরে টান দিল রবিন। বের করে আনল।

কাঠির আলোয় দেখতে দেখতে বলল কিশোর,' 'কাপড়। পোশাক থেকে

ছিঁড়ে গেছে। দেখো, কি রকম পাতলা, ফিনফিনে...'

শিউরে উঠল মুসা, 'খাইছে! তারমানে মিসেস সেভারন ভুল দেখেননি, সত্যি সত্যি ভূত আছে...'

'ফালতু কথা বাদ দিয়ে ঠেলা দাও,' কিশোর বলল।

আরও দুই ধাপ উঠে ঘাড় বাঁকা করে, কাঁধ ঠেকিয়ে ঠেলতে আরম্ভ করল মুসা। নড়াতে পারল না পাল্লাটা। তাকে সাহায্য করল রবিন আর কিশোর। ফাঁক হতে শুরু করল পাল্লা। ঠিক এই সময় পা ফসকাল রবিনের। ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে। গড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

তাড়াতাড়ি নেমে এসে তাকে ধরে তুলল মুসা। 'ব্যথা পেয়েছ?'

'সিঁড়ি থেকে পড়লে ব্যথা আর না পায় কে!' তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল রবিন। 'তবে তেমন কিছু না।'

'এই, দেখে যাও,' ফিসফিস করে ডাকল কিশোর। 'জলদি এসো!'

ডালা আরও ফাঁক করে ফেলেছে সে। সেই ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে লাল রঙের একটা জিনিস।

'কার্পেটের কিনারটা না?' দেখে বলল রবিন। 'ভূতের ঘরের নিচে রয়েছি আমরা, কোন সন্দেহ নেই।'

'তারমানে জোয়ালিনের প্রেমিক চুরি করে এখান দিয়েই ঢুকত,' মুসা বলল।

'হয়তো,' কিশোর বলল। 'পুরানো বাড়িটা তখন ছিল এখানে। সেলার থেকে সরাসরি এদিক দিয়েই ডাইনিং রুমে মদ নিয়ে যেত চাকর-বাকরেরা।'

'হ্যাঁ,' রবিন বলল। 'সামার-হাউসের ভেতর দিয়ে এসে চোরও ঢুকেছিল সেদিন এপথেই।'

দুই ধাপ নেমে এসে ডালাটা ছেড়ে দিল কিশোর। 'কিন্তু এটা যে আছে এখানে, জানল কি করে সে? জানার তো কথা নয়। সব সময় কার্পেটে ঢাকা থাকে।'

'নিশ্চয় পুরানো প্ল্যানটা থেকে। আমি যেটা কপি করে এনেছি। শাজিনের তো জানাই আছে। যে লোকটাকে পাঠিয়েছে নকশা দেখিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে কোনখান দিয়ে ঢুকতে হবে...'

'আর সেজন্যেই,' কিশোর বলল, 'কার্পেটটা অমন অগোছাল হয়ে ছিল। মিসেস সেভারন জানতেন পেরেক দিয়ে আটকানো ছিল...ঠিকই জানতেন; তাঁর তো আর জানার কথা নয়, তথাকথিত ভূতটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে নিচ থেকে ঠেলে ট্র্যাপ-ডোর খুলেছে, ওপরে বিছানো কার্পেটটাও পেরেক থেকে ছুটে গেছে ঠেলা লেগে।'

'চমৎকার! ভূত রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। চলো, সেভারনদের জানাইগে।'

'এদিক দিয়েই যাব?'

'দরকার কি ঠেলাঠেলি করার।'

সামার-হাউস দিয়ে আবার বাইরে বেরোল ওরা। উজ্জ্বল রোদে চোখ

ধাঁধিয়ে গেল।

বাড়ির পাশ ঘুরে আসার আগেই একটা গাড়ির দরজা লাগানোর শব্দ হলো। স্টার্ট নিল এঞ্জিন। দৌড় দিল কিশোর। বাড়ির সামনের দিকটায় পৌঁছে দেখল মিস্টার সেভারনের গাড়িটা বেরিয়ে যাচ্ছে গেট দিয়ে।

'কার সঙ্গে গেলেন?' অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মুসা।

ভ্রূকুটি করল কিশোর। গাল চুলকাল, 'সেটাই তো বুঝতে পারছি না...এমন কে এল, সাতসকালে বের করে নিয়ে যেতে পারল তাঁকে? গাড়িটাও নিশ্চয় ড্রাইভ করছে ওই লোকই।'

'আচ্ছা...' কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল রবিন। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

'কি বলতে চাও?'

'মিসেস ড্রাকুলা লোক পাঠিয়ে কিডন্যাপ করাল না তো?'

'তা কি করে হয়...' বলতে গেল মুসা।

কিন্তু সচকিত হয়ে উঠেছে কিশোর 'জলদি এসো! মিসেস সেভারনের কি অবস্থা করেছে কে জানে!'

জোরে জোরে সামনের দরজা ধাক্কাতে শুরু করল কিশোর।

তাকে অবাক করে দিয়ে খুলে গেল দরজাটা

মিসেস সেভারনও অবাক, 'তোমরা! এই সাতসকালে তোমরা কোত্থেকে?'

'অনেক আগেই এসেছি আমরা,' জবাব দিল কিশোর 'কিন্তু আপনার স্বামী কোথায় গেলেন?'

অস্বস্তি দেখা দিল মিসেস সেভারনের চোখে। 'গেছে...!' দুধের বোতলগুলো তুলে নিলেন তিনি। 'এসো, ভেতরে এসো। তোমাদের এই ছিরি কেন? নর্দমায় নেমেছিলে নাকি?'

'নর্দমায় না, সেলারে।' রাস্তার দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। কার সঙ্গে গেলেন মিস্টার সেভারন? মিসেস সেভারন বলতে চাইছেন না কেন? তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কিডন্যাপ করা হয়নি সেভারনকে।

আবার মিসেস সেভারনের দিকে ঘুরল সে। 'কাল রাতে ফোন করার অনেক চেষ্টা করেছি। নষ্ট নাকি?'

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস সেভারন। 'হ্যাঁ। আজ ঠিক করে দেবে বলেছে।'

*

সামার-হাউস দিয়ে ঢুকে কি পাওয়া গেছে শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মিসেস সেভারন। বললেন, 'কিছুই জানতাম না আমরা। জানবই বা কি করে? কার্পেটটা কি কখনও তুলেছি।'

'এ বাড়ির পুরানো প্ল্যানটাও দেখেননি?'

'না। এ সব কাজ জ্যাকিই করত।'

'কিন্তু আসল দলিলগুলো নিশ্চয় আছে আপনাদের কাছে। সেদিন সেই লোকটা ওগুলোই নিতে এসেছিল।'

'বোধহয় আছে অনেক পুরানো কিছু দলিল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেখেছি জ্যাকিকে। বলত, এখানকার পুরানো ইতিহাস জানার চেষ্টা করছে। তবে সবই...সবই...ওই ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষটা এসে জ্বালানো শুরু করার আগে।'

বার বার দেয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছেন তিনি। চেহারায় উদ্বেগের ছাপ। ব্যাপারটা লক্ষ করল কিশোর। বৃদ্ধার দিকে ঝুঁকে বলল, 'আপনি সত্যি বলছেন মিসেস সেভারন, আপনার স্বামী কোন বিপদে পড়েননি?'

লম্বা করে শ্বাস টানলেন মিসেস সেভারন এবারেও জবাব দিলেন না কিশোরের প্রশ্নের। 'বড় চিন্তা হচ্ছে...হুট করে এভাবে চলে গেল...আবার না কোন বিপদে জড়ায়...'

'কোথায় গেলেন?'

'মেয়েলোকটার অফিসে...' বলেই চুপ হয়ে গেলেন মিসেস সেভারন। 'নাহ্...তোমাদের এ ভাবে বলে দেয়াটা ঠিক হচ্ছে না...'

'মিসেস শাজিনের অফিসে! কেন?'

'বিরক্তর চূড়ান্ত হয়ে গেছে। কত আর সহ্য করবে। আজ একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না বলেছে দরকার হয় পুলিশের কাছেই যাবে। ওরা বিশ্বাস করবে না বলেই এতদিন যায়নি।...সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে ওই শয়তান বেটিটার অত্যাচার।'

রুমাল বের করে নাক ঝাড়লেন মিসেস সেভারন 'ওদের যেতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু পারলাম না।...পুলিশ আগেও বিশ্বাস করেনি আমাদের কথা, এখনও করবে না। শুধু শুধু আমাদের ছেলেটাকে...' কান্নায় বুজে এল তাঁর কণ্ঠ।

'ওদের মানে? আর কে আছেন মিস্টার সেভারনের সঙ্গে?'

কিছুক্ষণ থেকেই ভারী একটা ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসছিল। জোরাল হলো সেটা। উঠে দেখতে গেল মুসা। জানালার পর্দা সরিয়ে দেখেই চিৎকার করে উঠল, 'কিশোর, জলদি এসো!'

দৌড়ে গেল রবিন। কিশোর গেল তার পেছনে।

গেটের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে একটা দৈত্যাকার জেসিবি ডিগার। ইচ্ছে করে ইঞ্জিনটাকে প্রচণ্ড গোঁ-গোঁ করাচ্ছে ড্রাইভার। এগজস্ট দিয়ে ভলকে ভলকে বেরোচ্ছে কালো ধোঁয়া। নীরব রাস্তাটার নীরবতা ভেঙে চুরমার করার বিকৃত আনন্দে মেতেছে যেন।

বার কয়েক গোঁ-গোঁ করিয়ে ইঞ্জিনের গর্জন কমাল ড্রাইভার। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। ঠিকানা ঠিক আছে কিনা দেখল বোধহয় তারপর পিছাতে শুরু করল বিশাল যন্ত্রটাকে। কিছুদূর পিছিয়ে গিয়ে নাক ঘুরাল কটেজের দিকে। ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা।

'উদ্দেশ্যটা কি ওর?' বুঝতে পারলেও বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন।

'দেখছ না, ভাঙতে আসছে! গেট, বেড়া সব ভেঙে ঢুকে পড়বে বাগানে...'

'ঠেকানো দরকার ওকে!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। সচল হলো হঠাৎ। দরজার দিকে দৌড় দিল।

তেরো

কামানের গোলার মত সামনের দরজা দিয়ে ছিটকে বেরোল যেন তিন গোয়েন্দা। হাত নাড়তে নাড়তে গেটের দিকে ছুটল।

'এই, থামুন, থামুন!'

কিন্তু ওদের চিৎকার কানেই গেল না যেন ড্রাইভারের।

সামনের দরজায় এসে দাঁড়ালেন মিসেস সেভারন। মুখে হাতচাপা দিয়েছেন। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছেন দানবটার দিকে। হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে এল ছোট্ট চিৎকার। বুড়ো পা দুটো যেন আর ধরে রাখতে পারল না শরীরটাকে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে বসে গেলেন দরজার গোড়ায়।

দৌড়ে ফিরে গেল তিন গোয়েন্দা। হাত ধরে টেনে সরাল তাঁকে। দরজার ফ্রেমে পিঠ লাগিয়ে যতটা সম্ভব আরাম করে বসিয়ে দিল।

'মিসেস সেভারন, কি হয়েছে আপনার?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল রবিন।

ঘন ঘন কয়েকবার ভারী দম নিলেন মিসেস সেভারন। 'না না, আমার কিছু হয়নি!'

'শোবেন নাকি? নিয়ে যাব ভেতরে?'

'না, আমি এখানেই থাকব।'

ওদিকে প্রচণ্ড গর্জন তুলে বেড়ার কাছে চলে এসেছে ডিগারটা। বেড়া ভাঙতে প্রস্তুত।

'সত্যি সত্যি ভাঙবে!' এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। 'পাগল হয়ে গেছে! না হুমকি দিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে?'

'ও শয়তান মহিলাটার লোক হয়ে থাকলে,' কিশোর বলল, 'সত্যিই ভাঙবে।'

হাত নাড়তে নাড়তে আবার ছুটল সে। ড্রাইভারের চোখে পড়ল। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে নেমে এল লোকটা। চিৎকার করে বলল, 'কি ব্যাপার? চাপা পড়ে মরার ইচ্ছে হলো নাকি?'

জবাব না দিয়ে রাগত স্বরে প্রশ্ন করল কিশোর, 'আপনি কি করছেন?'

'দেখে বুঝতে পারছ না?' মাথার হলুদ সেফটি হেলমেটটা ঠেলে পেছনে সরাল ড্রাইভার।

'বুঝতে তো যা পারছি, বাগানটার সর্বনাশ করার ইচ্ছে হয়েছে আপনার।'

কিশোরের পাশে এসে দাঁড়াল মুসা আর রবিন।

ওদের দিকে একবার করে তাকিয়ে আবার কিশোরের দিকে নজর ফেরাল লোকটা, 'বুঝলেই ভাল।' ঘুরে আবার ক্যাবে উঠতে গেল।

দৌড়ে এসে তার হাত চেপে ধরল কিশোর। 'কে করতে বলেছে আপনাকে?'

'যে-ই হোক, বলেছে। অর্ডার।'

'কে দিয়েছে, সেটাই তো জানতে চাইছি।'

ওভারঅলের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল লোকটা। 'লোকাল কাউন্সিল।'

'দেখি তো?' কাগজটা প্রায় ছিনিয়ে নিল কিশোর।

মুসা আর রবিনও দেখার জন্যে পাশে সরে এল।

কাগজটা রাস্তা বাড়ানোর পার্মিট। রাস্তা চওড়া করার অনুমতি রয়েছে তাতে।

'এ কথা তো নতুন শুনলাম,' মুসা বলল লোকটার দিকে তাকিয়ে। 'যাঁদের বাড়ি তাঁদের আগে জানানো হয়নি কেন?'

'জানাবে কি করে?' ব্যঙ্গ করে বলল কিশোর। 'ভুয়া কাণ্ড তো! সেই ড্রাকুলা বেটির কাজ; দেখছ না, ভাঙা টাইপরাইটার, "ও" অক্ষরটা ক্যাপিটল্ লেটারে।'

'তাই তো!'

'এ সব ধাপ্পাবাজি ছাড়ুন!' কাগজটা লোকটার হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল কিশোর। 'বিদেয় হোন এখান থেকে!'

'তাই নাকি?' রাগল না লোকটা। 'কার হুকুমে?'

'হুকুমের কথা বলা হচ্ছে না। কাউন্সিলের বাপেরও সাধ্য নেই জায়গার মালিকের সঙ্গে কথা না বলে, তার অনুমতি না নিয়ে রাস্তা বাড়ানোর হুকুম দেয়।'

'ওসব আমার জানার দরকার নেই। আমাকে লিখিত অর্ডার দিয়েছে, পালন করতে আমি বাধ্য। তোমার মত একটা ছেলেমানুষের কথায় ফিরে যাব আমি ভাবলে কি করে?'

'ছেলেমানুষ কাকে বলছেন!' রেগে উঠল মুসা।

হাত তুলে তাকে থামার ইঙ্গিত করে কিছুটা নরম হয়ে বলল কিশোর, 'ব্যাপারটা যে ধাপ্পাবাজি, আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। যদি একটু সময় দেন।'

পকেটে কাগজটা রেখে মাথা নাড়ল ড্রাইভার, 'সরি। আমার কাজ আমাকে করতেই হবে। এদিকের বেড়া আর গাছগুলোর আশা ছাড়ো,' ক্যাবে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। সামনের দিকে একটা লিভার ঠেলে দিতেই বেড়ে গেল ইঞ্জিনের শব্দ।

'কিশোর, ওকে থামানো দরকার!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুদিক থেকে দুজনের হাত চেপে ধরল রবিন। 'এসো, সামনে গিয়ে দাঁড়াই। দেখি, আমাদের মাড়িয়ে বেড়া ভাঙতে আসে কি করে।'

গেটের বাইরে এসে বেড়ার সামনে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে গেল ওরা।

পাশে ঝুঁকে মাথা বের করল ড্রাইভার, 'কি হলো, সরো!' আরেকটা লিভার ঠেলে দিল সে। ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল ডিগার।

'খাইছে!' ঢোক গিলল মুসা। 'সত্যি সত্যি চাপা দেবে নাকি?'

ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে মাথা নাড়ল কিশোর, 'এত সাহস হবে না।'

দেখতে দেখতে যন্ত্রটা এত কাছে চলে এল, ওটার বনেটের মরচেগুলোও দেখতে পাচ্ছে ওরা। চোখ বন্ধ করে ফেলল কিশোর। কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়ল না। হাতের চাপ বাড়াল দুই বন্ধুর হাতে। ওরাও চাপ দিল একাত্মতা ঘোষণা করে।

বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। আচমকা নীরবতা নেমে এল রাস্তা জুড়ে। চোখ মেলে দেখল কিশোর, ক্যাব থেকে নেমে আসছে ড্রাইভার। চোখমুখ ভয়ঙ্কর করে এগিয়ে এল ওদের দিকে।

'সরো!' রবিনের হাত চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে সরানোর চেষ্টা করল সে। 'মরতে চাও নাকি?'

'দেখুন,' অনুরোধের সুরে বলল কিশোর, 'আমাদের কথা বিশ্বাস করুন, পুরো ব্যাপারটাই ধাপ্পাবাজি। নইলে কি আর এভাবে মেশিনের সামনে দাঁড়াতাম আমরা? আমাদের প্রাণের ভয় নেই?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না!'

ইতিমধ্যে হই-হট্টগোল শুনে কি হয়েছে দেখার জন্যে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে সেভারনদের পড়শীরা।

শোনার পর একজন বলল, 'ঠিকই তো বলছে ছেলেগুলো। আপনি জোর করে ভাঙতে এসেছেন কেন? কে হুকুম দিল আপনাকে?'

দ্বিধায় পড়ে গেছে ড্রাইভার। বলল, 'কাউন্সিল। আমার বস্ ডেকে বলল, ওপর থেকে ভাঙার নির্দেশ এসেছে আমাকে পাঠাল ভাঙতে।'

'ভাঙতে বললে ভাঙুন, আমরা তো মানা করছি না,' কিশোর বলল। 'কিন্তু বলছি একটু সময় দিতে, যাতে আমরা প্রমাণ করে দিতে পারি আপনারা ভুল করছেন।'

হাতঘড়ি দেখল ড্রাইভার। 'আমি পারব না। এখান থেকে সেরে গিয়ে আরেকটা কাজ করতে হবে। সময় নেই।'

'তাহলে ওখানের কাজটাই আগে সেরে আসুন না?'

মাথা নাড়ল লোকটা, 'সরি। এটাই আগে করার হুকুম দিয়েছে।'

'প্লীজ!' অনুরোধ করল রবিন, 'আধঘণ্টা সময় দিন। তাতেই হয়ে যাবে।'

হেলমেটটা খুলে মাথা চুলকাল ড্রাইভার। জোরে নিঃশ্বাস ফেলল। 'বেশ, দিলাম আধঘণ্টা, যাও। ততক্ষণে চা-নাস্তা খেয়ে নিই আমি। সকালে খবরের কাগজটাতেও চোখ বোলানো হয়নি। মনে থাকে যেন, আধঘণ্টা। তারপর আর সময় পাবে না...'

আবার ক্যাবে উঠে গেল সে। লাঞ্চবক্স আর ফ্লাস্ক বের করল।

একটা মুহূর্ত আর দেরি করল না কিশোর। দুই সহকারীকে আসতে বলে

ছুটল।

দরজার সামনেই বসে আছেন মিসেস সেভারন। ফ্যাকাসে চেহারা। গায়ের কাঁপুনি যায়নি।

'কি বলল ও?' জানতে চাইলেন তিনি।

'ওরা নাকি রাস্তা বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে,' কিশোর বলল, 'আপনাদের বাগানের সামনের অংশটা যাবে।'

ঝট করে হাত উঠে গেল মিসেস সেভারনের হাঁ হয়ে যাওয়া মুখে।

'ভাববেন না,' তাড়াতাড়ি তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল কিশোর, 'আমরা জানি, এগুলো সব অগাস্ট শাজিনের শয়তানি। প্রমাণ জোগাড় করতে যাচ্ছি আমরা।'

'কিন্তু...'

'পরে বলব সব, এখন সময় নেই। আপনাকে শুধু বলে যাচ্ছি, চিন্তা করবেন না। এই, এসো তোমরা।'

সাইকেল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। সাঁ সাঁ করে ছুটল। আধঘণ্টা সময়ও নেই হাতে। এর মধ্যে ওল্ড প্যাসিফিক স্ট্রীটে শাজিনের অফিসে যেতে হবে, প্রমাণ জোগাড় করে ফিরতে হবে আবার ম্যানিলা রোডে। অসম্ভব মনে হচ্ছে।

কিছুদূর এগিয়ে হঠাৎ খেয়াল করল কিশোর, রবিন নেই ওদের সঙ্গে। ফিরে চেয়ে দেখল অনেক পেছনে পড়েছে সে। তাড়াতাড়ি আসার জন্যে হাত নেড়ে ইশারা করে আবার সামনে তাকাল কিশোর।

'পারব না!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা, 'কোনমতেই পারব না এই সময়ের মধ্যে।'

ফুস্ করে শব্দ হলো। কেঁপে উঠল মুসার হাত। হ্যান্ডেলটা বেয়াড়াপনা শুরু করল। সামনের চাকাটা রাস্তা থেকে নেমে গেল পথের পাশে। সামলাতে পারল না মুসা। উল্টে পড়ে গেল।

ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর আর রবিন।

লাফ দিয়ে নেমে মুসার দিকে দৌড় দিল কিশোর, 'মুসা! কি হলো তোমার? ব্যথা পেয়েছ?'

কনুই ডলল মুসা উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে টান দিয়ে তুলল সাইকেলটা। সামনের চাকাটার দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল এমন করে যেন নিমফল মুখে দিয়েছে, 'গেছে!'

'কি?' জানতে চাইল কিশোর।

'পাংচার।'

ঘড়ি দেখল রবিন, 'করবটা কি এখন?'

'তোমরা চলে যাও,' মুসা বলল। 'আমি ফিরে গিয়ে মিসেস সেভারনকে পাহারা দিই।...যাও যাও, দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট কোরো না।' দুজনকে ঠেলা দিল সে। 'নাকি তোমাদের একজন থাকবে, আমি যাব?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, তুমিই থাকো। আমরা যাই।'

আবার সাইকেলে চাপল দুজনে। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে মুসাকে বলল কিশোর, 'আমাদের দেরি হলে লোকটাকে ঠেকাবে, যে ভাবে পারো।'

দুজনকে চলে যেতে দেখল মুসা। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল। চাকা বসে যাওয়া সাইকেলটাকে ঠেলে নিয়ে চলল কটেজের দিকে।

*

তীব্র গতিতে প্যাডাল করে চলেছে কিশোর আর রবিন। বেপরোয়া। রাস্তার মোড়গুলোতেও গতি কমাচ্ছে না, জোড়গুলোতেও না। রেলওয়ে ক্রসিঙের দিকে চলেছে এখন।

গেটের দিকে এগোতে এগোতে দমে গেল। লাল আলোটা জ্বলছে-নিভছে। ওয়ার্নিং বেল বাজছে। দূরে শোনা গেল ট্রেনের হুইসেল। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করল গেটটা।

'বন্ধ হওয়ার আগে পেরোতে পারব?' রবিনের প্রশ্ন।

'না,' ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। 'চেষ্টা করে লাভ হবে না। আমরা ট্রেনে কাটা পড়ে মরলে কোন উপকার হবে না সেভারনদের!'

ট্রেনটা চলে যাওয়ার অপেক্ষায় রইল দুজনে। অস্থির হয়ে বার বার ঘড়ি দেখছে রবিন।

'কয়েক যুগ তো পার হয়ে গেল,' গজগজ করতে লাগল সে, 'ট্রেন আসারও আর সময় পেল না! মুসা ঠিকই বলেছে, আধঘণ্টার মধ্যে কোনমতেই ফিরতে পারব না আমরা।'

'পারতেই হবে,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর। 'না পারলে চলবে না!'

কানফাটা শব্দ তুলে পার হয়ে গেল ট্রেন। খুলে যেতে শুরু করল গেট। প্যাডালে চাপ দিল ওরা। লাইন পেরিয়ে আসতেই পেছন থেকে শোনা গেল গাড়ির হর্ন। সামান্য ভাঙা ভাঙা। পরিচিত মনে হলো কিশোরের। ফিরে তাকাতেই দুলে উঠল বুক। ইয়ার্ডের পিকআপটা। গাড়ি চালাচ্ছেন রাশেদ পাশা। পাশে বসে আছে ডন।

হাত তুলল কিশোর।

আগেই দেখতে পেয়েছেন রাশেদ পাশা। রাস্তার পাশে থামালেন।

পিকআপের পেছনে মুসাকে দেখে অবাক হলো কিশোর। কিন্তু প্রশ্ন করার সময় নেই এখন। গাড়ি থামতেই পাশে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিল মুসা, 'সাইকেলগুলো দাও, তুলে ফেলি।'

সাইকেল দুটো তুলে রবিন আর কিশোরের উঠে বসতে মিনিটখানেকও লাগল না। পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল কিশোর, 'চাচা, যাও। ওল্ড প্যাসিফিক স্ট্রীটের মাথায় আমাদের নামিয়ে দিলেই চলবে।'

গাড়ি চলল। মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'তুমি চাচাকে পেলে কোথায়?'

'কাকতালীয় ঘটনা প্রচুর ঘটে পৃথিবীতে,' কৃত্রিম গাম্ভীর্য দেখিয়ে দার্শনিকের ভঙ্গিতে জবাব দিল মুসা। 'চাকা ফুটো হওয়াতে হাজারটা গাল দিয়েছি সাইকেলটাকে। ঠেলে নিয়ে প্রায় পৌঁছে গেছি সেভারনদের বাড়ির

গেটে, এই সময় পাশের আরেকটা রাস্তা থেকে বেরিয়ে পেছন থেকে আমার পাশে এসে দাঁড়াল পিকআপটা। ডন আমাকে সাইকেল ঠেলে নিয়ে যেতে দেখে রাশেদ আঙ্কেলকে বলেছে। আমার সাহায্য লাগতে পারে ভেবে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। তোমরা কোথায় গেছ তাঁকে জানালাম। ওল্ড প্যাসিফিক স্ট্রীটে দিয়ে আসতে অনুরোধ করলাম।'

'হুঁ, একেই বলে ভাগ্য,' মাথা দোলাল কিশোর। 'ম্যানিলা রোডের এক বাড়িতে মালের দরদাম করতে যাওয়ার কথা ছিল চাচার। তোমার চাকাটা ফুটো হলো বলেই দেখাটা হলো, নইলে এখন গাড়িটা পেতাম না।'

'মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে...' কিশোরের কাছ থেকে শেখা বাংলা কবিতাটা এই সুযোগে ঝেড়ে দিল রবিন।

যে ঝরঝরে পিকআপটা নিয়ে অনেক ব্যঙ্গ আর হাসাহাসি কিশোরও করে, চাচাকে মিউজিয়ামে দিয়ে আসতে বলে, সেটাই এখন বিরাট উপকার করল। সাইকেলের চেয়ে অনেক দ্রুত পৌঁছে দিল ওল্ড স্ট্রীটের মাথায়।

চিৎকার করে চাচাকে বলল কিশোর, 'রাখো এখানেই।'

তিন গোয়েন্দা নেমে গেলে জিজ্ঞেস করলেন রাশেদ পাশা, 'দাঁড়াব এখানে?'

'না, লাগবে না,' কিশোর বলল, 'চলে যাও। সাইকেলগুলো নিয়ে যাও।' মিস্টার সেভারনকে পেলে তাঁর গাড়িতেই ফিরতে পারবে ম্যানিলা রোডে। সাইকেলগুলো রাখলে ঝামেলা হবে তখন, তাই দিয়ে দিল।

'নতুন কোন কেস নাকি তোদের?'

'হ্যাঁ। পরে বলব সব। যদি সফল হতে পারি কাগজেও দেখতে পাবে।'

ডন নামতে চাইল। নামতে দিলেন না রাশেদ পাশা। মুখটাকে পেঁচা বানিয়ে বসে রইল সে। কিশোর ওর দিকে তাকাতেই জিভ বের করে ভেঙচি কাটল। হেসে ফেলল কিশোর। মুসা আর রবিনও হাসতে লাগল।

পিকআপটা চলতে শুরু করার আগেই রওনা হয়ে গেল তিনজনে। ঢুকে পড়ল কানাগলিটায়, যেটাতে রয়েছে শাজিন-হ্যারিসনের অফিস।

পুরানো বিল্ডিংটার সামনে সেভারনদের সবুজ গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

থামল কিশোর। বলল, 'গাড়িটা আছে, তারমানে মিস্টার সেভারন এখনও শাজিনের অফিসেই রয়েছেন।'

'কি করে জানলে?' মুসার প্রশ্ন।

'তা ছাড়া আর কোথায় থাকবেন? চলো, ঢুকে পড়ি।'

কিন্তু ঢুকতে গিয়ে হতাশ হতে হলো। বিল্ডিঙে ঢোকার মূল দরজাটা বন্ধ। ঠেলা দিয়ে দেখল রবিন। নব ধরে মোচড় দিল। ভেতর থেকে তালা লাগানো।

'তালা দেয়া!' কিশোরের দিকে তাকাল সে, 'কি করা যায়?'

'আর কোন পথ নেই?'

'না। কিন্তু মিস্টার সেভারন ঢুকলেন কিভাবে?'

'কি করে বলব?' পাল্লায় কাঁধ লাগিয়ে ধাক্কা দিতে শুরু করল কিশোর।

হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা নাড়ল, 'নাহ্, খোলা যাবে না। শনিবারে কি কেউ কাজ করে না নাকি এখানে?' রবিনের দিকে তাকাল আবার সে, 'ঢোকার আর কোন পথই কি নেই?'

এক মুহূর্ত ভাবল রবিন, 'আছে, তবে দস্যু সাইমন টেম্পলার হওয়া লাগবে আমাদের।'

'মানে?'

'একটা ফায়ার এসকেপ আছে। ওটা বেয়ে উঠতে পারলে...'

রবিনকে কথা শেষ করতে দিল না মুসা। 'দেখাও ওটা, সাইমন টেম্পলারই হব আজ। কোনদিকে?'

বাড়ির পাশ দিয়ে দৌড় দিল রবিন। পেছনে চলল মুসা আর কিশোর।

ফায়ার এসকেপটার নিচে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে তাকাল কিশোর। চিন্তিত। বিড়বিড় করে বলল, 'কিন্তু ওটা বেয়ে ওঠা...সত্যি সত্যি সাইমন টেম্পলারকে দরকার...আমরা কি পারব!'

'তোমাদের দুজনের পারা লাগবে না,' নির্দ্বিধায় বলে দিল মুসা, 'আমি উঠে যাচ্ছি। জানালা দিয়ে ঢুকে নেমে এসে সামনের দরজা খুলে দেব।...রবিন, বলো তো, কোন কোন দিক দিয়ে গিয়ে কিভাবে আসতে হবে?'

নড়বড়ে, মরচে পড়া লোহার ধাপগুলো বেয়ে উঠে যেতে লাগল মুসা। কোনভাবে যদি পা পিছলায়, কিংবা কোন একটা ধাপ খসে যায়, নিচে পড়ে যে ছাতু হয়ে যেতে হবে জানে, সেজন্যেই ভয়ে নিচের দিকে তাকাচ্ছে না।

'সাবধান, মুসা!' ধাপগুলোর গোঙানি আর কচমচ শব্দ বুকের মধ্যে বাড়ি মারছে যেন কিশোরের। 'অসুবিধে হলে নেমে এসো, অন্য উপায় বের করব।'

কিন্তু জানালার কাছাকাছি চলে গেছে ততক্ষণে মুসা। পাশে হাত বাড়িয়ে একটা জানালার চৌকাঠের নিচটা ধরে ফেলল। ঝুলে পড়ল একহাতের ওপর। দ্বিতীয় হাতটাও বাড়িয়ে দিয়ে ধরে ফেলল। নিজেকে টেনে তুলল চৌকাঠের ওপর। ঢুকে গেল ভেতরে। গলা বের করে নিচের দিকে তাকিয়ে হাসল। হাত নেড়ে সামনের দরজার কাছে চলে যেতে ইশারা করল কিশোর আর রবিনকে।

ঠিক দেড় মিনিটের মাথায় দরজাটা খুলে দিল মুসা।

ভেতরে ঢুকে গেল কিশোর আর রবিন।

সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠতে শুরু করল তিনজনে। তিনতলায় শাজিন-হ্যারিসনের অফিসের সামনে আসতে কথা শোনা গেল ভেতর থেকে। চাপা স্বরে কথা বলছে দুজন লোক।

'মিস্টার সেভারনের গলা মনে হচ্ছে না?' ফিসফিস করে বলল রবিন।

'তাই তো,' মুসা বলল।

'শিওর হওয়ার একটাই উপায়,' নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর, 'ভেতরে ঢুকে পড়া।'

*

অবাক হয়ে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন মিস্টার সেভারন আর তাঁর সঙ্গী।

'তোমরা!...তোমরা এখানে!' মিস্টার সেভারন বললেন।

জবাব না দিয়ে কিশোর তাকিয়ে আছে তাঁর সঙ্গীর দিকে।

'আপনি জ্যাকি না?' কিশোর বলল। 'কি করে এলেন?'

হাসল জ্যাকুয়েল সেভারন যার ডাকনাম জ্যাকি। 'তাহলে তোমরাই আমাকে চিঠি লিখেছিলে।'

'কিন্তু এখানে এলেন...' আবার জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল কিশোর।

মাথা নেড়ে তাকে থামিয়ে দিল জ্যাকি, 'সব বলার সময় নেই। একটা কথাই বলি, তোমাদের চিঠি পেয়ে মনে হলো এখানে কি ঘটছে দেখে যাওয়া দরকার।' বাবার দিকে ফিরল সে, 'বাবা, তোমাকে বলিনি, ওরা আমাকে শাজিনের শয়তানির কথা চিঠি লিখে জানিয়েছে।'

'ও, বাড়ি আসার তোর এটাই আসল কারণ। আমি তো ভেবেছি প্যারোলে ছাড়া পেয়ে আমাদের দেখতেই এসেছিস,' বাবার কণ্ঠে মৃদু অভিমান।

'দুটো কাজই করতে এসেছি,' হাসল ছেলে। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে বলল, 'আমার হাতে বেশি সময় নেই। আজকেই সন্ধ্যার আগে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে'।'

'আপনারা ঢুকলেন কি করে এখানে?' জানতে চাইল মুসা। 'সামনের দরজায় তো তালা লাগানো ছিল।'

আবার হাসল জ্যাকি। 'এখানে চাকরি করতাম যে ভুলে গেলে? ডুপ্লিকেট একটা চাবি এখনও আছে আমার কাছে।'

'কিন্তু তোমরা এখানে কেন?' আবার সেই প্রথম প্রশ্নটাই করলেন মিস্টার সেভারন। 'ঢুকলেই বা কি করে? আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলে নাকি? জ্যাকির মা ভাল আছে? কিছু ঘটেছে?'

কি ঘটেছে, জানাল কিশোর।

রক্ত সরে গেল বৃদ্ধের মুখ থেকে। ডেস্কের কিনার খামচে ধরলেন তিনি। 'এখনি যাওয়া দরকার!'

'যেতে তো হবেই, তার আগে কিছু তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করে নিই। "ও" অক্ষর নষ্ট হওয়া ওই টাইপরাইটার দিয়ে একটা চিঠিও লিখতে হবে, ড্রাইভারকে বোঝানোর জন্যে যে সে একটা মস্ত ভুল করতে যাচ্ছে।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মুসা বলল, 'মাত্র দশ মিনিট সময় আছে আমাদের হাতে।'

'এখনও দশ মিনিট আছে!' বিশ্বাস হচ্ছে না রবিনের। 'আমার তো মনে হচ্ছে দশ হাজার বছর পার করে দিয়েছি! তবে সময় নিয়ে ভাবছি না,' হেসে পকেটে হাত ঢোকাল সে। একটা চাবি বের করে দেখিয়ে বলল, 'ডিগারের ইগনিশন কী। চুরি করেছি।'

'ও, এ জন্যেই পেছনে পড়ে গিয়েছিলে তখন,' হাসি ফুটল কিশোরের মুখেও। 'খবর লুকিয়ে রাখার দেখি তুমিও ওস্তাদ। যাকগে, কাজের কাজই করেছ একটা।'

'ড্রাইভারকে যে নির্দেশটা দেয়া হয়েছে,' জ্যাকি বলল, 'তার একটা কপি নিশ্চয় এখানে আছে কোনখানে। যদিও অতটা অসাবধান ভাবতে পারছি না

শাজিনকে। ধরা পড়ার মত প্রমাণ রেখে কাজ করার বান্দা নয় ও। আমি আর বাবা এতক্ষণ ধরে স্টেটমেন্ট খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।'

'স্টেটমেন্ট?' বুঝতে পারল না কিশোর।

'হ্যাঁ, জমা-খরচের স্টেটমেন্ট। ইনকাম ট্যাক্স অফিসকে দিতে হয় যেটা। দেখতে চাইছিলাম, আমি যে সময় যে টাকাটা চুরি করেছি বলেছে শাজিন, সেই অঙ্কের টাকা সেই সময়ে অন্য কোন খাতে খরচ করেছে কিনা সে। ব্যাংক থেকে তখন কত টাকা তুলেছে, সেটা স্টেটমেন্টের সঙ্গে মিলিয়ে নিলেই প্রমাণ করে দেয়া যাবে সে-ই খরচ করেছে টাকাটা, আমি চুরি করিনি।'

'যদি সে সেই টাকার হিসেবটা স্টেটমেন্টে দেখিয়ে থাকে,তবে। অত কাঁচা কাজ করবে বলে মনে হয় না।'

'নিজের অ্যাকাউন্টের হিসেব রাখার জন্যে ব্যক্তিগত আরেকটা স্টেটমেন্ট বানাতে পারে, যাতে আসল হিসেবটা রাখবে।'

'তা পারে। কিন্তু সেটা কোথায়?'

'পাইনি। টাকা যে আমি চুরি করিনি, প্রমাণ করার আর কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না।'

'এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার,' মিস্টার সেভারন বললেন। 'শাজিন এসে যদি দেখে ফেলে আমাদের, সাংঘাতিক বিপদে পড়ব।'

'যা হয় হবে,' জ্যাকি বলল, 'আবার খুঁজব। ওর বিরুদ্ধে প্রমাণ না নিয়ে আজ আমি বেরোচ্ছি না এখান থেকে।'

চোদ্দ

জ্যাকির কথামত প্রথমে ফাইলিং কেবিনেটগুলোতে খুঁজতে আরম্ভ করল ওরা।

'সেক্রেটারির মেশিনে টাইপ করা যে কাগজ পাও, সব দেখো,' কিশোর বলল। 'ভাঙা কী দিয়ে লেখা হয়েছে, এমন কোন না কোন চিঠি নিশ্চয় পাবে। নিয়ে নেবে সেটা, প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগবে। তোমরা এদিকটায় দেখতে থাকো। আমি ওদিকটায় দেখছি।'

কয়েক মিনিট পর হাসিমুখে বেরিয়ে এল কিশোর। হাতে একটা শর্টহ্যান্ড নোটপ্যাড আর দুই তা কাগজ। দুমড়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল নিশ্চয় ময়লা ফেলার ঝুড়িতে, তুলে চেপেচুপে সোজা করে নিয়েছে।

সেক্রেটারির টেবিল থেকে একটা পেন্সিল তুলে নিল সে। আলতো করে প্যাডের একজায়গায় দাগ দিয়ে রবিনকে দেখিয়ে বলল, 'এই যে, রাস্তা চওড়া করার অর্ডারের খসড়া।' দুমড়ানো একটা কাগজ দেখিয়ে বলল, 'আর এটা টাইপ করা অর্ডারের কপি। ভুল হয়েছিল বলে ফেলে দিয়েছে। টাইপরাইটারটা দিয়ে টাইপ করে দেখেছি, "ও" অক্ষরটা কোনমতেই ছোট হাতের করা যায় না, কী-টা নষ্ট, মারলেই ক্যাপিট্যল লেটারটা পড়ে...'

'এটা কি?' হঠাৎ বলে উঠল মুসা। একটা ফাইলিং কেবিনেটের একেবারে পেছনে লুকানো সবুজ একটা ফাইল বের করে আনল সে। খুলল।

'অ্যাই, জ্যাকি, দেখে যান!' ডাক দিল সে। 'আপনার বাবাকে লেখা চিঠির কপি।...একটা নিউজপেপার কাটিংও আছে। আদালতে আপনার কেসের রিপোর্ট।'

'এগুলো রেখেছে কেন?' অবাক হলো রবিন।

'দেখি?' এগিয়ে এল জ্যাকি।

কিশোরও দেখার জন্যে মুসার পাশে এসে দাঁড়াল। রিপোর্টটা পড়ে বলল, 'পনেরোই অগাস্ট টাকাটা ফান্ড থেকে চুরি গেছে বলে লিখেছে কাগজওলারা।'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি,' মাথা ঝাঁকাল জ্যাকি। 'একটা ভুয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে জাল দলিল সই করার অপরাধে অভিযুক্ত করেছে আমাকে শাজিন। চেকটা লেখা হয়েছে দশ তারিখে। কেউ আমার সই জাল করে স্বাক্ষর দিয়েছে ওটাতে। কে, নিশ্চয় বুঝতে পারছ।'

'কিন্তু ওই তারিখে তো আপনি ছিলেন না এখানে।'

'জানি। আমি তখন গ্রীসে। কিন্তু কোন সাক্ষী নেই আমার, যে সেটা প্রমাণ করবে।'

'আছে,' কিশোরের কালো চোখের তারা উত্তেজনায় চকচক করছে।

ভ্রূকুটি করল জ্যাকি, 'কে?'

'আপনার ছবি...আপনাদের বাড়ির বসার ঘরের ম্যানট্‌লপীসে যেটা রাখা আছে।'

মাথা নাড়তে লাগল জ্যাকি, 'কি বলছ বুঝতে পারছি না। বসার ঘরে ঢুকি না অনেকদিন।'

'তুই জেলে যাবার পর ডাকে এসেছে ছবিটা,' মিস্টার সেভারন বললেন। 'অ্যাথেনসে তোলা হয়েছে।'

'অ্যাথেনসে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'পারথেননের সামনে দাঁড়ানো।'

নাক-চোখ কুঁচকে ভাবতে লাগল জ্যাকি, মনে করার চেষ্টা করছে। উজ্জ্বল হলো মুখ। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে; একটা আমেরিকান মেয়ে তুলে দিয়েছিল ছবিটা। বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিলাম ওকে। ভাবিইনি ছবিটা পাঠাবে সে।'

'আর তাতে...' উত্তেজনায় গলা কাঁপছে কিশোরের, 'ছবির নিচে তারিখটা ছাপা হয়ে গেছে, ১০ অগাস্ট। আপনি জানেন, কিছু কিছু ক্যামেরায় ছবি তোলার তারিখটা ছাপা হয়ে যায়।'

'কিন্তু আমি তো কোন তারিখ দেখলাম না,' মিস্টার সেভারন বললেন।

'আছে,' জবাবটা দিল এবার রবিন, 'ভালমত খেয়াল করেননি, তাই দেখেননি। আমি হাতে নিয়ে দেখছিলাম সেদিন, মাউন্ট থেকে পড়ে গেল; তুলে নিয়ে আবার বসানোর সময় দেখেছি একেবারে নিচে তারিখ ছাপা রয়েছে। কিশোরও জানে। তখন অবশ্য তারিখটা নিয়ে কোন কথা ভাবিনি আমরা। ছবিতে তারিখ ছাপা থাকতেই পারে, সেটা স্বাভাবিক ব্যাপার।'

'স্বাভাবিক ব্যাপারটাই কাজে লেগে গেল এখন,' কিশোর বলল। 'জোরাল সাক্ষী হয়ে দাঁড়াল।'

হাসি ফুটল জ্যাকির মুখে। রবিনের কাঁধ চাপড়ে দিতে দিতে বলল, 'ভাগ্যিস হাত থেকে ফেলে দিয়েছিলে।'

'কিন্তু কথা হলো,' মুসা বলল, 'মিসেস শাজিন এভাবে ফাঁসাতে গেল কেন আপনাকে?'

'প্রথম কথা, আমার ওপর একটা আক্রোশ আছে তার একজন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলরকে ঘুষ সেধেছে সে, সেই লোক আবার আমার বন্ধু। কয়েকটা বিল্ডিঙের প্ল্যান পাস করে দিলে তাকে অনেক টাকা ঘুষ দেবে বলেছে।'

'পুলিশকে জানাল না কেন আপনার বন্ধু?'

কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাকি। 'তাকে ব্ল্যাকমেল করছিল শাজিন। অল্প বয়েসে একটা অপরাধ করে ফেলেছিল–তেমন কিছু না, তবু বন্ধুটির সেটা নিয়ে মাথাব্যথার অন্ত নেই। সেটা জেনে গিয়েছিল শাজিন; ওই কথা মনে করিয়ে দিয়ে, পুলিশকে বলে দেবার ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে তার কাছ থেকে কাজ আদায় করেছে। আমার বন্ধুটি জেলে যাবার ভয়ে শাজিনের কথা মানতে বাধ্য হয়েছে। বউ-বাচ্চা আছে তার...' রেগে গেল জ্যাকি। তিক্তকণ্ঠে বলল, 'মহিলাটা এতই শয়তান, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে হেন দুষ্কর্ম নেই যা সে করতে পারে না। আমি যখন জেনে ফেললাম এসব খবর, আমাকে ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ রাখতে চাইল সে। আমি ঘুষ নিতে রাজি না হওয়াতে গেল খেপে। শেষে আমাকেই দিল ফাঁসিয়ে।'

'আস্তে,' সচকিত মনে হলো মিস্টার সেভারনকে, 'কে যেন আসছে!'

সবাই শুনতে পেল সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

'মিসেস শাজিন না তো!' তাড়াতাড়ি দুই সহকারীকে নির্দেশ দিল কিশোর, 'আই, পেছনের অফিসটায় লুকিয়ে পড়ো। আপনারাও আসুন।'

দ্রুত পেছনের অফিসটায় চলে এল সবাই। ফাইলিং কেবিনেটের আশেপাশে ঘাপটি মেরে রইল। নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় পাচ্ছে। বাইরের ঘরে ঢুকল কেউ। হেঁটে গেল শাজিনের অফিসের দিকে। দরজা খুলল। সুইচবোর্ড অন করার শব্দ। রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করতে লাগল কেউ।

'কে, দেখে আসি,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'আপনারা সব এখানেই থাকুন। আমি না ডাকলে নড়বেন না।'

মাথা নুইয়ে পা টিপে টিপে সেক্রেটারির অফিসের দিকে এগোল সে। ডেস্কের ভেতরের দিকটায় এসে বসে পড়ল। দরজার কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, শাজিনের অফিসে ডেস্কের এককোণে ঝুঁকে রয়েছে কালো পোশাক পরা একটা মূর্তি। মুখটা উল্টোদিকে ফেরানো।

আস্তে হাত বাড়িয়ে সেক্রেটারির ডেস্কে রাখা ইনটারকমের সুইচটা অন করে দিল কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল ভারী নিঃশ্বাস আর অস্থির ভঙ্গিতে টেবিলে অধৈর্য আঙুল ঠোকার শব্দ।

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরে মগজে। বসে থেকেই টান দিয়ে ড্রয়ারটা

খুলল। ডিকটেশন মেশিনটা পাওয়া গেল। সারিয়ে নিয়ে এসেছে। ভাল। কাজ হবে এখন। ইনটারকমের পাশে সেটা রেখে 'রেকর্ড' লেখা বোতামটা টিপে দিল।

খিলখিল হাসির শব্দ।

'আরে হ্যাঁ···হ্যাঁ,' কথা শুনতে পাচ্ছে কিশোর, 'আজ সকালেই গিয়েছে। এতক্ষণে নিশ্চয় ওদের অত সাধের বাগানটার অর্ধেকটাই নেই আর, বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে···কৈফিয়ত? কোন সমস্যা নেই। স্রেফ বলে দেব, ড্রাইভার ভুল করেছে। ক্ষমাটমা চাওয়া যেতে পারে পরে, কিন্তু তাতে লাভ কিছু হবে না, বাগান আর ফেরত আসবে না···' আবার হাসি। 'এ রকম ভুল হতেই পারে, তাই না?'

মনে মনে রাগে জ্বলে উঠল কিশোর। মহিলাটা মানুষ না, আসলেই ড্রাকুলা!

'ভ্যানটা দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ,' শাজিন বলছে। 'পেছনে রাখা জিনিসগুলো জলদি ফেলে দিয়ে আসুন।···হ্যাঁ হ্যাঁ, পাবেন টাকা, যা বলেছি পাবেন। কাজটা আগে হয়ে যাক···তবে মুখ বন্ধ রাখতে হবে আপনাকে। খুললে আপনিও বিপদে পড়বেন। আপনি আমাকে সহায়তা করেছেন, অস্বীকার করতে পারবেন না। প্রমাণ করে দিতে পারব আমি। বন্দুকটার লাইসেন্সও আপনার নামে। পুলিশ জানতে পারলে আমাকে যেমন ছাড়বে না, আপনাকেও ছাড়বে না।'

আস্তে মাথা তুলে তাকাল আবার কিশোর। এখনও এদিকে পেছন ফিরে আগের মতই দাঁড়িয়ে আছে শাজিন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

ইনটারকমে আবার ভেসে এল তার কণ্ঠ। 'হ্যাঁ, মিস্টার সেভারন জায়গাটা বেচতে রাজি হয়ে গেলেই কাজ শুরু করে দিতে পারব আমরা। আবার টাকা আসতে আরম্ভ করবে। এখনকার টানাটানি আর থাকবে না।···কি বললেন?' আবার হাসি। 'ঠিকই আছে, বুড়োটার উপযুক্ত শাস্তি···ভালভাবে বলেছিলাম, কানে তোলেনি···'

পেছনে খুট করে শব্দ হতে ফিরে তাকাল কিশোর। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন মিস্টার সেভারন। ছড়িটা তুলে ধরেছেন। রাগে লাল হয়ে গেছে চোখমুখ।

'আরে করছেন কি!' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'বসে পড়ুন, বসে পড়ুন! দেখে ফেলবে তো!'

কিন্তু কানেও তুললেন না মিস্টার সেভারন। চিৎকার করে উঠলেন, 'শয়তান বেটি! আরেকটু হলেই বাড়িটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল আমার···শয়তানি করে করে আমার স্ত্রীকে ভয় দেখিয়েছিস, আমার জায়গা তছনছ করেছিস, তোকে আমি ছাড়ব না!'

গটমট করে গিয়ে এক ধাক্কায় দরজাটা খুলে ফেললেন তিনি। এত জোরে ধাক্কা দিলেন, দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল কাঁচ। পায়ের কাছে ছড়িয়ে পড়ল। লাগলে যে কেটে যেতে পারে, তোয়াক্কাই করলেন না। লাঠিটা নাড়তে নাড়তে গিয়ে ঢুকলেন শাজিনের অফিসে,

'শয়তান...'

লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল কিশোর, 'মিস্টার সেভারন!'

পেছনের অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে জ্যাকি। কিশোরের আগেই গিয়ে বাবার হাত চেপে ধরল। 'বাবা, কি করছ! থামো না!'

ঘুরে দাঁড়িয়েছে অগাস্ট শাজিন। গায়ে কালো জ্যাকেট, পরনে কালো জিনস। লম্বা কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধে। ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক। ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাদা দাঁত। মনে হচ্ছে, যে কোন সময় বেরিয়ে আসবে জানোয়ারের মত শ্বদন্ত–ড্রাকুলার যে রকম থাকে।

জ্যাকির ওপর চোখ পড়তে সরু হয়ে এল চোখের পাতা। ধমকে উঠল, 'এখানে কি? তোমার তো জেলে থাকার কথা।' পেছনে তিন গোয়েন্দাকে দেখে বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল চোখ, সরু হলো আবার; মোমের মত ফ্যাকাসে চেহারায় কালো ছাপ পড়ল। 'হচ্ছেটা কি?'

'আপনি যে একটা মিথ্যুক, সেই প্রমাণ জোগাড় হয়ে গেছে আমাদের,' রাগত স্বরে বলল জ্যাকি।

কিশোরের বগলে চেপে রাখা ফাইলের দিকে তাকিয়ে কালো চোখের মণি জ্বলে উঠল শাজিনের। 'পুলিশকে যখন বলব, চুরি করে আমার অফিসে ঢুকে কাগজপত্র তছনছ করেছ তোমরা,' শীতল কণ্ঠে বলল সে, 'কে কার কথা বিশ্বাস করে, কে সত্যিকার বিপদে পড়ে, দেখা যাবে তখন।'

'এবার আর আপনাকে বিশ্বাস করছে না ওরা,' কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর, 'আপনার বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ আছে আমাদের হাতে। সেভারনদের বাগান নষ্ট করতে ডিগার পাঠিয়েছেন, ওঁদের শান্তি নষ্ট করেছেন, নানা ভাবে যন্ত্রণা দিয়েছেন ওঁদের, ব্ল্যাকমেল করেছেন; অভিযোগের অন্ত নেই, ক'টা অস্বীকার করবেন?' ফাইলটা নাড়ল সে। 'আপনার শয়তানির সমস্ত প্রমাণ রয়েছে এর মধ্যে।'

হঠাৎ ডাইভ দিয়ে পড়ল শাজিন। ড্রয়ার খোলার শব্দ। আবার যখন উঠে দাঁড়াল সে, হাতে উদ্যত ছোট একটা পিস্তল। কিশোরের দিকে হাত বাড়াল। 'ফাইলটা দাও!'

'জ্বী-না!' ফাইল সহ হাতটা পেছনে নিয়ে গেল কিশোর, 'আপনার কথা আর শোনা হচ্ছে না।'

'দেখো, বোকামি কোরো না!' বরফের মত শীতল শাজিনের কণ্ঠ, 'ভাল চাও তো, দাও বলছি!'

'দিয়ে দাও, কিশোর,' মৃদুস্বরে বলল জ্যাকি। 'ওকে বিশ্বাস নেই। সত্যি সত্যি গুলি করে বসবে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফাইলটা দিয়ে দিল কিশোর।

'ও-কে,' ফাইলটা গোল করে পকেটে ঢুকিয়ে, এগিয়ে এসে মিস্টার সেভারনের হাত চেপে ধরল শাজিন। 'বুড়োটাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি আমি। কেউ আমার পিছে পিছে আসার চেষ্টা করলে...'

'নিতে যদি না দিই?' মুসা বলল।

'বাধা দিয়ে দেখো খালি,' ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে গেল শাজিনের। ভয়ঙ্কর লাগছে দেখতে।
মিস্টার সেভারনের হাতটা বাঁকিয়ে পিঠের ওপর নিয়ে এল শাজিন। পিস্তলটা অন্যদের দিকে নিশানা করে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল তাঁকে।
'যেতে দিচ্ছ কেন!' চিৎকার করে উঠল রবিন।
মাথা নেড়ে জ্যাকি বলল, 'কিছু করার নেই। বাধা দিলে যা বলছে তাই করবে। বরং অপেক্ষা করাই ভাল। বাইরে নিয়ে বাবাকে ছেড়ে দেবে।'
মিস্টার সেভারনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল শাজিন।
ডিকটেশন মেশিনটার কাছে এসে টেপের ক্যাসেটটা বের করে নিল কিশোর। পকেটে রেখে দিল।
ওটাতে কি আছে বুঝতে পারল জ্যাকি। নীরবে মাথা ঝাঁকাল।
'কিন্তু বাইরে নিয়ে গিয়ে আপনার বাবাকে যদি কিছু করে!' রবিন বলল।
এই সময় সিঁড়ি থেকে ভেসে এল গুলির শব্দ।
'সর্বনাশ!' বলেই দৌড় দিল জ্যাকি।
তিন গোয়েন্দাও ছুটল পেছনে।
দোতলার ল্যান্ডিং ফ্লোরে বসে আছেন মিস্টার সেভারন। বিমূঢ়ের মত তাকাচ্ছেন। হাতে শাজিনের পিস্তলটা। ছেলেদের দেখে বললেন, 'ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছি। পিস্তলটা মাটিতে পড়ে আপনাআপনি গুলি বেরিয়ে গেল।'
তাঁর ছেলে জিজ্ঞেস করল, 'ওর গায়ে লেগেছে?'
মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ, 'না। নিচে গড়িয়ে পড়েই লাফ দিয়ে উঠে দৌড় দিল। তাড়াতাড়ি গেলে এখনও ধরতে পারবে...'
হুড়মুড় করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা। নিচতলায় নামতেই কানে এল পুলিশের সাইরেন। পরক্ষণে ব্রেকের শব্দ।
'পুলিশ!' ভুরু কুঁচকে ফেলল কিশোর, 'ওরা জানল কি করে?'
এক মুহূর্ত পরেই সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে লাগল পুলিশের লোক, জোড়ায় জোড়ায়। সিঁড়ির দিকে ছুটল।
'কি হয়েছে?' জানতে চাইল একজন। তিন গোয়েন্দা আর জ্যাকিকে দেখছে। তারপর তাকাল মিস্টার সেভারনের দিকে। তিনিও নেমে আসছেন। 'আপনি কি মিস্টার সেভারন? আপনার পড়শী ফোন করেছে থানায়। বলেছে, আপনার স্ত্রী আপনার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছেন...?'
'একজন মহিলাকে যেতে দেখেছেন?' জানতে চাইল কিশোর।
অবাক হয়ে মাথা নাড়ল অফিসার, 'কই, না তো!'
পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। ওরাও অবাক।
'আমি জানি কোনখান দিয়ে গেছে!' আচমকা চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'সাইরেন শুনে আর সামনের দিকে যায়নি, ফায়ার এসকেপ দিয়ে পালিয়েছে!'
'জলদি!' লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল কিশোর। 'ধরতে হবে!'
জ্যাকি আর তার বাবা পুলিশের প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে রয়ে গেল, তিন গোয়েন্দা ছুটল শাজিনকে ধরার জন্যে। মুসা যে জানালাটা দিয়ে ঢুকেছিল,

সেটার কাছে এসে দেখল, ফায়ার এসকেপ থেকে নেমে পড়েছে শাজিন। বাঁধানো চত্বর দিয়ে দৌড়ে চলেছে। আঙিনার সীমানায় গিয়ে একটা দরজার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। 'সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ধরার চেষ্টা করতে হবে,' বলেই ছুটল আবার।

ওদেরকে দরজার দিকে ছুটে যেতে দেখে চিৎকার করে উঠল অফিসার, 'অ্যাই, অ্যাই, কোথায় যাচ্ছ?'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। চোখের পলকে আঙিনায় বেরিয়ে এল ওরা। কাঠের দরজাটার দিকে ছুটল।

দরজার ওপাশে একটা অন্ধগলি। উঁচু দালানের জন্যে ঠিকমত আলো ঢুকতে পারে না বলে আবছা অন্ধকার। দুদিকের দেয়ালেই আগাছা জন্মেছে। রাতের কুয়াশা পানি হয়ে জমে আছে এখনও। ফোঁটা ফোঁটা ঝরছে। রাস্তায় আবর্জনার ছড়াছড়ি। পানি আর মদের বোতল স্তূপ হয়ে আছে এখানে ওখানে।

'আরি!' আগে আগে ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। নিচু হয়ে তুলে নিল কি যেন। 'ওই কাগজগুলো!...ঘটনাটা কি?'

রবিন আর মুসাও দেখল দেয়ালের গায়ে সেঁটে থেকে বাতাসে বাড়ি খেতে খেতে নিচে পড়ছে কয়েকটা কাগজ।

'খাইছে!' কাগজ কুড়াতে শুরু করল মুসাও। 'ফেলে দিল কেন?'

'হয়তো আমাদের ঠেকানোর জন্যে,' রবিন বলল। 'কাগজ দেখলে কুড়ানো শুরু করব আমরা, থামব, এই সুযোগে সে পালাবে।'

'চালাক কত! পালাতে দিচ্ছি না আজ শয়তানটাকে,' বলেই দৌড় দিল মুসা।

গলির শেষ মাথায় বেরিয়ে দেখল একটা ছোট পার্কিং লট। কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আবার শাজিনকে চোখে পড়ল তিন গোয়েন্দার। কুকুর নিয়ে হাঁটতে বেরোনো একটা লোককে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ফেলতে ফেলতে তার পাশ কেটে ছুটে চলে গেল। একপাশে জেটি। পার্কিং লটের কাছ থেকে শ'খানেক গজ দূরে বাঁধা রয়েছে কয়েকটা মোটর ক্রুজার।

হাত তুলল কিশোর, 'ওই যে! জেটির দিকে যাচ্ছে।'

দাঁড়িয়ে গেল সে।

মুসাও দাঁড়াল, 'কি হলো?'

'বুঝেছি! এসো!' আবার ছুটল কিশোর।

জেটির কাছে পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেল শাজিন। দ্রুতহাতে একটা বোটের দড়ি খুলে ছুঁড়ে ফেলল ডেকে। কিন্তু ডেকে না পড়ে পানিতে পড়ল ওটা।

বোটে ওঠার আগেই পেছন থেকে গিয়ে তার জ্যাকেট খামচে ধরল মুসা। কিন্তু রাখতে পারল না। আশ্চর্য শক্তি শাজিনের শরীরে। ভূতই মনে হলো মুসার। ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধায় পড়ে গেল। ঝাড়া দিয়ে ওর হাত থেকে জ্যাকেটটা ছাড়িয়ে নিয়েই এক লাফে গিয়ে ছোট মোটর বোটটায় উঠে পড়ল শাজিন।

নামতে গিয়ে পিছলে পড়ে গেল মুসা। চিত হয়ে পড়ল শান বাঁধানো ঘাটে। ব্যথা পেল পিঠে। রবিন আর কিশোর পৌছতে দেরি করে ফেলল। ততক্ষণে স্টার্ট দিয়ে ফেলেছে শাজিন। অসহায় হয়ে দেখতে লাগল তিন গোয়েন্দা, ঘাট থেকে সরে যেতে শুরু করেছে বোটটা।

নড়ে উঠল রবিন। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। খপ করে তার হাত ধরে ফেলল কিশোর। 'মরার দরকার নেই।'

'কিন্তু চলে যাচ্ছে তো!' রাগে মাটিতে পা ঠুকল রবিন।

'স্পীড বোটের সঙ্গে সাঁতরে পারবে না।'

'দেখো এটা কি?' হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'ব্যালাক্লাভা। শাজিনের পকেট থেকে পড়েছে।'

'আজ আর বাঁচতে পারবে না, সেজন্যেই ভাগ্য তার প্রতি বিরূপ; প্রমাণের পর প্রমাণ ফেলে যাচ্ছে,' কিশোর বলল। 'এটা মাথায় দিয়ে সে নিজেই যেত সেভারনদের বাড়িতে। নানা রকম পোশাক পরে বিভিন্ন সাজে সমস্ত শয়তানিগুলো সে একাই করেছে, কেউ তার দোসর ছিল না।'

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ, সেভারনদের বাড়িতে কোন পুরুষ লোক ঢোকেনি?' মুসা অবাক।

'না।'

'কিন্তু ধরতে না পারলে কিছুই করা যাবে না,' রবিন বলল। 'দেখো দেখো, লকটার দিকে যাচ্ছে। আগেই গিয়ে গেটটা বন্ধ করে দিতে পারলে...'

বলে আর দাঁড়াল না সে। গেটের দিকে ছুটল প্রাণপণে।

মুসা আর কিশোরও তার পিছু নিতে যাচ্ছিল, এই সময় পাশে এসে থামল একটা পুলিশের গাড়ি। জ্যাকি আর তার বাবা বসে আছেন ওতে। টপাটপ লাফিয়ে নামল একজন পুলিশ অফিসার আর জ্যাকি।

'শাজিন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল জ্যাকি।

হাত তুলে দেখাল কিশোর।

'পালালই শেষ পর্যন্ত?'

'এখনও বলা যাচ্ছে না। রবিন গেছে গেটটা বন্ধ করতে। শাজিন বেরিয়ে যাবার আগেই যদি বন্ধ করে দিতে পারে...'

কথা শেষ করার আগেই আবার গিয়ে গাড়িতে বসল অফিসার। জ্যাকিও উঠল। সরে জায়গা করে দিল মুসা আর কিশোরকে। কিশোর দরজা লাগানোর আগেই চলতে শুরু করল গাড়িটা।

গেটের কাছে পৌছে দেখা গেল পাগলের মত হাতলটা ঘোরাচ্ছে রবিন, বন্ধ করে দেয়ার জন্যে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে তাকে সাহায্য করতে ছুটে গেল জ্যাকি। গেট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেখে আবার বোটের নাক ঘুরিয়ে দিতে গেল শাজিন। কোন কারণে কেশে উঠে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিনটা। মরিয়া হয়ে বার বার দড়ি টেনে স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল সে।

এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না মুসা। কোনদিকে না তাকিয়ে গিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তীব্র স্রোতকে অগ্রাহ্য করে সাঁতরে এগোল বোটের

দিকে। ধরে ফেলল পানিতে পড়ে থাকা বোট বাঁধার দড়িটা। ঘুরে গিয়ে টেনে নিয়ে সাঁতরে চলল তীরের দিকে।

দড়িটা টান দিয়ে ছাড়িয়ে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল শাজিন। কিন্তু ছাড়বে না আর, পণ করে ফেলেছে মুসা। একবার হাত থেকে জ্যাকেট ছুটিয়েছে বটে, কিন্তু দ্বিতীয়বার আর দড়ি ছুটাতে দেবে না।

পানিতে ঝাঁপ দিতে গিয়েও থেমে গেল শাজিন। তীরে দাঁড়ানো পুলিশের দলকে নজরে পড়েছে। বুঝতে পারল, পানিতে পড়েও বাঁচতে পারবে না আজ। খুব শীঘ্রি তাকে টেনে তুলবে পুলিশ। অহেতুক পানিতে পড়ে ভেজার কষ্ট করার চেয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বোটের সীটে বসে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তীরে পৌছতে অনেকগুলো আগ্রহী হাত এগিয়ে এল মুসার দিকে। কেউ দড়িটা নিয়ে নিল তার কাছ থেকে, কেউ চেপে ধরল দুই হাত। তুলে আনল তাকে পানি থেকে।

'বাপরে বাপ!' ঝাড়া দিয়ে গা থেকে পানি ফেলতে ফেলতে বলল মুসা, 'যা ঠাণ্ডা! বরফও এরচেয়ে ভাল!'

বোট থেকে নামানো হলো শাজিনকে। গাড়িতে তুলল তাকে পুলিশ।

*

'কখন সন্দেহ করলে এ সব শাজিনের শয়তানি?' ফুলস্পীডে গাড়ি চালিয়ে ম্যানিলা রোডে যাওয়ার পথে জিজ্ঞেস করল জ্যাকি।

'লোগোটা দেখে।'

'তারপর?'

'তদন্ত চালিয়ে গেলাম। কেন সে এসব করছে, বুঝতে সময় লাগল না।'

'কি যে উপকার করলে তোমরা,' কৃতজ্ঞ স্বরে বললেন মিস্টার সেভারন। 'বলে বোঝাতে পারব না!'

প্রশংসা-পর্বটা এড়ানোর জন্যে আগের কথার খেই ধরে কিশোর বলল, 'তবে আজকের আগে বুঝতে পারিনি, সব কাজ সে একাই করেছে। আমরা ভেবেছিলাম, তার একজন পুরুষ সহকারীও আছে। সেদিন বনের মধ্যে বন্দুক দিয়ে গুলি করে মুসাদের ভয়ও দেখিয়েছিল সে নিজেই। কাঁটাঝোপের ওপর পড়ে গিয়ে হাত ছিলে ফেলেছিল, হাতের প্লাস্টার সেটাই প্রমাণ করে...'

বাড়ির কাছে পৌছে দেখা গেল, সামনের রাস্তায় তেমনি দাঁড়িয়ে আছে ডিগারটা। গেটের কাছে একজন পুলিশ অফিসারকে নিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছেন মিসেস সেভারন।

'অফিসার আমাকে বলেছে, রেডিওতে থানায় জানিয়ে দিয়েছে,' মিস্টার সেভারন বললেন। 'এত তাড়াতাড়ি লোক পাঠিয়ে দেবে থানা থেকে, ভাবিনি। ভালই হলো। ড্রাইভারের সঙ্গে আর ঝগড়া করা লাগল না।'

আরও একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে মিসেস সেভারনের পাশে। চিনতে পারল মুসা। এই লোকটাকেই দূরবীন নিয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে বনের ভেতর।

গাড়ি থামাল জ্যাকি। তিন গোয়েন্দাকে বলল, 'নামো তোমরা। মা তোমাদের চা না খাইয়ে ছাড়বে না।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মুসা বলল, 'তদন্ত এখনও শেষ হয়নি। দূরবীনওয়ালা লোকটার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে হবে, শাজিনের সঙ্গে কিভাবে জড়িত ছিল।'

ভুরু কোঁচকাল জ্যাকি, 'জড়িত ছিল মানে?'

লোকটাকে কোথায়, কিভাবে দেখেছে জানাল মুসা।

হেসে উঠল জ্যাকি। 'আরে ও তো আমাদের রবার্ট লিওনেল। শখের পক্ষী-বিজ্ঞানী। সারাক্ষণ বনে বনে ঘুরে বেড়ায় আর পাখি দেখে।'

'ও, তাই!' দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল মুসা।

গাড়ি থেকে নামল ওরা।

জ্যাকির কাছে সব শুনে এগিয়ে এলেন লিওনেল। মুসার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সেদিন বনের মধ্যে তোমার ঘোড়াটাকে ভয় পাইয়ে দেয়ার জন্যে দুঃখিত।'

'না না, ঠিক আছে,' বলতে যাচ্ছিল মুসা, বলা হলো না, টেলিফোন কোম্পানির একটা গাড়ি এসে থামল।

গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এল একজন লোক। 'আপনাদের তারে কোনখানে গণ্ডগোল হয়েছে, সেজন্যেই লাইন পাচ্ছেন না। খুঁজে বের করে এখুনি ঠিক করে দিচ্ছি...'

কিশোর অনুমান করল, শাজিনই তারটা ছিঁড়েটিড়ে দিয়ে থাকবে কোন জায়গায়, সেভারনদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্যে, যাতে ডিগার নিয়ে বাগান ভাঙতে এলে তাঁরা থানায় যোগাযোগ করতে না পারেন।

*

'আমাকে নিয়ে তো খুব হাসাহাসি করা হয়েছে,' রান্নাঘরের টেবিলে কাপে চা ঢালতে ঢালতে হেসে বললেন মিসেস সেভারন, আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে, 'ভূতের কথাটা কি ভুল বলেছি?'

'ভূত নয়, মানুষ। ফিনফিনে পোশাক পরে শাজিনই ভূত সেজেছিল।'

'সে যা-ই হোক, দেখেছি তো ঠিকই, চোখের ভুল ছিল না।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ। ওর পোশাকের কাপড়ই ছিঁড়ে আটকে গিয়েছিল সেলারে নামার ট্র্যাপ-ডোরে।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে মুসা বলল, 'আসল ভূত হলে সত্যি খুব মজা হত।' শাজিন আসল ড্রাকুলা না হওয়ায় নিরাশই মনে হচ্ছে ওকে।

'সেলারে আরেকবার চোখ বোলাতে চাই আমি,' কিশোর বলল। 'কে জানে, নতুন আর কোন রহস্য পেয়ে যাই কিনা?'

হেসে উঠল জ্যাকি, 'তোমরা মনেপ্রাণে গোয়েন্দা। রহস্যের খোঁজে থাকো সব সময়, রহস্য না হলে বাঁচো না। যোগ্য লোক পাওয়া গেছে এতদিনে। চলো, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব। জোয়ালিনের ভূতের রহস্য সমাধানের ইচ্ছে আমারও অনেক দিনের।'

'তাই নাকি? চলুন!' সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হয়ে উঠল কিশোর। 'দারুণ হবে! বলা যায় না, ভূত খুঁজতে গিয়ে ওয়ারনার পরিবারের গুপ্তধনের নকশাও পেয়ে যেতে পারি।'

'ও, তাই বলো, গুপ্তধন,' হাসল রবিন। 'আমি ভাবছিলাম ভূত খুঁজতে যাওয়ার এত আগ্রহ কেন তোমার?'

'গুপ্তধনের কথা আবার কার কাছে শুনলে?' চোখ বড় বড় করে তাকাল মুসা। তার ওঠার কোন ইচ্ছে দেখা গেল না। আয়েশ করে ফ্রুটকেক চিবুচ্ছে।

'শুনিনি, অনুমান। এত বড়লোক ছিল যখন, গুপ্তধন তো থাকতেই পারে, তাই না?'

'তা পারে!' রবিনও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু মুসার মধ্যে তেমন উত্তেজনা নেই। হাত নেড়ে বলল, 'গুপ্তধন উদ্ধারে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু দেড়শো বছরের পুরানো সেলারে জোয়ালিনের ভূতও থাকতে পারে। ওর বাবার ধনরত্ন লুট করতে যাচ্ছি দেখলে ঘাড়টা ধরে মটকে দিতে পারে। মিসেস সেভারন, আপনার কোন আপত্তি না থাকলে এই ফ্রুটকেকটা আমি পুরোটাই খাব। বলা যায় না, জীবনের শেষ খাওয়াও হতে পারে এটা।'

শেষ

ভলিউম ৩৫

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হালো, কিশোর বন্ধুরা-
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।

জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম
তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙালি। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্করের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি-
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০